সাধন প্রদীপ

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্গুরবে নমঃ।

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য—১ম খণ্ড।

সাধনপ্রদীপ

(চতুর্থ সংস্করণ।)

আমূল সংশোধিত।

গুরুপ্রদীপ, জ্ঞানপ্রদীপ, গীতাপ্রদীপ ও পূজাপ্রদীপাদি

গ্রন্থপ্রণেতা পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত।

চুণার আনন্দাশ্রম সেবক সঙ্ঘ প্রচার বিভাগ পক্ষে শ্রীপ্রমোদ কিশোর চট্টোপাধ্যায় দ্বারা ৩১।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত এবং জগদ্ধাত্রী প্রেস ৫।২ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন হইতে শ্রীখগেন্দ্র নাথ চন্দ্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কলিকাতা, সন ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

 [মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

ও নমঃ

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ।

পরমপূজ্যপাদ ঠাকুর!

এতদিনে আপনার একটী আদেশ পালন করিতে পারিলাম বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এ আবার কি হইল প্রভো! শ্রীমুখের সেই উপদেশামৃত তগ্দত চিত্তে পান করিয়া যে তখন অধীর ও উন্মত্ত হইত—যে এখনও তাহার অবসর সময়ে নব নব আনন্দ প্রদান করে, সে সহসা হৃদয়ের সেই গভীরতর প্রদেশ হইতে ভ্রূকুটী করিয়া বলিতেছে—"কি? কাহার আদেশ, পালন করিল কে? তোর সাধ্য কি যে, একটি অক্ষরও বিন্যাস করিস—মূর্খ, কলের পুতুল, তোর এমন কি সামর্থ্য আছে যে, তাঁহার আদেশ পালন করিবি?" গুরুদেব! আপনার অতি অধম, অকর্ম্মণ্য শিষ্য তাই সভয়ে ভবদীয় চরণপ্রান্তে অবনত মস্তকে অনুনয় করিতেছে—আপনার কর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন, ফলাফল আপনারই—তবে কৃপা করিয়া অন্তরের তাহাকে একবার বলিয়া দিন প্রভো! সে যেন আর অমন করিয়া আমাকে তিরস্কার না করে।

একান্ত অনুগত সেবক

"সচ্চিদা"

ও নমঃ

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ।

পরমপূজ্যপাদ ঠাকুর!

এতদিনে আপনার একটী আদেশ পালন করিতে পারিলাম বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এ আবার কি হইল প্রভো! শ্রীমুখের সেই উপদেশামৃত তগদ্গত চিত্তে পান করিয়া যে তখন অধীর ও উন্মত্ত হইত—যে এখনও তাহার অবসর সময়ে নব নব আনন্দ প্রদান করে, সে সহসা হৃদয়ের সেই গভীরতর প্রদেশ হইতে ভ্রূকুটী করিয়া বলিতেছে—"কি? কাহার আদেশ, পালন করিল কে? তোর সাধ্য কি যে, একটি অক্ষরও বিন্যাস করিস—মূর্খ, কলের পুতুল, তোর এমন কি সামর্থ্য আছে যে, তাঁহার আদেশ পালন করিবি?" গুরুদেব! আপনার অতি অধম, অকর্ম্মণ্য শিষ্য তাই সভয়ে ভবদীয় চরণপ্রান্তে অবনত মস্তকে অনুনয় করিতেছে—আপনার কর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন, ফলাফল আপনারই—তবে কৃপা করিয়া অন্তরের তাহাকে একবার বলিয়া দিন প্রভো! সে যেন আর অমন করিয়া আমাকে তিরস্কার না করে।

একান্ত অনুগত সেবক
"সচ্চিদা"

সূচীপত্র

বিষয়। — পত্রাঙ্ক।

প্রথমোল্লাস

সনাতন ধর্ম্ম ও মহাবিদ্যা — ১ হইতে ৬

দ্বিতীয়োল্লাস

তন্ত্র কি ? — ৭ হইতে ৭৪
ত্রয়ীশাস্ত্র ও উর্দ্ধাম্নায় শাস্ত্র — ৭
তন্ত্রের কাল ... — ৯
(শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদিতে তন্ত্রের কথা) — ১০
আগম বেদেরই অঙ্গ — ১৪
তন্ত্রই সাধনার সোপান — ১৬
তন্ত্র, কবি-কল্পনা নহে — ১৬
শাস্ত্র, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত নহে — ১৭
তন্ত্র গুরুপরম্পরাগত বিদ্যা — ১৮
তন্ত্রোপদেষ্টা গুরু — ১৯
সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মাতৃভাব তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য — ২১
'হরিনাম' মন্ত্রের রহস্য — ২৬
উদার শক্তিতত্ত্ব ও কুলধর্ম্ম — ২৭
তত্ত্বসভা, মেসনিক লজ ও বৈদিক লজ্ — ৩০
কৌলের রূপ ও অবস্থা — ৩১
অষ্টাভিষেক (শাক্তাভিষেক) — ৩২
(হরিভক্তিবিলাসের মতে দ্বিজমাত্রেই শাক্ত) — ৩৪

বিষয় — পত্রাঙ্ক

(পূর্ণাভিষেক ৩৫, ক্রমদীক্ষাভিষেক ৩৬ সাম্রাজ্যাভিষেক, মহাসাম্রাজ্যাভিষেক ৩৭, পূর্ণদীক্ষাভিষেক ও মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেক) ... — ৩৮
(তত্ত্বমসি, পরমহংস) ... — ৩৯
পঞ্চ-মকার তত্ত্ব .... — ৩৯
পঞ্চ-মকারের তামসিক সাধনা — ৪২
(শাপবিমোচন কথা) — ৪৬
পঞ্চ-মকারের রাজসিক সাধনা — ৪৯
পঞ্চমকারের সাত্ত্বিক সাধনা — ৫১
(সাত্ত্বিকতত্ত্ব-পঞ্চক) — ৫২
পঞ্চ-মকারের প্রথম তত্ত্ব মদ্য — ৫৪
(পঞ্চমকারের স্থূল ও অনুকল্পবিধি) — ৫৯
পঞ্চ-মকারের দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস — ৬১
ঐ তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য — ৬২
ঐ চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা — ৬৪
ঐ পঞ্চমতত্ত্ব—মৈথুন — ৬৫
(ঐ অনুকল্প বিজয়াদি) — ৭০
(বৈষ্ণবী পঞ্চমকার) — ৭০
(তন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরেরই অর্থ গুরুমুখগম্য) — ৭২
আগমও নিগমে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব — ৭২

তৃতীয়োল্লাস

আগমে আচার তত্ত্ব — ৭৫ হইতে ৮৯
বেদাদি নবধা আচার — ৭৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
বেদাচার	৭৬
বৈষ্ণবাচার	৭৭
শৈবাচার	৭৯
দক্ষিণাচার	৮০
সিদ্ধান্তাচার	৮২
বামাচার	৮৩
অঘোরাচার	৮৪
যোগাচার	৮৬
জ্ঞানাচার কৌলাচার বা সন্ন্যাসাচার	৮৬
কৌলিন্য প্রথা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম	৮৭

চতুর্থোল্লাস

আগমে পূজাতত্ত্ব	৯০ হইতে ১৪১
পূজাত্রয়	৯০
যোগশাস্ত্রের আবিষ্কার	৯২
যোগ কাহাকে বলে ?	৯৩
ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগ	৯৪
অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট যোগ	৯৭
যোগের প্রথমাঙ্গ—'যম'	৯৭
ঐ দ্বিতীয়াঙ্গ—'নিয়ম'	৯৯
ঐ তৃতীয়াঙ্গ—'আসন'	১০০
(আসন প্রস্তুত প্রণালী)	১০৩
(আসনে বসিবার প্রণালী)	১০৬
(আ+স+ন=আসন)	১০৯
(আসনশুদ্ধি)	১০৯
ঐ চতুর্থাঙ্গ—'প্রাণায়াম'	১১০
(প্রাণায়ামও অষ্টবিধ)	১১১
যোগেরপঞ্চমাঙ্গ—'প্রত্যাহার'	১১৫
ঐ ষষ্ঠাঙ্গ—'ধারণা	১১৬
ঐ সপ্তমাঙ্গ—'ধ্যান'	ঐ
ঐ অষ্টমাঙ্গ—'সমাধি'	১১৭
যোগারম্ভকাল ...	১১৭
(কোন্ কোন্ মাস কোন্ কোন্ ঋতু পরিজ্ঞাপক)...	১১৮
সাধনানুকুল স্থান ...	১১৯
ঐ আহার্য্যাদি	১২০
মন্ত্ররহস্য ...	১২২
যন্ত্রতত্ত্ব ...	১২৯
ন্যাসতত্ত্ব (ন্যা+স=ন্যাস)	১৩২
ভাবতত্ত্ব ...	১৩৫

পঞ্চমোল্লাস

আদ্যাশক্তি তত্ত্ব	১৪২—২৩১
কালীমূর্ত্তির উৎপত্তি	১৪২
আদ্যাশক্তি দক্ষিণ কালিকা,	১৪৩
শ্রীশ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকার ধ্যান ...	১৪৪
সাধনার ক্রম-বিধান...	১৪৬
দুর্গাপূজা-রহস্য ...	১৪৯
মূর্ত্তিপূজক কে ? ...	১৫৬
দক্ষিণাকালী-রহস্য ...	১৬২
গায়ত্রী-রহস্য ...	১৭৩
শিব-প্রকৃতি-রহস্য ...	১৭৮
ব্রহ্ম-সাধনায় নাধকের ধ্যেয় কি ? ...	১৮৫

ওঁ ষট্ শ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১২	কোনও	ইহা কোনও
১৬	১০	মূলদেহে	স্থূলদেহে
৩২	২৫	নিগুণ	নির্গুণ
৩৯	২০	সাধনা পঞ্চ-মকার	পঞ্চ-মকার সাধনা
৩৯	২৩	সাধারণ—	সাধারণ
৪৬	১১	বরুণালয়সম্ভবে	করুণালয়সম্ভবে
ঐ	১৫	ওঁ বাঁ	ওঁ ব্যাঁ
ঐ	১৮	ক্রৈং	ক্রৈঁ
ঐ	৩	নগ্ন	মগ্ন
৫০	১৮	শুনিলেই আমার নেশা হয়।"	আমার "তিনি" বলেন মদ শব্দ শুনিলেই আমার নেশা হয়।
৫১	৫	নহেন	নহেন ;
৫২	১০	সংসাধিত হয়,	সংসাধিত হয়।
ঐ	ঐ	অন্তর্গত।	অন্তর্গত
ঐ	১২	পাওয়া যায়।	পাওয়া যায় ;
ঐ	১৩	আহার্য্য বস্তু।	আহার্য্য বস্তু ;
ঐ	ঐ	মুদ্রা—	মুদ্রা,
ঐ	১৪	সামগ্রী।	সামগ্রী ;
ঐ	ঐ	মৈথুন	মৈথুন,
ঐ	১৬	কোন্	কোন
৫৩	২	প্রাপ্নেতি	প্রাপ্নোতি
ঐ	১১	তবে কেহ তামসিক ভাবে, কেহ বা সাত্ত্বিক ভাবে	তবে কেহ তামসিক ভাবে, কেহ বা রাজসিক ভাবে, কেহ বা সাত্ত্বিক ভাবে
ঐ	১২	ব্যবহার করে	ব্যবহার করে।
৫৪	৬	মাংস	মাংস,
ঐ	৭	মুদ্রা	মুদ্রা,
৬১	১৫	তদংশান্	তদংসান্
ঐ	২১	অন্যতম	অন্যতর

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৪	২৪	কোটিস্থ্যাসদৃশ	কোটিসূর্য্যসদৃশ
৬৭	২০	দিব্যস্ত	দিব্যস্ত
৭০	৪	করে	করে,
ঐ	৫	করে	করে,
ঐ	২০	শৃণ	শৃণু
৭২	১৮	দ্বৈতাদৈত্য	দ্বৈতাদ্বৈত
ঐ	২১	শ্রুতিগত গত	শ্রুতিগত
৭৩	৫	স্বরূপতত্ত্ব	স্বরূপতঃ
৭৬	৫	'দিব্যভাব'	'দিব্যভাবে'
ঐ	৬	কৌলাচর	কৌলাচার
ঐ	১০।১১	দক্ষিণাদুত্তমং বামং	পাঠান্তরে ১০।১৩

……পরতরং নহি। দক্ষিণাদুত্তমসিদ্ধান্তং সিদ্ধান্তাদ্বামমুত্তমম্।
বামাদুত্তমমঘোরং অঘোরদ্যোগমুত্তমম্॥
যোগাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরম্॥

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	১৩	বেদাচর	বেদাচার
৭৭	১	আগমে আকারতত্ত্ব	আগমে আচারতত্ত্ব
ঐ	১৭	দ্বিতীয় স্তর	দ্বিতীয় স্তর,
৭৮	২২	বৈশ্যত্ব'	বৈশ্যত্ব।
৭৯	১	আগমে আকার তত্ত্ব	আগমে আচার তত্ত্ব
৮০	১২	দেবতা	দেবতা,
ঐ	১৩	মত্তভাব বা শৈবাচার	পশুভাব বা পশ্বাচার
ঐ	২৪	কঠিন	কঠিন,
৮১	৩	গায়ত্রীমন্ত্রে ;	গায়ত্রী-মন্ত্রে
ঐ	১১	ত্রি-সন্ধায়	ত্রি-সন্ধ্যায়
ঐ	১৫	নিলিপ্ত	নির্লিপ্ত
ঐ	২০	শ্রীভগবনের	শ্রীভগবানের
ঐ	২৪	গায়ত্রী-তত্ত্ব	গায়ত্রী-তত্ত্বে
৮৩	২০	হয়	হন
৮৫	১৫	হিংস	হিংস্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৬	২৪	সধনার	সাধনার
৮৭	৩	সাধক মহাপূর্ণদীক্ষায়	সাধক পূর্ণ ও মহাপূর্ণদীক্ষায়
ঐ	১২	অন্তনিহিত	অন্তর্নিহিত
৮৮	২০	করে	করে,
৯০	১৬	পূজাত্রর	পূজাত্রয়
ঐ	ঐ	উচ্চস্তর নির্দ্দিষ্ট	উচ্চস্তর—নির্দ্দিষ্ট
৯২	২	অবস্থা	অবস্থা,
ঐ	১৪	হইতে	হইলে
৯৩	৪	মনচ্ছক্তির	মনচ্ছক্তিরও
ঐ	১৩	পূজাতত্ত্ব	পূজাতত্ত্বে
৯৪	১৫	সাধক-সাধারণে	সাধক-সাধারণ্যে
ঐ	২১	শ্রেয়োবিধিৎসয়া	শ্রেয়োবিধিৎসরা
৯৬	৪	শাররিক	শারীরিক
ঐ	১০	একাঙ্গভুত	একাঙ্গীভূত
৯৭	১৬	অষ্টাঙ্গযোগেরই	যোগের অষ্টাঙ্গের
৯৮	১৯	(৯) অধিক নহে এরূপ	অধিক নহে অথবা অল্পও নহে এরূপ
৯৯	৬	'পুরশ্চরণপ্রদীপে'...... বলা হইয়াছে।	পুংক্তি ৫ (পুরশ্চরণপ্রদীপে....... বলা হইয়াছে)
১০০	৭	স্থিরতা ও। একাগ্রতা	স্থিরতা ও একাগ্রতা
ঐ	২১	করিতেছে।	করিতেছেন।
১৭১	৮	তাহা বিজ্ঞান সাহায্যেই	তাহা পদার্থ-বিজ্ঞান সাহায্যেই
১০২	২	১য়	২য়
ঐ	৭	পৃথীতত্ত্বের	পৃথ্বীতত্ত্বের
ঐ	২২	তড়িত	তড়িৎ
১০৩	১৬	কুশ ও কাশ সকল,	কুশ ও কাশ, সকল
ঐ	১৭	সর্ব্ববিব	সর্ব্ববিধ
১০৩	২২	বৃণনা	বর্ণনা
১০৪	১০	নারিবেন	পারিবেন
১০৬	২	ঋযিভ্রম	ঋষিভ্রম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৬	২১	নয়	হয়
১০৮	১৪	নিমে	নিম্নে
১১৩	১৩	বায়ূ	বায়ু
ঐ	১৯	যোগসাধনোযোগী	যোগ-সাধনোপযোগী
১১৬	৭	মনিতে	মণিতে,
১১৭	২২	শৎকালে	শরৎকালে
১১৮	১১	বসন্তকাল	বসন্তকালে
১১৯	৫	পূ জা	পূজা
ঐ	২৫	পুষ্পসমূহতরু	পুষ্পসমূহের তরু
১২২	৩	হীনবীর্য্য	হীনবীর্য্য ;
ঐ	১৩	কিছুবেই	কিছুতেই
ঐ	২০	সাধারণত	সাধারণতঃ
ঐ	২২	বলবার	বলিবার
১২৩	২৫	কর	কর,
১২৪	৩	কর	কর,
ঐ	৬	সিদ্ধিশিষ্য	সিদ্ধশিষ্য
ঐ	২১	জপ-মন্ত্র	জপ-মন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্র
ঐ	২৩	H 2 0	$H_2 0$
১২৫	২২	ষায়	যায়।
ঐ	ঐ	ব। লয়	বা লয়
১২৬	৮	অবশই	অবশ্যই
১২৭	৬	সাংকালে	সায়ংকালে
ঐ	২২	শাস্ত্রবিরুদ্ধ	শাস্ত্রবিরুদ্ধ।
১২৮	৩	পাইয়াছে	পাইয়াছে,
ঐ	১১	ন্যাস।	ন্যাস
ঐ	১৬	হইয়াছে	হইয়াছে ;
ঐ	২২	রহস্য ও	রহস্যও
ঐ	২৩	আবশ্যক	আবশ্যক।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩১	১৪	বর্ণনার	বর্ণনায়
ঐ	৪	সর্ব্বভাবোত্তমোত্তম্	সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমম্
১৩৭	১৫	স্বামী-স্ত্রী ;	স্বামী স্ত্রী
১৩৮	২	করিয়াহ্বেন	করিয়াছেন
১৪৫	১১	সমৃজ্জ্বল	সমুজ্জ্বল
ঐ	১৮	সমৃর্দ্ধিপ্রদায়িণী	সমৃদ্ধিপ্রদায়িণী
ঐ	২২	শয়েয়	শরের
ঐ	২৪	বলেম,	বলেন,
১৪৬	৩	দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধধঃ
ঐ	৫	সৃকদ্বয়গলদ্রক্তধারা	সৃকদ্বয়গলদ্রক্তধারাং
১৪৮	২৬	সাধনাকঙ্খীকে	সাধনাকাঙ্খীকে
১৫৩	১২	দক্ষিণপদের	দক্ষিণপদ
ঐ	ঐ	বামঅঙ্গুষ্ঠ	বামপদের অঙ্গুষ্ঠ
১৫৮	১৮	ইহা	সেই
১৫৯	২১	ষট্সাবাদ	ষট্-সংবাদ
১৬০	১	১০৬	১৬০
ঐ	৮	স্ত্রীমূত্তি	স্ত্রীমূর্ত্তি
১৬১	৩	অবাঙ্মনোগোচর	অবাঙ্মনসোগোচর
১৬৪	৪	মূত্তিতে	মূর্ত্তিতে
১৬৯	১৪	মহেশাশি	মহেশানি
১৭৩	২৩	১মৃ,	১ম,
১৭৪	১৬	সাবিত্রী-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী	সাবিত্রীমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী
১৭৫	১৫	সূর্যমণ্ডলের	সূর্য্যমণ্ডলের
ঐ	১৯	স্থির	স্থিরীকৃত
১৭৬	১৯	রজঃ প্রবৃত্তি,	রজঃ—প্রবৃত্তি,

আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা
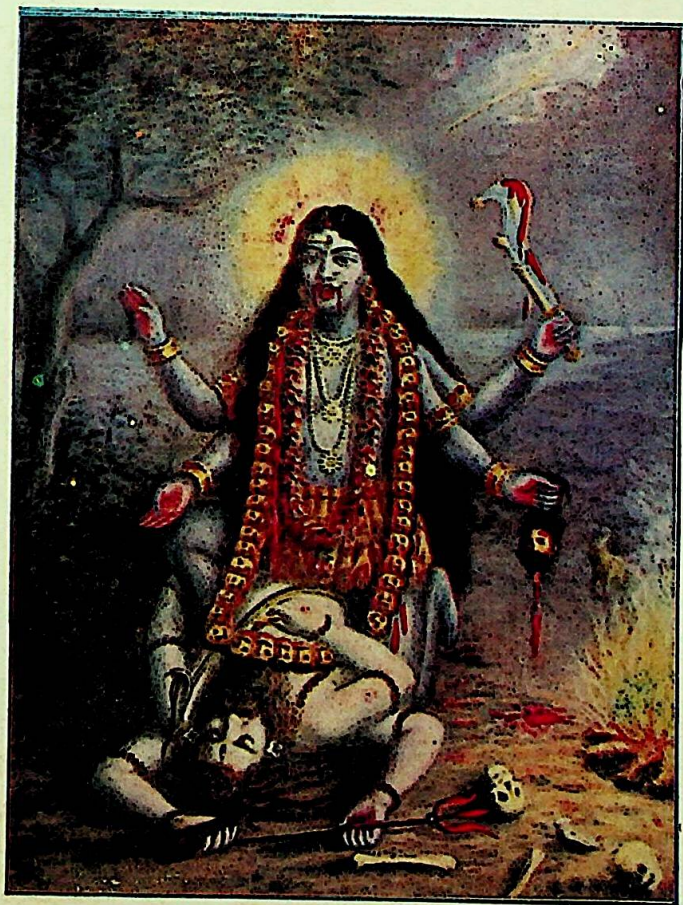
ওঁ হংসঃ বট্‌ শ্রীমদ্‌ গুরবে নমঃ।

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (প্রথম খণ্ড)

সাধনপ্রদীপ

প্রথমোল্লাস

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্‌॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামঃ॥"

সনাতনধর্ম্ম ও মহাবিদ্যা

আর্য্যধর্ম্ম জগতের প্রাচীনতম সত্যধর্ম্ম। ইহা অনাদি ও অবিনাশী; এই কারণ "সনাতনধর্ম্ম" বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্পাদিত বা প্রচারিত হয় নাই—তবে সত্য ত্রেতাদি

যুগ-ধর্ম্ম প্রভাবে ইহাতে সাধনার অনুকূল স্বতন্ত্র পন্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র। ত্রিকালদর্শী মহাত্মারাই সময় সময় যুগধর্ম্মের * প্রবর্ত্তন ও অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যোগবলে এবং দৈবসহায়তায় স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে, জগতের জীব ক্রমে হীন-বীর্য্য, অল্পায়ু ও স্বল্পভোগী হইয়া পড়িবে, স্থতরাং তাঁহারা সেই অতীত যুগ হইতেই আধার বুঝিয়া আধেয়, স্থান বা ক্ষেত্র বুঝিয়া উপযুক্ত বীজ বপনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই অলৌকিক দূরদর্শিতার বিষয় আজ ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। অপৌরুষেয় বেদ আমাদিগের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র। সত্যযুগে উচ্চবর্ণের মানবগণ সতত বেদানুশীলন নিস্কল পরমাত্ম চিন্তা ও উৎকট তপস্যা করিতেন। তখন সকলেই অত্যন্ত দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, মহাপরাক্রম ও স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন। তাঁহারা মানব হইয়াও দেবলোকে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিতেন; অথবা তাঁহারা যথার্থই দেবতাসদৃশ ছিলেন। সত্যযুগের রাজগণ সত্যসঙ্কল্প ও প্রজাপালন-তৎপর ছিলেন। মানবমাত্রেই পরস্ত্রীকে জননী, পরসন্তানকে নিজ-সন্তান এবং পরধনকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেন। সকলেই সদাশয় ও সতত হৃষ্টচিত্ত ছিলেন। পৃথিবীও তখন সমুর্ব্বরা ও সর্ব্বশস্যসম্পন্না ছিল। সেকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই স্ব স্ব আচারে নিরত হইয়া হৃষ্টচিত্তে জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা করিতেন।

"সত্যে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদন্যূনকঃ।
দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি! পাদমাত্রং কলৌ যুগে॥
তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খণ্ডং দয়াপি চ।
সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে॥"

* 'সনাতনধর্ম্ম' ও ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে তন্ত্র-রহস্যের তৃতীয়খণ্ড 'জ্ঞান-প্রদীপের' ১ম ভাগে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে।

অনন্তর ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে, মানবগণ বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা অভিলষিত কর্ম্ম সাধন করিতে অশক্ত হইয়া পড়িল, তখন বেদের আংশিক অর্থযুক্ত স্মৃতিরূপ শাস্ত্রসাহায্যে সাধনা করিয়া মানবসমূহ উদ্ধার পাইতে লাগিল। সত্যযুগে সম্পূর্ণ বা চতুষ্পাদ সত্যধর্ম্ম ছিল; ত্রেতায় তাহার এক পাদ নষ্ট হইয়া ত্রিপাদ ধর্ম্মরূপে পরিণত হইল; দ্বাপরে ধর্ম্মের দ্বিপাদ নষ্ট হইল, মানব তখন আধিব্যাধি দ্বারা ক্রমে সমাকুল হইয়া পড়িল। স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানও অসাধ্য হওয়ায়, তখন হইতে সংহিতাদির সাহায্যে মানবগণ রক্ষা পাইতে লাগিল। এক্ষণে সর্ব্বধর্ম্ম-বিলোপকারী মহাপাপময় কলি-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্ম্মের ত্রিপাদ নষ্ট হইয়া একপাদমাত্রই অবশিষ্ট আছে। সেই একপাদ ধর্ম্মের প্রকৃত তপস্যা ও দয়াংশ খণ্ড হইয়াছে। একমাত্র সত্যই কেবল বলবৎ আছে। এই সত্য নষ্ট হইলেই সংসার হইতে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অধুনা বেদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে, স্মৃতি স্মৃতিপথের অতীত হইয়াছে, সংহিতা ও পুরাণেরও অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে; সুতরাং লোকসকল ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হইয়া ভীষণ অহঙ্কারী, লুব্ধ, ক্রূর, নিষ্ঠুর, কটুভাষী, স্বল্পবুদ্ধি, শ্রীহীন, নীচাশয় ও সতত শোকাকুল হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি-বর্জ্জিত, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, গম্যাগম্য ও পানাদির প্রায় বিচারশূন্য, কেবলমাত্র শিশ্নোদর-পরায়ণ ও আত্মপ্রবঞ্চক হইয়া পড়িতেছে। পূজ্যপাদ ঋষিগণ সুদূর অতীতের আসনে বসিয়াও তাহা সুস্পষ্ট অবগত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়া কলিযুগের একমাত্র অবলম্বন শিবোক্ত সত্য "আগমশাস্ত্র" রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সতত স্নেহশীলা, সন্তান-কল্যাণপরায়ণা সর্ব্বমঙ্গলময়ী জগজ্জননী মা আমার অবোধ পুত্রগণের হিতকামনায় প্রশ্ন করিলেন—"কলিযুগে স্বভাবতঃ পাপ-মলিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কেহই পবিত্র অপবিত্র কোন

বিচার করিতে পারিবে না, সুতরাং কিরূপে বেদাদিবিহিত কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে? তাই জগৎ-পিতা দেবাদিদেব সদাশিব বারংবার বলিয়াছিলেন :—

"সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনাগমোক্তবিধানেন কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥
কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রধাবতি।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ হে প্রিয়ে, ; আমি সত্য সত্য ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মানবের গত্যন্তর নাই। হে শিবে, আমি পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি, ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বলিয়াছি যে, কলিযুগে তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা পণ্ডিত সাধকগণ দেবতাদিগের পূজা করিবেন। কলিযুগে যে তন্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য পথের পথিক হয়, তাহার সদ্গতি হয় না, ইহা সত্য—সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

"কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥"

অর্থাৎ কলিযুগে এই আগমমার্গ ত্যাগ করিয়া অন্যমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চায়, সে দুর্ম্মতি ঠিক যেন তৃষ্ণাতুর হইয়া জাহ্নবীতটে নূতন কূপ খনন করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া পান করিতে অগ্রসর হয়।

মহাদেব আরও বরিয়াছেন, তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল কলিকালে সিদ্ধ এবং আশুফলপ্রদ ও সর্ব্ববিধ জপযজ্ঞাদিতে প্রশস্ত। যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিলে অঙ্কুর উদ্গমের সম্ভাবনা আছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সেইরূপ

উপযুক্ত ক্ষেত্রেই উপযুক্ত বীজ বপন করিয়া থাকেন। নতুবা মরুভূমিতে ধান্য রোপণ করিয়া ফল কি? অথবা হিমগিরিজাত উদ্ভিদের রক্ষা গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে কিরূপে সম্ভবে? বর্ত্তমান কলিযুগে জীবের যেরূপ অবস্থা, আমাদের হৃদয় যেরূপ মরুসদৃশ ও সংকীর্ণ, তাহাতে পবিত্র, বেদোক্ত অনুষ্ঠানের স্থান কোথায়? মুষিক ধরিবার ফাঁদ লইয়া সিংহ ধরিবার আশা যেমন ঘোর উন্মাদের কর্ম্ম, তেমনই এই শীর্ণ স্বল্পবীর্য্য দেহে, ক্ষীণমস্তিষ্কে এবং অপবিত্রহৃদয়ে বেদাদির সাহায্যে উদ্ধার লাভের আশাও সম্পূর্ণ দুরাশা। তাই বেদাদির সাধনতত্ত্ব-মাত্র অবলম্বন করিয়া দেবাদি-দেব শ্রীসদাশিব কলির মানবের একমাত্র উপযোগী তন্ত্ররত্নের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ভবানিপতি আরও বলিয়াছেন :—আমি জীবের অবস্থানুসারে নানা মন্ত্র, নানাযন্ত্র, সিদ্ধি ও সাধনার অনুকূল বহুবিধ বিধান বলিয়াছি। ভৈরব, বটুক, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি অনেক বিষয়ের বর্ণন করিয়াছি; এ সমুদায়দ্বারা অবশ্যই যথোপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়—তবে সকলের আদি ও সারভূত ব্রহ্মশক্তি পরমাপ্রকৃতির আরাধনা ব্যতীত অন্তিম মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

বেদ-প্রসূ গায়ত্রীরূপিণী, ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপিণী, আদ্যাশক্তির প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া স্থূলবুদ্ধি কলির মানব শিবভক্ত হইয়া বৈষ্ণবকে, বৈষ্ণব হইয়া শাক্তকে, শাক্ত হইয়া অন্য উপাসককে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যাহারা সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দাবাদ করিয়া নিজ-উপাস্য-দেবের সন্তোষ-সাধন করিতে যান, তাঁহারাই বুদ্ধি ও কর্ম্মদোষে সেই মহাশক্তির অপ্রীতি ও অসন্তোষ সাধন করিয়া স্বীয় অনিষ্টেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। "পূজা প্রদীপে" উপাস্য-ভেদ অংশ পাঠ করিলে সাধকের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিদূরিত হইবে।

নদী যে স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, সেই একই মহাসাগরে মিলিয়া যাইবে। যিনি যে পথই অবলম্বন করুন, সময়ে ব্রহ্মের সেই মহাশক্তিতেই বিলীন হইয়া যাইবেন। তখন আর সাম্প্রদায়িক-বিবাদ থাকিবে না।

মঙ্গলময় শিব, কলির জীবের মঙ্গলের জন্য 'মহাবিদ্যাতত্ত্ব' প্রকাশ করিয়াছেন। সময় হইলে আধারে আধেয় আপনি মিলিত হইবে। ফল সুপক্ক হইলে, বৃক্ষ হইতে আপনিই তাহা বিচ্যুত হইবে; বৃক্ষও ফলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না, ফলও বৃক্ষের মায়ায় আবদ্ধ থাকিবে না। সময়ে জীবজগৎ আদ্যাশক্তি বা মহাবিদ্যাতত্ত্ব অবশ্যই অবগত হইবে, এ সেই মহামায়ারই মায়াজাল! এই মহাবিদ্যাতত্ত্ব তন্ত্রে অতি গূঢ়ভাবে বর্ণিত আছে, সিদ্ধগুরু মুখেই তাহা বোধগম্য। ওঁ তৎ সৎ ওঁ॥

দ্বিতীয়োল্লাস

তন্ত্র কি ?

শিব-শক্তি-প্রোক্ত সাধন-বিষয়ক সকল শাস্ত্রই 'তন্ত্র' নামে অভিহিত।

ত্রয়ীশাস্ত্র ও ঊর্দ্ধাম্নায়শাস্ত্র।

আর্য্যগণ আদিযুগ হইতেই বেদ বা ত্রয়ী-শাস্ত্রের উপাসক। গীতি, গদ্য ও পদ্য অথবা কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও উপনিষদ, এই ত্রি-প্রকারেই আম্নাত বলিয়া বেদের নামান্তর 'ত্রয়ী'। ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদকেই ত্রয়ী কহে। এই 'ত্রয়ী-শাস্ত্র' যথাক্রমে স্বয়ম্ভূর চতুর্মুখ হইতে প্রকাশিত, অথবা পবিত্র চতুর্ব্বেদই অলৌকিক ভাবে তাঁহার চতুর্মুখ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আবার এই বেদেরই ক্রিয়াসিদ্ধ বা সাধন অংশ (Practical part) মাত্র লইয়া স্বয়ম্ভূ শঙ্কর, পঞ্চম মুখে পঞ্চম-বেদ, (আগমঃ পঞ্চমোবেদঃ) 'ঊর্দ্ধাম্নায়' বা তন্ত্র-শাস্ত্র নামে প্রকাশ করেন। তদবধি শিবকে 'পঞ্চবক্ত্র' বা 'পঞ্চানন' বলিয়া সকলে পূজা করিতেছেন! এই ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রগুলিই সাত্ত্বিক সাধনানুকূল সুতন্ত্র।

'ঊর্দ্ধাম্নায়োদিতং কর্ম্ম দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে।'

শাস্ত্রে কথিত আছে, ভগবান বিষ্ণু পঞ্চাননের ঊর্দ্ধাম্নায়শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া, ত্বরায় শিবসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! জীবজগৎ সকলই যদি ঊর্দ্ধাম্নায়-সাহায্যে মুক্তি লাভ করে, তবে ব্রহ্মানুকল্পিত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা হইবে কি করিয়া? শিব কাল-বিলম্ব না করিয়া, তখনই 'অধোম্নায়' নামে কতকগুলি আসুরিক তন্ত্র, ষষ্ঠ-আম্নায় বা নিম্নমার্গ

দিয়া প্রকাশ করিয়া দেন, এইগুলিই লৌকিক-কর্ম্ম ও বাহ্য-বিভূতি সিদ্ধিপ্রদ কুতন্ত্র। বর্ত্তমান কালে লৌকিক ভোগাভিলাষী সাধারণ সাধকগণের অনভিজ্ঞতার ফলে ঊর্দ্ধাম্নায় এবং অধোম্নায় নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া ও উপাসনা পরস্পর মিলিত হইয়া গিয়াছে। সুবিজ্ঞ গুরুর উপদেশ ব্যতীত স্বয়ং তাহার নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া নিতান্ত দুরূহ। অধোম্নায় শাস্ত্রগুলিও অগ্রাহ্যের বিষয় নহে, তাহাও গভীর রহস্যপূর্ণ। সাধন-শাস্ত্র-গুলি আবার আগম ও নিগম-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে গুলিতে শিব বক্তা, দেবী শ্রোত্রী এবং ভগবান বিষ্ণু অনুমোদন কর্ত্তা, তাহাই 'আগমশাস্ত্র' * বলিয়া উক্ত, যে সকলে দেবী বলিতেছেন, শিব শুনিতেছেন এবং নারায়ণ অনুমোদন করিতেছেন, তাহাই 'নিগমশাস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আগমে—সাধনাধিক্য, নিগমে—বিজ্ঞানাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই আগম ও নিগমোক্ত সাধনাই বেদগর্ভ 'তান্ত্রিক-সাধনা' বলিয়া কীর্ত্তিত। গৃহস্থের নিত্য ক্রিয়া হইতে শৈব, সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব ও গাণপত্যরূপ সাধক-পঞ্চকের অনুকূল পঞ্চ-সগুণ উপাসনা † ক্রমে নির্গুণ-ব্রহ্মসাধনা পর্য্যন্ত সমস্তই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। সর্ব্ববর্ণগুরু ব্রাহ্মণ-দিগের গায়ত্রী ও সন্ধ্যাদির 'ঔপপত্তিক' অংশ (থিয়োরিটিক্যাল পার্ট) যাহা বেদে বর্ণিত আছে, তাহারই 'ক্রিয়াসিদ্ধাংশ, বা সাধনাংশমাত্র (প্রাকটিক্যাল পার্ট) তন্ত্রে পূর্ণ ও অতি বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সরল ও আশু ফলপ্রদ প্রত্যক্ষ সাধনতত্ত্ব ইহা ব্যতীত আর কোন শাস্ত্রেই নাই। তাই তন্ত্র আবার 'গুরুশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

---

* পরে 'আগম' ও নিগমে 'দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব' দেখ।

† পূজাপ্রদীপে 'উপাস্য-ভেদ' দেখ।

তন্ত্রের কাল।

যুগ-ভেদে জীবের অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে নবশিক্ষিত পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় অনেকেরই মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে। তাঁহাদের আদর্শে ও সংঘর্ষে আমাদিগের মধ্যেও সে ভাব ক্রমে বিষম সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। কালধর্ম্মে অধঃপতিত আর্য্যসন্তান আজ প্রখর অনুকরণবশে এতই উন্মত্ত যে, পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাইয়া, অনাদি বা চিরপুরাতন আর্য্য শাস্ত্রেরও বয়স-নিরূপণে অগ্রসর হইয়াছে। মাথা নাই, মুণ্ড নাই, ভাষার গতি বা ভাবের তারতম্য দেখিয়া, আজ বেদের এবং ব্রহ্মারও জন্মলগ্ন লইয়া বিচার চলিতেছে। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রই বা তাঁহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবে কেন? কাহারও মতে তন্ত্রশাস্ত্র পাঁচ শত বৎসরের, কেহ বা তাহা অপেক্ষাও নবীন বা দুই এক শতাব্দীর পূর্ব্বেই লিখিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কোন কোনও মহাত্মা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন তাঁহারা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অবজ্ঞায় হাস্য-সংবরণ করিতে পারেন না। পূজ্যপাদ গুরুমণ্ডলী বলেন—বাপু, যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র যদি নিতান্ত আধুনিকই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? সাধনার ধন প্রকৃত সাধকেই তাহা বুঝিবে। যথার্থ সাধনাকাঙ্ক্ষী কখন কি শাস্ত্র দেখে? গুরুমুখাগত-বিদ্যা 'সদ্য-নূতন' বলিয়া যে অতি সমাদরে তাহারা গ্রহণ করে, নূতন কি পুরাতন এ বিষয় বিচার করিবার অবসর বা আবশ্যকও তাহাদের থাকে না। অনাদি মূল শাস্ত্রে কেবল ইঙ্গিত-দ্বারা যাহা অক্ষয় মূল-সূত্ররূপে বিরাজিত, তন্ত্রে তাহাই প্রত্যক্ষ সাধনানুকূল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। গুরুকৃপায় তাহারই রহস্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সাধনায় আনিতে হয়। প্রাচীন বা আধুনিক বিচারে কোনই ফল নাই। তন্ত্র বলিয়া কেন—কোন শাস্ত্রই এরূপ শুষ্ক বিচারের সামগ্রী নহে—সারগ্রাহী হইতে হইবে। যদি শর্করার মধুর আস্বাদ গ্রহণই

শর্করা-সেবনের সার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বৃথা কালব্যয় করিয়া শর্করার মূলীভূত ইক্ষুদণ্ড, তাহার ক্ষেত্রপাল বা তাহার রোপণাদির কাল নির্দ্দেশে ফল কি? তাহা আধুনিক হউক বা প্রাচীন হউক, সে বিচারে লাভ কি? মধুরতা লইয়াই ত কথা!

আমাদিগের শাস্ত্রাদি যথার্থই অনাদি, অর্থাৎ এত প্রাচীন ও জটিল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সহিত সংযোজিত যে, ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত সে সকলের কালনির্ণয় করা অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ দুরাশা। তবে যাঁহারা না কি তন্ত্রশাস্ত্রকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগকে একবার মার্কণ্ডেয় ষট্-সংবাদ 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর' মর্ম্ম বুঝিতে অনুরোধ করি, আর একবার 'শ্রীমদ্ভাগবত' আদি পুরাণগুলির কথাও স্মরণ করাইয়া দিই।

'দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী' ভারতের সর্ব্বত্র 'তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ ও অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া যেমন অতীব ভক্তিভাবে পূজিত, 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থও তেমনই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ও অতি আদরের ধন। তাহার একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন—"হে নৃপ, যে সময় ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু মনুষ্যেরা বেদ ও তন্ত্রোক্ত কর্ম্মের দ্বারা ছত্র চামরযুক্ত মহারাজোপলক্ষিত পুরুষের পূজা করিতেন * ইত্যাদি।" পরে তিনি পুনরায় বলিতেছেন:—"কলিযুগে নানা তন্ত্রবিধানে পূজার ব্যবস্থার কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।" † এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন—"নানা তন্ত্রবিধানেনেতি কলৌতন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।" উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান অন্যত্র বলিতেছেন—"বৈদিক, তান্ত্রিক

---

* তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণং। যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥" শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ—৫ অঃ—২৬ শ্লোক।

† "নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥" ঐ ১১।৫।২৮ শ্লোক।

এবং বেদতন্ত্রের মিশ্রণভূত বিধান দ্বারা লোকে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।" ‡

কূর্ম্ম, স্কন্দ, পদ্ম, বরাহ ও বায়ু আদি সকল পুরাণেই তন্ত্রের উল্লেখ আছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণের ও মহাভারতের মধ্যেও যেমন তন্ত্রের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, স্মৃতিশাস্ত্রমধ্যেও তেমনই তন্ত্রের যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। 'দত্তাত্রেয়'-সংহিতা আদিতেও তন্ত্রের উল্লেখ আছে। অধিক আর কি বলিব, জগতের যিনি আদি বিদ্বান বা যাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়া ব্রহ্মা নিজের মানসপুত্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেত, সেই মহর্ষি কপিলও তাঁহার প্রসিদ্ধ 'সাংখ্যশাস্ত্র' 'ষষ্টিতন্ত্র' নামে প্রচার করিয়াছিলেন। ('জ্ঞানপ্রদীপে'—"কপিল ও গঙ্গাসাগর-প্রসঙ্গ" দেখ।)

বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব-সময়ের যে অধোম্নায় বা আসুরিক তন্ত্রগুলির বহুল প্রচার বা ভয়ানক বিকৃতি দৃষ্টি করিয়া ভগবান্ গৌতম্ "অহিংসাপরমোধর্ম্মঃ" বলিয়া জগতে পুনরায় সাত্ত্বিক-তন্ত্রাবলীর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যে উপদেশাবলীর কঙ্কালমাত্র অদ্যাবধি 'সিদ্ধাশ্রমে' অর্থাৎ তিব্বত প্রদেশে 'বৌদ্ধতন্ত্র' বলিয়া প্রচলিত—সেই মূল তন্ত্রশাস্ত্র যে হুজুগ প্রিয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের রহস্যের সামগ্রী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তিব্বতীয়গণের প্রধান উপাস্য যে 'তারাদেবী, এবং হিন্দুদিগের পীঠাবলীর মধ্যে প্রধান তারাপীঠ যে 'মহাচীন' প্রদেশেই চিরকাল বিরাজিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বহু পূর্ব্বে মিশরদেশে যে 'তেওধর্ম্ম' প্রচলিত ছিল, তাহাতেও আর্য্য-তন্ত্রের প্রদীপ-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। 'তেও' শব্দ যে, তন্ত্রেরই অপভ্রংশ শব্দমাত্র তাহাতে

‡ "বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ।" ঐ ১১।২৭।৭

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চীন-প্রত্যাগত পরিব্রাজক জনৈক সন্ন্যাসী বন্ধুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, সেই তারাদেবীর মন্দিরস্থ দ্বার-শীর্ষে এখনও বঙ্গাক্ষরে 'প্রণব' অক্ষরটি অতি সুন্দরভাবে খোদিত আছে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেবও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ ত্রেতায় 'তারা-উপাসনা' করিয়াছিলেন, এবং তদুদ্দেশে তন্ত্রোক্ত চীনাচার বা অঘোরাচার গ্রহণ করিয়া মহাচীনস্থ তারাপীঠে গিয়াছিলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ তাঁহার অনুসন্ধানে তথায় তাঁহার সেই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "বৎস! যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যের অন্যতম শাখা প্রাচীন মিশরীয়গণের পুরা-ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, তাহারাও আমাদিগের ন্যায় ব্রহ্মশক্তির আরাধনা-পথে গূঢ় তান্ত্রিক-সাধনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা গুহ্য সাধন-শাস্ত্র-সঙ্গত 'শিব শক্তির' আরাধনা করিতেন, কালক্রমে শিক্ষা ও সাধনার অভাবে তাঁহাদের মধ্যেও নানা বীভৎস ও বিকৃত অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছিল।

অসুর-গুরু মহাকৌল শুক্রাচার্য্যদেব তাঁহার প্রসিদ্ধ 'শুক্রসংহিতা' মধ্যেও তন্ত্রের উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

> "* * * কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞাস্তান্ত্রিকাশ্চ য।
> যেচান্যে গুণিনঃ শ্রেষ্ঠা বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
> তান্ সর্ব্বান্ পোষয়েদ্ভৃত্যা দানৈর্ম্মানৈঃ সুপূজিতান্ ।"

অর্থাৎ "বেদ-স্মৃতি-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞ, তন্ত্রজ্ঞ বা সাধন-শাস্ত্রাভিজ্ঞ এবং অন্যান্য যে সকল গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি হইবেন তাঁহাদিগকে, বৃত্তি, দান, সম্মান ও পূজা দিয়া পালন করিবে।" এই উপদেশ-বাক্য দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে, সেই প্রাচীন যুগে বেদস্মৃত্যাদি

কর্ম্মানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণমাত্রেই যে কুলীন বা কৌলসাধক হইতেন, তাহা নহে, যিনি শ্রুতিস্মৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অতিরিক্ত উপাসনামূলক শাম্ভবী-শাস্ত্রানুসারে সাধন-ভজন ও জপ পূজার্চ্চনাদি করিতে পারিতেন ও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতেন, তাঁহারাই যথার্থ 'তান্ত্রিক' বলিয়া তখন অভিহিত হইতেন। শুক্রাচার্য্যদেব স্থানান্তরে সেই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

"শ্রুতিস্মৃতীতরৈর্ম্মন্ত্রানুষ্ঠানৈর্দ্দেবতার্চ্চনম্।
কর্ত্তুং হিততমং মত্বা যততে স চ তান্ত্রিকঃ॥"

যাহা হউক, তন্ত্রশাস্ত্র যে নিতান্ত আধুনিক নহে, পরন্তু বেদের সাধনাংশমাত্র তাহা বলাই বাহুল্য। তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহ নবকল্পিত, অমূলক বা অনিত্য নহে—সে সমস্তই বেদমূলক এবং সনাতন। মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকায় মহাত্মা 'কুল্লুকভট্টোদ্ধৃত নিম্নোক্ত হারীত-বচনে' তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ, শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

অর্থাৎ এইবার আমরা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিব। ধর্ম্ম শ্রুতিপ্রমাণক। সেই শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ('জ্ঞানপ্রদীপে, 'সনাতন ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা' দেখ)।

"বেদপ্রমাণকং শ্রেয়ঃসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্ম ইতি।"

বেদবিহিত শ্রেয়ঃসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের নাম 'ধর্ম্ম'। অর্থাৎ সামান্যতঃ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড। তাহা শ্রুতি-প্রমাণক। "শ্রুতিস্তু বেদবিজ্ঞঃ॥" (মনু ২।১০), শ্রুতিকে বেদ বলিয়া জানিবে! এস্থানে শ্রুতি শব্দে কর্ম্ম-নির্ব্বাহক বেদমন্ত্র। সেই বেদমন্ত্র—দ্বিবিধ। যথা বৈদিকী ও তান্ত্রিকী।

"এতেন তন্ত্রাদীনামেবাম্নায়ত্বমায়াতং। তুল্যপ্রমাণত্বজ্ঞাপনায়তু শ্রুতিবেদাম্নায়ানামেক-পর্য্যায়তামমরসিংহেন স্বীকৃতা। অতএব মেরুতন্ত্রে প্রথম পটলে "ন বেদঃ প্রণবংত্যক্তা মন্ত্রো বেদসমুত্থিতঃ। তস্মাদ্বেদপরোমন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃত ইতি তন্ত্রাণাং বেদাঙ্গত্বমুক্তং। বেদে পরো বেদপর উত্তম ইত্যর্থ। বেদা মন্ত্রা একাঙ্গানি যস্ত স তথা।" *

আগম বেদেরই অঙ্গ।

অতএব তান্ত্রিক-মন্ত্র বা তাহার উপাসনা যে আধুনিক, এ কথা উন্মাদের উক্তি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কাষ্ঠের মধ্যে যেমন গন্ধ এবং দুগ্ধের মধ্যে যেমন অমৃত অলক্ষিত ভাবে বর্ত্তমান আছে, বেদের মধ্যে সেইরূপ তাহার সাধনাতত্ত্ব বা 'তন্ত্র' ওতপ্রোতভাবে সংযোজিত আছে। পূরাকাল হইতে ব্রাহ্মণগণ সাধারণ-সমক্ষে দিবসে বৈদিকাচারী থাকিয়াও, রাত্রিতে অতি গুপ্তভাবে 'তান্ত্রিক-সাধনা' করিতেন। 'নিরুত্তর-তন্ত্রে' সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

"রাত্রৌ কুলক্রিয়াং কুর্য্যাদ্দিবা কুর্য্যাচ্চবৈদিকীং।"

বর্ত্তমানযুগে বৈদিক বা তান্ত্রিক কোন কর্ম্মই কেহ বিধিবিহিতরূপে করিতে সমর্থ নহে বা সে সকল কর্ম্মে তাহারা অনভিজ্ঞ। তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাধকগণের মধ্যেই "মাতৃজারবৎ গোপ্যা" ছিল। চিরকাল "ফ্রিমেসনলজের" (Freemason's Lodge) ন্যায় প্রাণান্তেও কেহ অনধিকারীকে কোনও কথা বলিতেন না। মধ্যযুগে অনধিকারিগণের মধ্যেই তন্ত্রশাস্ত্রের কোন কোনও বাহ্য-অনুষ্ঠান অংশ প্রকাশিত হইয়া ক্রমে তাহার অপব্যবহার হইয়াছে এবং উত্তরকালাবধি অনেক নূতন বিষয়ও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মান্তর-বিশ্বাসী হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অত্যাচারে প্রায় ধ্বংসে পরিণত তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে পরবর্ত্তী সময়ে স্থানে স্থানে অনেক নূতন ভাব ও ভাষাও যে প্রবর্ত্তিত হয়

* 'জ্ঞানপ্রদীপে'—সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি, উদারতা ও ব্রহ্মবিদ্যা দেখ।

নাই, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা বলিয়া আর্য্যদিগের তন্ত্র বা যে কোনও মুলশাস্ত্রই আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তবে "সাময়িক" ভাবে কোন কোনও মহাত্মা দ্বারা সেই শ্রুতিময় তন্ত্র সকল সাময়িকীভাষায় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে এবং হইবে তাহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। সাধকেরা বলিয়া থাকেন ও আর্য্যসন্তান মাত্রেই অভ্রান্ত-ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কত সত্য, ত্রেতা. দ্বাপর ও কলিযুগ গত হইয়া গিয়াছে, প্রতিকল্পের প্রত্যেক কলিযুগেই বিশেষভাবে বা প্রকটভাবে দেবাদিদেব শ্রীসদাশিবের কথিত সেই তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ সনাতন-ধর্ম্মনিষ্ঠদিগের একমাত্র মুক্তির পথ-প্রদর্শক হইয়াছে। সুতরাং সেই অনাদিশ্রুতির গুপ্ত সাধনার বিজ্ঞানাঙ্গ এই 'তন্ত্রশাস্ত্র' আধুনিক বলিব কেমন করিয়া? এখনও পর্য্যন্ত যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রে যথার্থ অভিজ্ঞ ও সাধনপরায়ণ, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ অতি গোপনভাবেই তাহার অনুশীলন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই সে কথা বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত ব্যাক্তি তন্ত্রের সাধারণ উপদেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্রের গূঢ়রহস্যে একেবারে অনভিজ্ঞ। সেই কারণ তাঁহাদের ভ্রমপূর্ণ অনুষ্ঠান দ্বারা সংসার ভীষণ সাম্প্রদায়িক-ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। মন্ত্র-চৈতন্য না হওয়াতে তাঁহাদের সকল সাধন-ক্রিয়াই এক্ষণে নিষ্ফল হইয়াছে। অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে তন্ত্রের গুহ্য-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়া বহু সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাহার নানা কদর্থ করিয়া স্বয়ং ত কদাচারী হনই, পক্ষান্তরে সংসারকেও তাঁহারা পৈশাচিক-ক্রিয়ার লীলাভূমি করিয়া তুলেন। এই হেতু সাধারণে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, সুতরাং তন্ত্রসম্বন্ধে যা' তা' নানা অবজ্ঞার কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা মহামায়ার কৃপায় সাহস করিয়া বলিতে পারি—

যদি তাঁহারাই কোন দিন যথার্থ সৎসাধন-মার্গে উপনীত হন, তাহা হইলে সাধনার বিমলস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন।

তন্ত্রই সাধনার সোপান।

তন্ত্র, সাধনার অপূর্ব্ব সোপান। ধীরে ধীরে অতি নিম্নস্তর হইতে ক্রমে উচ্চ, সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতব্রহ্মসাধনা পর্য্যন্ত এমন সরল ও সুনিয়মিত সোপানাবলী আর কিছুতেই নাই।* তাই ইহার নাম "তন্ত্র"। তন্ত্র—তন্ (বিস্তার করা) + ত্র (ত্রাণ করা বা মুক্ত করা)। পরমাত্মা হইতে যে ভাবে আত্মবিন্দু অবিদ্যা বা কারণ-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রথমে কারণদেহ, পরে সূক্ষ্মদেহ, পরিশেষে স্থূলদেহে বিস্তার লাভ করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন জীবরূপে পরিণত হইয়াছে, যে অব্যর্থ সাধনোপায় দ্বারা সেই তন্ বা তনু অর্থাৎ জীব ভাবময় দেহত্রয় হইতে ত্রাণ বা মুক্ত হইতে পারে তাহারই নাম তন্ত্র। সেই কারণেই তন্ত্র সাধনার সোপান বলিয়া উক্ত। অনাদিযোগী দেবাদিদেব শ্রীসদাশিব জীবমাত্রেরই কল্যাণকামনায় সেই তন্ত্র বা সনাতন আগম শাস্ত্রের উপদেশ 'গুরুমুখে' প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তন্ত্রোক্ত 'পঞ্চ-মকার' অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই তত্ত্বগুলি রহস্য বা ক্রমোন্নত সাধনার উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া অনেকেই তন্ত্রের ঘোর নিন্দা করিয়া থাকেন। আরও আক্ষেপের বিষয়, সুবিজ্ঞ গুরুর অভাবে অধিকাংশ তান্ত্রিকসাধকও তন্ত্রতত্ত্ব অবলোকনে একেবারে অন্ধ হইয়া আছেন। পূর্ব্বভাগ 'ভৈরব ডামর' তন্ত্রে উক্ত আছে :—

তন্ত্র, কবি-কল্পনা নহে।

"তন্ত্রাণি গুরুগম্যানি শিববক্ত্রোক্তানি বিশেষতঃ।
কবিভির্নৈব বুধ্যন্তে শাস্ত্রেরথা যথোদিতাঃ॥"

শিববক্ত্র-বিনিঃসৃত 'তন্ত্রশাস্ত্রের' অর্থ কেবলমাত্র গুরুপরম্পরায় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, ইহা কবি-কল্পনার বস্তু অথবা বিদ্বজ্জনের বাক্য

* "পূজাপ্রদীপ"—'পূজা ও উপাসনা-ভেদ' এবং 'উপাস্য' ও 'উপাসক-ভেদ' দেখ

বা আভিধানিক অর্থের অনুঃস্যূত নহে। সনাতন সাধন-শাস্ত্র সর্ব্বত্র ত্রিবিধ ভাষা বা ত্রিভাবাত্মক ; অর্থাৎ লৌকিকীভাষা, পরকীয়াভাষা ও সমাধি ভাষা বা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সাধনার্থ-প্রকাশক তিন প্রকার ভাবাত্মক অপূর্ব্ব ভাষার দ্বারা একাধারে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ অধিকারী তিন শ্রেণীর সাধকেরই কল্যাণপ্রদ। *

শাস্ত্র, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত নহে

শাস্ত্র সকলেরই জন্য ; কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য তাহা নিরূপিত নহে। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের জন্য করিতে হইলেই তাহা যেন অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ফলে তাহাতে বিবিধ উৎপাত অনুষ্ঠিত হইয়া সাম্প্রদায়িক বা উপধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া যায়। সেইহেতু জগতের সকল ধর্ম্মই, সাধারণতঃ ঐ সকল ধর্ম্মের প্রথম উপদেষ্টা বা আদিগুরু ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উপদেশ যখন যে উদ্দেশ্যে প্রদান করেন, সময়ে শিষ্যগণুলীদ্বারা তাহা যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত না হইয়া ক্রমে বিকৃত ও বিভৎস্ হইয়া যায়. ইহাই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। মহাত্মা শ্রীমৎ চৈতন্যদেব বা অবধূত-গৌরাঙ্গ প্রভু-প্রবর্ত্তিত উদার বা সার্ব্বজনীন্ 'বৈরাগ্য ধর্ম্মই' ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। যিনি নিজ পিতা, মাতা, স্ত্রী ও আত্মীয় আদি, লৌকিক সংসারের সকল সম্বন্ধ ও প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত সন্ন্যাসীরূপে বৈরাগ্য-ধর্ম্মের সুবিমল ও সমুচ্চ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহত্যাগ বা (মুক্তি) বৈকুণ্ঠলাভের অব্যবহিতপর হইতেই তাহা প্রায় লোপ পাইয়াছে। তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ শ্রীমৎনিত্যানন্দ প্রভুকেও সেই বৈরাগ্যপথের অনধিকারী বোধে গৃহে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারই আদর্শ 'বৈরাগ্য পন্থা' আর অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারিল না। তিনি যে শিখাসূত্রত্যাগী মুণ্ডিতমুণ্ড সন্ন্যাসীর শিষ্য, স্বয়ং সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস সংস্কারে

* "গীতা-প্রদীপে"—'গীতা-ত্রিভাবাত্মক' দেখ।

২

সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাহার শিষ্যসম্প্রদায় এখন শিখাগুচ্ছ-পরিশোভিত-মস্তক হইয়াও 'বৈরাগী'-নামধারী, কৌপীনমাত্র অবলম্বন করিয়াও সন্ন্যাসী-বিদ্বেষী এবং এক বা ততোধিক সেবাদাসী লইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-ধ্বংসকর কামকীটরূপে নূতন সংসারের সৃষ্টি করিতেছেন। সেই সুপবিত্র ও সমুচ্চ বৈষ্ণব বা বৈরাগ্য-ধর্ম্মকে কলুষিত করিয়া এখন তাঁহারা নূতন সাম্প্রদায়িক-বন্ধনের বশবর্ত্তী হইতেছেন এবং তৎসহ এক নূতন অদ্ভুত উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ ঘটনা কেবল বৈষ্ণবেই নহে, অপিচ 'শাক্ত' 'বৌদ্ধ' 'খৃষ্টান' 'মোসলমান' ও 'ব্রাহ্ম' আদি সকল সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের মধ্যেই ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবৃত্তিময় সংসারের জীব প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবৃত্তির নব নব উর্ম্মিরাশি হৃদয় মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া সংসারের কেবল নিম্নমুখী ভোগের পথেই অতি প্রবলবেগে ছুটিতেছে। সে প্রচণ্ড ভোগবেগের প্রতিকূলে উন্নতমুখী বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিবায়ু কেবল ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা তুফানরাশির সৃষ্টি ব্যতীত আর কোনও ফলই উৎপাদন করিতে পারে না। সেই কারণ মহাযোগী মহাদেব প্রত্যেক জীবের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও মিশ্রজ বিবিধ গুণনির্ব্বিশেষে যথোপযুক্ত সাধনার বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই বিধিসমূহ আবার সদ্গুরুর বিজ্ঞানময় প্রত্যক্ষ উপদেশ বাক্যে সংরক্ষণ করিয়াছে।

তন্ত্র গুরুপরম্পরা-গত বিদ্যা।

"ইয়ং পরম্পরা বিদ্যা গুরুবক্ত্রাদ্বিনির্গতা।
শ্রুতা যেনৈব বিধিনা জায়তে তেন সর্ব্বথা॥"

যে মনুষ্য যেরূপ আচার, যেরূপ ভাব ও যেরূপ সাধনার অধিকারী, সে ব্যক্তি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে, তবেই ফলভোগী হইবে—"যে যত্রাধিকৃতা মন্ত্রাস্তে তত্র ফলভাগিনঃ।" গীতোপনিষদে' শ্রীভগবানও অর্জ্জুনকে সেই-

জন্যই বলিয়াছেন যে, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্॥" অর্থাৎ অনধিকারী অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকারের বহির্ভূত জ্ঞান ও সাধনোপদেশরূপে বুদ্ধি ভেদ করিও না, তাহাতে বিষম ফলই উৎপন্ন হইবে। অতএব সাধন-সময়ে শিষ্য গুরুর নিকট সতত উপস্থিত থাকিয়া বা ভক্তিভাবে গুরুকে সম্মুখে আনিয়া সাধনোপদেশ গ্রহণ করিবে। তিনিও তাহাকে তাহার অধিকার অনুসারেই উপদেশ করিবেন। শিষ্য অর্থে শাসনযোগ্য, যে আত্মোন্নতির জন্য শাসন চায়। সুতরাং শিষ্য আত্মদোষ বিনাশের জন্য সতত গুরুমুখাগত হইয়া তাঁহার আদেশ বিনীত মস্তকে প্রতিপালন করিবেন। ইহাই তাঁহার গূঢ় আদেশ; নতুবা জীব নিশ্চয়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সংসারের জঞ্জাল উৎপাদন করিবে মাত্র। ফলে অধুনা তাহাই হইতেছে। অধিকাংশ স্থলে তন্ত্রানভিজ্ঞ কেবল পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়াই সঙ্কেতময় তন্ত্রশাস্ত্র হইতে লৌকিক ভাবানুরূপ স্বীয় মনোগত কর্ম্ম স্বয়ং করিয়া এবং শিষ্যমণ্ডলীকেও সেইরূপ ভ্রান্ত উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া, শাস্ত্র ও সমাজ উভয়ই কলুষিত করিতেছেন।

এই কথা উত্তরভাগ "ভৈরব ডামর" তন্ত্রে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে:—

"বিদ্যাবলেন যঃ কশ্চিৎ আগমার্থং বিচারয়েৎ।
পরান্ শিশতি ধর্ম্মার্থং সগচ্ছেন্নরকে ধ্রুবম্॥"

তন্ত্রোপদেষ্টা গুরু।

যিনি কেবল স্বীয় বিদ্যাবলেই আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ বিচার করিতে যান এবং অন্যকেও তাহা শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই নরকগামী হন। তন্ত্রে এ কঠিন আদেশ বার বার উল্লিখিত আছে। তন্ত্রে একটী মুহূর্ত্তও গুরুর সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপদেশ নাই। আগম-উপদেষ্টা উপযুক্ত গুরু যে সাধারণ 'কাণ-ফুঁকা' গুরুর ন্যায় কর্ণে মন্ত্র দিয়াই বৎসরান্তে বার্ষিক

প্রণামী ভোগ করিবেন, তাহা নহে। অশ্বের বল্গা ধারণের ন্যায় সততঃ শিষ্যের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং আবশ্যক বোধে তাহাকে যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিবেন। ইহাও তন্ত্রের বিশেষ আদেশ. এবং এইরূপ হওয়াই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। বিদ্যালয়ের সামান্য পাঠ্য শিক্ষা করিতে শিক্ষকের কত মনোযোগ—কত তীব্র লক্ষ্যের আবশ্যক হয়, আর এই সর্ব্ব-বিদ্যাসার ভগবত্তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষাকালে গুরুর কোন প্রকার দায়িত্ব নাই, অথবা শিষ্যেরও গুরুর প্রতি কোন নির্ভরতা নাই তাহা কি কখন সম্ভব না সঙ্গত?

অধুনা ভণ্ড-ব্যবসায়ী স্বয়ং অসিদ্ধ বা অনধিকারী এইরূপ গুরুগণের দ্বারা সমাজের যে কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে। তাঁহারা কেবল শিষ্যের বিত্ত বা ধন কেমন করিয়া আদায় করিবেন, সেই চিন্তাই সতত করিয়া থাকেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ বা ভবদুঃখ নাশের কোন ভাবনাই রাখেন না। বাস্তবিক ত্রিতাপহারী যথার্থ গুরু অধুনা অতীব দুর্ল্লভ।

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপনাশকঃ।"

সৎলোকের জন্য সাত্ত্বিক উপদেশ ফলপ্রদ, কিন্তু প্রবৃত্তিস্রোতে প্রধাবিত কলুষিতাত্মা অসতের জন্য কি উপদেশ? গুরুমণ্ডলী বলেন—জ্ঞানীর ধর্ম্মে আর অজ্ঞানীর ধর্ম্মে অনেক প্রভেদ। সতের জন্য যেমন কঠিন সাত্ত্বিক শাস্ত্র, অসতের জন্যও ত তেমনই কোনও সহজসাধ্য শাস্ত্রোপদেশ আবশ্যক? শ্রীসদাশিব সেই কারণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে সাধনা-প্রণালীর ক্রমোন্নত উপদেশ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। উপযুক্ত গুরু হইলেই পাত্র-নির্ব্বিশেষে সে রহস্য-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তামসিকাচারী অধম ব্যক্তিদিগের পক্ষে তন্ত্রের নিম্নস্তরনির্দ্দিষ্ট যে সকল সাধনার বিধি

আছে, তাহাও উপদেশের অভাবে অধুনা ভয়ানক বিকৃত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। লোকে তাহাই লক্ষ্য করিয়া সহসা তন্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকে ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ভাবিয়া তন্ত্র বা সাধনার গুপ্ত বিষয়গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু রহস্যময় তন্ত্রের ক্রমোন্নত পূজাপদ্ধতি * দেখিলে সাধারণের সেই ভ্রম একেবারেই তিরোহিত হইবে।

'ভৈরব ডামর' তন্ত্রের উত্তর ভাগে স্পষ্ট লিখিত আছে :—

"দুষ্টানাং মোহনার্থায় সুগম তন্ত্রমীরিতম্।
নাতঃপরতরং শাস্ত্রং কঠিনং মহদদ্ভুতম্॥"

বাস্তবিক দুষ্ট কদাচারী ও হতভাগ্য ব্যক্তিগণের মোহনের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র সুগম ও তাহাদের প্রকৃতির অনুকূল করিয়া দ্ব্যর্থভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপযুক্ত গুরু প্রথমে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনুরূপ লৌকিক আনন্দপ্রদ সহজসাধ্য সাধনার উপদেশ দ্বারা তাহাদের সাধন-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করিয়া দেন, পরে শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া যথাসময়ে সেই পরম অদ্ভুত, কঠিন ও অতি গূঢ় শাস্ত্র-রহস্যের ক্রমোন্নত ব্যাখ্যা করিয়া যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত মাতৃভাব তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য।

সর্ব্বধর্ম্মের উপদেষ্টা ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণের যে ধর্ম্ম করণীয়, তাহার প্রসার কত দূর ব্যাপী! তাহা কি কখন কোনও ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডির অন্তর্ভূত হইতে পারে? জীবমাত্রই মাতৃগর্ভসম্ভূত। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি সকলেই মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হয়। মাতার সেই স্নেহকণা হইতে জীবশ্রেষ্ঠ ধী-শক্তি সম্পন্ন মানব যাহা শিক্ষা করে, তাহা চিরদিনের তরে তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তাহাই পাত্রনির্ব্বিশেষে তরল পদার্থের ন্যায় কখন ভক্তি, শ্রদ্ধা ; কখন প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ;

* "পূজা প্রদীপে" সাধনার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পারিবে।

কখন বা স্নেহ, মায়া ও দয়ারূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ জল বা যে কোনও তরল পদার্থ স্বতই যেমন ঢল ঢল করে ; থালা, ঘটি, বাটী বা যে কোনও আধারে তাহা রক্ষিত হইলে, সেই আধারের অনুরূপ আকারেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংসারিক-চতুরতা-বিহীন শৈশবলব্ধ পবিত্র মাতৃস্নেহও মানবের বয়োবৃদ্ধি বা সাংসারিকতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাময়িক হৃদয়াধারের অনুরূপ নানা মূর্ত্তি ধারণ করে। জগতে এমন কে আছেন, যিনি মাতৃস্নেহের সে অনির্ব্বচনীয় শক্তি ভুলিতে পারেন ? অথবা এমন কে আছেন, যিনি একদিনও সে শক্তির কণামাত্র কৃপা লাভের জন্য উপাসনা করেন নাই ? অনেকে কেবল যেন যৌবন-সুলভ চিত্তচাঞ্চল্য হেতু পূর্ণ বোধে প্রথমে সেই পরমা শক্তির অংশ মাত্রকেই প্রেম অথবা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বা পরে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপাসনারূপ সাধনা অবলম্বন করেন, কিন্তু সময় হইলে আবার শুদ্ধ শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তিসহ সেই পূর্ণ বা মূল শক্তি অতুলনীয় মাতৃস্নেহের উপাসনা করিবার অধিকারী হন।

মানব যখন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে এইরূপে আকাঙ্খিত শান্তিলাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়, যখন সংসারের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়া ক্রমাগত হাবুডুবু খাইতে থাকে, কিছুতেই প্রাণের তৃপ্তিলাভ হয় না, তখন মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত ভয়কম্পিত শিশুসন্তানের মত 'মা' 'মা' করিয়া এই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের মধ্যে মাতৃক্রোড়ের ন্যায় শান্তিময় একটুকু আশ্রয় পাইতে চায়। ইহা স্বাভাবিক, ইহা প্রকৃতির নিয়ম, তাই ভারতের তত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিগণ শিবপ্রোক্ত বিশ্বজনীন অপরিহার্য্য মাতৃতত্ত্বের মহাসত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কত যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এই অনুপমেয় মাতৃতত্ত্বের বিন্দুমাত্রও ক্ষয় হয় নাই, হইবারও নহে ; জ্ঞানদৃপ্ত পাশ্চাত্য-ধর্ম্মমণ্ডলিমধ্যেও সে ভাবের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ক্রমে দেখা দিয়াছে। সেই মূলাধাররূপিণী মহাশক্তি 'মা' আমার ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে

বিরাজমানা। শ্রীসদাশিব তন্ত্রেই সেই মাতৃস্নেহের আরাধনা বা পূজা করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্রী বেদপ্রসূ গায়ত্রীরূপিণী মাতৃশক্তির আরাধনা তাই তন্ত্রের সর্ব্বপ্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রোক্ত সাধনাপ্রণালী এই কারণেই সার্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদিসম্মত। জননীর নিকট সকল সন্তানই যে সমান, সুতরাং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব তাহার মধ্যে স্থান পাইবে কেন ? জীবের প্রথম বাক্যস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে যে ভগবদ্দত্ত অনাদি শব্দ বা নাম জীবরসনায় প্রথম উচ্চারিত হয়, সেই পরমাদ্ভূত এই 'মা' 'মা' শব্দের তুলনায় এমন পবিত্র, এমন সুললিত, এমন প্রাণ-মন-বদনভরা নাম আর কি আছে ? যে সন্তান 'তাঁহাকে' মাতৃভাবে না বুঝিয়া অন্য ভাবে বুঝিতে চায়, সে কি মাতৃদ্রোহী নয় ? সে যে অসুর, সে যে স্বার্থপর ! সে মহাভক্ত হইলেও, তাহার কথায় আদৌ শ্রদ্ধা হয় না ! সদ্যঃপ্রসূত জীব সংসারের হিংসা দ্বেষ ও কুটীলতা-পরিশূন্য-হৃদয়ে মাতৃভাবের যে অব্যক্তভাব হৃদয়ে পোষণ করে, বস্তুতঃই তাহার তুলনা এ বিশ্বচরাচরে নাই ! আমরা সাধনরাজ্যে মায়ের সেই অনাবিল চিরপ্রফুল্ল সরল শিশু হইয়াই থাকিতে চাই। সখ্য, প্রেম বা তর্কসঙ্কুল জ্ঞানের কোন কথাই তখন বুঝি না, অথবা তাহা বুঝিবার ইচ্ছাও রাখি না। কেবল জানি 'মা' 'মা'। এই সরল বিশ্বাসের ফলে 'মা' আমার যা' করেন, তাহাই হইবে। আমার ক্ষুধা পাইলে 'মা', পিপাসাতে 'মা', কষ্ট পাইলে 'মা', নিদ্রাকালে 'মা', ভয় আতঙ্কেও 'মা', মায়ের স্নেহ তিরস্কারেও সেই 'মা', মার ক্রোড় ছাড়িলে আর আমার উপায় নাই ! তাই অপুষ্ট সন্তান সততই 'মা' নামে পাগল ! মাতৃহারা শিশু কতক্ষণ বাঁচিবে ? মাগো জগজ্জননি—তোমার সকল সন্তান ত সমান নয় মা ! আবার অনেকেই যে অবোধ, তাহাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে তোমার অনন্তশক্তি বুঝিবার সামর্থ্য প্রদান না করিলে, তোমায় চিনিতে পারিবে কেন মা ?

এ বিপ্লবের দিনে মাতৃ-সেবার কি মূল্য আছে? হায়! হায়!! যাহারা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, বলিতে লজ্জা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে আজ লৌকিক ভাবেও মাকে একমুষ্টি অন্ন দেয় না! মাগো, তাই বলি অবোধ সন্তানের অপরাধ নিস্‌নে মা, কেবল তোর মহিমা বুঝিবার শক্তি আর 'মা' বলিয়া ডাকিবার অবসর দে মা! সাধকাগ্রগণ্য সাধন-জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ মাতৃস্নেহে বিভোর হইয়া তাই গাহিয়াছিলেন—

"জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে, (শ্যামা মা!)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদি পরে।
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী, কভু শ্যামসোহাগিনী,
কভু রাধার পায়ে ধরে।
কখন বিশ্বজননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী, কভু কুল-কুণ্ডলিনী
চতুর্দ্দল পদ্মোপরে।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা, তাই ডাকি মা
বলে মা মা, ঐ অভয় চরণ পাবার তরে॥"

সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বা সাবালক হইলে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে মাতৃসাধনায় পুত্র সুপুষ্ট হইলে, মাতৃদেবীই সাধনার নূতন ব্যবস্থা বলিয়া দিবেন।

'রাধাতন্ত্রে'তাই মা, ভগবান বাসুদেবকে এইরূপ বলিতেছেন,—

"বাসুদেব মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ।
ত্বংহি দেব সুতশ্রেষ্ঠঃ কিমর্থং তপ্যসে তপঃ॥
কুলাচারং বিনা পুত্র নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শক্তিহীনস্তু তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক॥
মমাংশসম্ভবাং লক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা কিং তপ্যসে তপঃ।
বৃথা শ্রমং বৃথা পূজা জপঞ্চ বিফলং সুত॥
সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যা সহ তপোধন।
যোগং বিনা সুতশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসিদ্ধির্ন জায়তে॥"

"হে সুতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু বাসুদেব, তুমি তপস্যা করিতেছ কেন ? কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। হে পুত্র, শক্তিহীন হইয়া সাধনা করিলে, তুমি কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। আমার অংশসম্ভূতা লক্ষ্মীকে (শ্রীরাধাকে) ত্যাগ করিয়া তুমি তপস্যা করিতেছ, ইহাতে যে তোমার তপঃ, পূজা, জপ সমস্তই পণ্ড হইবে। হে সুতশ্রেষ্ঠ তপোধন, শক্তিমিলিত হইয়া কার্য্য কর, কারণ যোগব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর নাই।" অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি জীবে একাধারে প্রতিভাত; কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা সর্ব্বদা পৃথকরূপে কুলবৃক্ষের চূড়ায় ও মূলদেশে অবস্থিত রহিয়াছে। জীবের জীবনীশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে এবং জীব-চৈতন্য সহস্রারে বিরাজিত রহিয়াছেন, এই উভয়ের মিলন বা যোগই সিদ্ধি বা মুক্তি। তাহার পর দেবী পুনরায় বলিতেছেন—"দীক্ষার আনুপূর্ব্বিক ব্যবস্থা তবে শ্রবণ কর—

"হরিনাম্না বিনা পুত্র কর্ণশুদ্ধির্ন জায়তে।"

হরিনাম ব্যতীত সাধকের কর্ণশুদ্ধি হয় না। হরিনামমন্ত্রের ঋষি-বাসুদেব, ইহার ছন্দঃ-গায়ত্রী এবং ইহার দেবতা-মাতা শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী, ইহা মহাবিদ্যা সাধনের জন্য বিনিয়োগ হইয়াছে।

"হরিনাম্নো হি মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষি স্মৃতঃ।
গায়ত্রীছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতামাতা।
মহাবিদ্যা সুসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

দ্বাদশবর্ষের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান পুষ্ট বা ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট হইতে দক্ষিণ কর্ণে এই মন্ত্র শ্রবণ দ্বারা কর্ণশুদ্ধি করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে। কর্ণশুদ্ধি না হইলে মহাবিদ্যা উপাসনার সিদ্ধি লাভ হইবে না। তৎপরে ষোড়শ-বর্ষে ব্রহ্মজ্ঞ কৌলগুরুর নিকট হইতে নিত্য ব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিদ্যামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিবে। হে তপোধন, শিবোক্ত কুলরহস্যও জানিয়া লইবে।

যেহেতু রহস্য-বোধ না হইলে কোন বিদ্যাই সিদ্ধ হইতে পারে না।"

হরিনামের রহস্যতত্ত্বে দেবী বলিতেছেন :—

হরিনাম-মন্ত্রের রহস্য।

"হকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষান্নসংশয়ঃ।
রেফস্তু ত্রিপুরাদেবী দশমূর্ত্তিময়ী সদা।
একারঞ্চ ভগং বিদ্যাৎ সাক্ষাৎযোনিং তপোধন।
হকারঃ শূন্যরূপী চ রেফোবিগ্রহধারকঃ।
হরিস্তু ত্রিপুরাসাক্ষান্মম মূর্ত্তির্নসংশয়ঃ।
ঋকারস্তু সুতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তিরিতীরিতা।
ককারঞ্চ ঋকারঞ্চ কামিনী বৈষ্ণবী কলা।
ষকারশ্চন্দ্রমাদেবঃ কলাষোড়শসংযুতঃ।
ণকারঞ্চ সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষান্নির্ব্বৃত্তিরূপিণী।
দ্বয়োরৈক্যং তপঃশ্রেষ্ঠ সাক্ষাত্রিপুরভৈরবী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুতশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী।
হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিণী।
হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাজ্জ্যোতির্ম্ময়ী পরা।
রেফস্তু ত্রিপুরাসাক্ষাদানন্দামৃতসংযুতা।
মকারস্তু মহামায়া নিত্যা তু রুদ্ররূপিণী।
বিসর্গস্তু সুতশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী পরা।
রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং সুত।
হরে হরেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং সুত।
আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা যো জপেদ্দশধা দ্বিজ।
ভবেৎ সুতবরশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দরঃ।
এষা দীক্ষা পরাজ্ঞেয়া জ্যেষ্ঠাশক্তি সমন্বিতা।
হরি নামঃ সুতশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাতু বৈষ্ণবী স্বয়ম্।

বিনা শ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং সদ্গুরোর্ব্বিনা।
কোটিবর্ষং সমাদায় রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

আবার শিবাগমেও লিখিত আছে :—

"পশুশক্তিঃ শিবশক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মাজনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃশক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবম্॥
শক্তিরূপং জগৎসর্ব্বং যো ন জানাতি সঃ নারকী॥"

উদার শক্তিতত্ত্ব ও কুলধর্ম্ম।

শক্তি, শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রবি, চন্দ্র ও গ্রহগণ সকলেই শক্তির রূপ, যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না পারেন, তিনি নারকী। *

মাতৃভাবে গৃহীত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই আদ্যাশক্তি। 'তিনি শক্তিমান্', এই কথায় তাঁহার শক্তি যেন আংশিক সঙ্কুচিত করা হয়, সেই কারণ তিনি শক্তিস্বরূপিণী বা সাক্ষাৎ শক্তি বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন। এই আদ্যাশক্তিই উমারূপে শিবসীমন্তিনী, লক্ষ্মীরূপে মাধবমোহিনী এবং সরস্বতীরূপে ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী। সকলরূপে তিনিই অবস্থিতা। ঈশ্বরের অপার স্নেহ ও অসীম করুণার নির্ম্মল নির্ঝর মহাশক্তিময় মাতৃভাব বেদেরও নানা স্থানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ঋকের ১০ম মণ্ডলের ১০০ম সূক্তে, ৬ষ্ঠ অষ্টক, ৭ম অঃ ৯০ম সূঃ ও ৫ম অষ্টক, ১ম অঃ ৬৬ম সূঃ তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকলের উল্লেখ করিয়া বৃথা পুথি বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই।

যে শাস্ত্রে হরিনামের এত মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, ব্রহ্মাদি দেবতা, আদিত্যাদি গ্রহগণ, তারকা ও সমগ্র জগৎ শক্তির রূপ বা তাঁহার অংশ

---

* "পূজাপ্রদীপে"—'ব্রহ্মের গুণ ও বিভূতি উপাসনা' এবং শক্তিতত্ত্ব—'ধ্যান রহস্য দেখ।'

বলিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ভগবানের পূর্ণকলাবতার কালিকা-শক্তিসমন্বিত * শ্রীকৃষ্ণ, যাহার রহস্য জ্ঞানলাভের জন্য শক্তিসাধনা করিয়াছিলেন এবং যাহার উপদেষ্টা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি ত্রিপুরসুন্দরী, তাহা কি কখন সাম্প্রদায়িক দোষে দূষিত হইতে পারে? রহস্যানভিজ্ঞ মানব, তাই তন্ত্রোক্ত কৌল সাধককে হরিবিদ্বেষী বোধে ভ্রান্ত হইয়া আছে।

দেবী সর্ব্বদা যে সর্ব্বোচ্চ কুলধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাই তন্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমধর্ম্ম। তাহা সর্ব্বধর্ম্মেরই সমষ্টি বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্ম্ম; আর্য্য, অনার্য্য ও ম্লেচ্ছের ধর্ম্ম; খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা জৈনের ধর্ম্ম; মোট কথা সমগ্র জগতের সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্ম্মই পূর্ব্বকথিত মাতৃতত্ত্বের মূলাধাররূপ এই মহাকৌলধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট। বাস্তবিক এমন উদার সার্ব্বজনীন ধর্ম্মানুষ্ঠান আর কোনও শাস্ত্রেই নাই। 'কুলার্ণব' তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে ঈশ্বর সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

"প্রবিশন্তি যথা নদ্যঃ সমুদ্রং ঋজুবক্রগাঃ।
তথৈব বিবিধাধর্ম্মাঃ প্রবিষ্টাঃ কুলমেবহি॥"

অর্থাৎ যেমন সকল নদীই ঋজুভাবে হউক বা বক্রভাবেই হউক একই মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল ধর্ম্মই সময়ে এই মহা-কৌলধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। (সাধনাকাঙ্ক্ষী মানব তাহা পরে 'আচারতত্ত্বে' অবগত হইবেন।) শ্রীসদাশিব বলিতেছেন ;—হে কুলেশ্বরি! (১) জীব, (২) প্রকৃতিতত্ত্ব, (৩) দিক, (৪) কাল, (৫) আকাশ, (৬) ক্ষিতি, (৭) অপ্, (৮) তেজঃ ও (৯) বায়ু এই নয়টী কুল বলিয়া কীর্ত্তিত। এই জীবাদি নবসংখ্যক কুলে ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধিদ্বারা কল্পনাশূন্য অনুষ্ঠান বা আচারই কুলাচার বলিয়া কীর্ত্তিত। "কুল" অর্থে ব্রহ্মশক্তি বা আগম নিগমাদি

* 'পূজাপ্রদীপে'—'বীজ মন্ত্রার্থ' অংশে 'কালী ও কৃষ্ণ' বীজ মন্ত্রের রহস্য দেখ।

বেদাঙ্গের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মশক্তির ব্যাখ্যা। কু-পৃথিবী বা ব্রহ্মশক্তি, শক্তি +ল=পৃথ্বীবীজ। পৃথিবীর সহিত যে ব্রহ্মশক্তি চৈতন্য বীজরূপে মিলিত বা একত্র হইয়া জীবের আদিবংশ বা ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই কুল। 'কুলাচার' সেই মূল ব্রহ্মশক্তির বা কুলের প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির অনুকূল অনুষ্ঠান বা আচার-সমূহ। কুলকুণ্ডলিনী, কুলনায়িকা, কুলপর্ব্বত, কুলবার, কুলবৃক্ষ, কুলাকুল, কুললক্ষণ ও কৌল আদি শব্দ সমস্তই কুল বা ব্রহ্ম শক্তির সম্বন্ধ জনিত। কুল অর্থে ব্রহ্মশক্তি ও অকুল অর্থে ব্রহ্ম পরমাত্মা বা পরমশিব। (বল্লালসেনোক্ত নবগুণান্বিত কৌলীন্য প্রথা * এই মহা কৌলধর্ম্ম হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে) হে আদ্যে ! যাহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, সংবৃত্তি, তপস্যা, দান ও দৃঢ় ব্রতাদি সহ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনাকল্পে ভগবৎ গুণগান দ্বারা জন্মজন্মান্তরের পাপবিহীন হইয়াছে, অর্থাৎ কু=পাপ, ও ল=লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল সাধকেরই কুলাচারে মতি হইয়া থাকে। বুদ্ধির বিমলতা হইলেই জগন্মাতা আদ্যাশক্তির চরণকমলে মন নিহিত হয়। সাধক, তখন এই সমুচ্চ কুলাচার পালন করিয়া ক্রমে ব্রহ্মবিদ্ 'কৌলঃ' নামে পূজিত হন। সামাজিক ভাবেও "কুলীন" শব্দ এই কৌলেরই সাধারণ অবস্থা পরিজ্ঞাপক।

মহাদেব আবার বলিয়াছেন:—সাধারণতঃ শাক্তের গুরু শাক্ত, বৈষ্ণবের গুরু বৈষ্ণব, শৈবের শৈব গুরু, সৌরদিগের সৌর গুরু, গাণপত্যদিগের গাণপত্য গুরুই প্রশস্ত। পরন্তু সাম্প্রদায়িকতাশূন্য তান্ত্রিক কৌলসাধক বা সাধনপরায়ণ যথার্থ 'ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে সকলেরই

---

* "আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥"

প্রশস্ত গুরু' হইতে পারেন। "কৌলঃ সর্ব্বত্র সদ্‌গুরুঃ"। 'সর্ব্ব-ধর্ম্মোত্তমাৎ কৌলাৎ পরোধর্ম্ম ন বিদ্যতে'। সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ কৌল ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা উত্তমতম ধর্ম্ম আর নাই; অর্থাৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শাক্ত বা বৈষ্ণবাদির ন্যায় কোনও একটী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাংশমাত্রকে 'কৌলধর্ম্ম' বলে না; আর্য্য বা হিন্দুদিগের সনাতন-ধর্ম্ম অথবা বৈদিক-ধর্ম্ম বলিলে যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্যাদি সকল ধর্ম্মের সমষ্টিকে বুঝায়, 'কৌলধর্ম্ম' বলিলেও ঠিক সেইরূপ বৈদিক ও বেদানুগত সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনতত্ত্বের সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং 'তন্ত্র' ধর্ম্মের স্বতন্ত্র অঙ্গ নহে, ইহা মূল বৈদিকধর্ম্মের সাধনতত্ত্ব মাত্র। *

তত্ত্বসভা মেসনিক লজ ও বৈদিক-লজ

তত্ত্ব-সভা (Theosophical Society) ও মেসনিক-লজের (Masonic-Lodge) কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন—হিন্দু, মোসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বী তাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। এই হিসাবে আর্য্যদিগের এই কৌলচক্রও ঠিক সেইরূপ ইহাকে 'প্রাচীন বৈদিক লজ' বলিলে, বোধ হয় অসঙ্গত হয় না, অথবা আধুনিক ভাষায় 'বৈদিক লজ' বলাই অধিকতর সঙ্গত। পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে প্রবর্ত্তিত 'মেসনিক লজ' আর্য্যের এই 'বৈদিক লজের' একটী শাখামাত্র। মেসনিক 'ব্রাদার' বা বিশ্বের ভ্রাতৃভাব তন্ত্রেরই মূল উপদেশ। মাতা—জগজ্জননী মহামায়া, পিতা—বিশ্বনাথ, ভ্রাতা—বিশ্ববাসী জনমণ্ডলী, আত্মীয় ভূতচতুষ্টয় এবং স্বদেশ—ভূঃ, ভুব, স্বঃ রূপে জগতত্রয়।

---

* "জ্ঞানপ্রদীপে" 'সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি, উদারতা ও ব্রহ্মবিদ্যা' দেখ।

যাহা হউক যাহার যে কোনও দেব বা দেবী উপাস্য হউক না কেন—তাঁহাকে পাইবার জন্য অথবা তাহার সিদ্ধি লাভার্থ ভগবৎ সাধনা সকলেরই সমান। তন্ত্রে, সেই সাধনতত্ত্বটুকু সার্ব্বজনীন ও ক্রমোন্নত ভাবে † সিদ্ধ-গুরুমুখে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই 'কৌল-সাধনা' বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ এবং এই সকল কারণেই সাধন-মার্গে কৌল সাধকের এত উচ্চাসন।

কৌলের রূপ ও অবস্থা বর্ণনায় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, "অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবাচরেৎ" * ইত্যাদি; অর্থাৎ সর্ব্ব সম্প্রদায়ের গুরু, সাধকশ্রেষ্ঠ কৌলের হৃদয় সততই অনন্ত ব্রহ্ম শক্তির সাধনায় নিরত, বাহিরে রুদ্রাক্ষ, মহাশঙ্খ বা হাড়মালা ও ভস্মভূষায় পরিশোভিত, সম্পূর্ণ শৈবভাব এবং সভায় সাধারণ শিক্ষা ব্যপদেশে মুখে ভক্তিভরে হরিগুণানুগান কীর্ত্তন। তাঁহার কর্দ্দমে ও চন্দনে, পুত্র ও শত্রু মধ্যে, শ্মশানে ও ভবনে এবং স্বর্ণ ও তৃণের মধ্যে কোন ভেদ জ্ঞান নাই। তিনি সর্ব্বজীবের মধ্যেই সেই একমাত্র বিভূ অব্যয় পরমাত্মাকে পরিদর্শন করেন। তিনিই পরমহংস সিদ্ধ মহাপুরুষ বা প্রকৃত কৌল। তবেই দেখা যাইতেছে, কৌলের ধর্ম্ম যথার্থপক্ষে কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা সকল ধর্ম্মেরই সারাৎসার সাধকের অন্তিম অবস্থা। ইহা সমুন্নত সনাতন ধর্ম্মেরই যে সাধারণ সম্পত্তি তাহা বলাই বাহুল্য।

কৌলের রূপ ও অবস্থা

---

† "পূজাপ্রদীপে" 'উপদেশ' 'উপাস্য উপাসক ভেদ' দেখ।

* "কৌল এব গুরু সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ। কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাৎপরতরো নহি॥ কর্দ্দমে চন্দনে দেবি পুত্রেশত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে। শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে। ন ভেদে যস্য দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ॥ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ম্। ভূতান্যাত্মনি দেবেশি সজ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ।" ইত্যাদি॥

শিব-বাক্যে আজ্ঞা আছে—এই পরমতত্ত্ব সাধনাপ্রণালী অতি গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে, যখন প্রবল 'কলি' প্রবৃত্ত হইবে, তখন অচিরাৎ সে সকল রহস্য জগতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

* * * "ব্যক্তির্ভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ" ॥

তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য এত কাল উচ্চ কৌল বা অবধূত ও ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, প্রবল কলিকালে শিবের আদেশ ক্রমে তাহা ক্রমেই প্রকাশ হইতে চলিল।

তন্ত্রোক্ত কুলাচার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাধক অষ্টপাশমোচনার্থ অষ্টাভিষেক-যুক্ত দীক্ষা ও তদনুগত নবধা আচার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অষ্টাভিষেকময় সাধনার দীক্ষাক্রম বা অষ্ট-শ্রেণীর সাধনা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আত্মপরীক্ষায় সাধককে ক্রমে উত্তীর্ণ হইতে হয়। 'শাক্তাভিষেক' কুল সাধনা-মার্গের প্রবেশদ্বার বা প্রাবেশিক অভিষেক দীক্ষা। গুরুকৃপায় সর্ব্বপ্রথমেই সাধক, এই অভিষেক সহ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—যখন এই সাধনার প্রথম সোপানই 'শাক্তাভিষেক,' তখন ইহা শাক্তদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম না বলিব কেন? এতদুত্তরে এক্ষণে অধিক কথা বলিব না। তবে ভগবানের যে নামই বল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণপতি, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, হরি, কৃষ্ণ, আল্লা অথবা গড্ ইত্যাদি সকল নামই আমাদের অর্থাৎ মানুষের দেওয়া, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নাম ত কিছুই নাই, সুতরাং সকল নামই যে একার্থবাচক; অর্থাৎ সকলই সেই একমাত্র পরমপুরুষ বা পরমা-প্রকৃতি; অথবা পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন—যাঁহার নাম নাই, তাঁহার রূপও নাই; সুতরাং সেই নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত কোনও এক অলৌকিক-তত্ত্ব—যাঁহার কার্য্য, যাঁহার ক্ষমতা বা যাঁহার শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর সার্ব্বভৌমিক ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। গুরুদেব নিগু'ণ পরব্রহ্মের সেই গুণ ও কার্য্য,

সেই ক্ষমতা বা সেই ভগবৎশক্তি-তত্ত্বের প্রাথমিক রহস্য শিষ্যসমীপে প্রথম উদ্ঘাটন করেন বলিয়া সাধনার এই অনুষ্ঠানকে শাক্তাভিষেক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সেই ব্রহ্মশক্তির আভাষ পাইয়া শিষ্য যদি শাক্ত হইয়াই পড়ে, তাহাতে ক্ষতি কি ?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'রাধাতন্ত্রে' দেবী স্বয়ং বাসুদেবকে বলিতেছেন "বৎস! হরিনাম বিনা কর্ণশুদ্ধি হয় না।" এস্থলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্যক্তি মাত্রেই সেই গায়ত্রী-ছন্দে গ্রথিত "হরিনাম" মন্ত্র কোনও ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট হইতে দক্ষিণকর্ণে শ্রবণ করিবেন। ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য সেরূপ দীক্ষার আর আবশ্যক হয় না। তাহার কারণ ব্রাহ্মণকুমার যথাসময়ে উপনয়ন-সংস্কারে মূল গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত বেদমাতার সেই আদি সাবিত্রী মন্ত্রেই দীক্ষিত হন ; সুতরাং তাঁহাদের আর অনুকল্পের প্রয়োজন কি ? এই সাবিত্রী মন্ত্র সর্ব্বমন্ত্র সার। প্রণব-সংযুক্ত ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর মধ্যে সকল মন্ত্রই নিহিত আছে। বর্ত্তমান যুগে অনেকেই গায়ত্রীরহস্য * অবগত নহেন। অধিকাংশ অনভিজ্ঞ কুলগুরু, শূদ্রোচিত দীক্ষা ও উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণসাধককেও অতি সঙ্কীর্ণচেতা সাম্প্রদায়িক ভাবে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এ ভ্রম সমাজে আজ নূতন নহে, বহুকাল হইতে অলক্ষ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের যথার্থ ব্রহ্মণ্যশক্তির বিলোপ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণ—কেবল বৈষ্ণব নহেন বা শৈব নহেন, অথবা শাক্ত আদিও নহেন—ব্রাহ্মণ, শাক্তও বটে, শৈবও বটে এবং বৈষ্ণবও বটে ; ব্রাহ্মণ কেবল ঐ তিনের নহে, সৌর ও গাণপত্য লইয়া পঞ্চোপাসকেরই সমষ্টি ; সুতরাং তাঁহারাই ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ প্রকৃত 'ব্রাহ্মণ'। সেই কারণ সাধন-মার্গে তাঁহাদের আর নূতন করিয়া কর্ণশুদ্ধি করিতে হয়

---

* পঞ্চমোল্লাসে "গায়ত্রী-রহস্য" সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় অধুনা ব্রাহ্মণতনয় উপনয়ন সংস্কারে যথার্থ উপ বা অতিরিক্ত নয়ন অর্থাৎ জ্ঞাননয়ন প্রাপ্তির যথাযথ উপদেশ প্রাপ্ত হয় না। কালধর্ম্মে নূতন নয়নের উন্মীলন-কর্ত্তা আচার্য্যেরই সে নয়ন নিমীলিত রহিয়াছে। অতএব অন্ধের পথপ্রদর্শক অন্ধ হইলে যাহা হয় তাহাই হইতেছে। আজকাল উপনয়ন-সংস্কারের একটা অভিনয় হয় মাত্র। যাহা হউক সে না হইলেও জ্ঞাননেত্র বিকাশের জন্য সাধনার পূর্ব্বোক্ত অভিষেক-দীক্ষাগুলির দ্বারা কোন অভাব থাকিবে না। সুতরাং অতি অবশ্য অবশ্য উক্ত দীক্ষাভিষেক সম্পন্ন করিতে হয়।

তন্ত্রের এই অভিষেক কার্য্যই প্রকৃতপক্ষে সাধনার 'উপনয়ন' সংস্কার স্বরূপ। কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এমন কি স্ত্রী ও শূদ্র পর্য্যন্তও প্রকৃত অধিকারী হইলে ক্রমে যথার্থ দ্বিজত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই কারণ বেদাচারী ব্রাহ্মণের ন্যায় অথর্ব্ববেদানুগত তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর অধিকার তখন সকলেরই হইয়া থাকে। তাই বৈষ্ণবের প্রধান স্মৃতিসংগ্রহ 'হরিভক্তিবিলাসেও' দেখিতে পাওয়া যায় :—

> "শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈব ন চ বৈষ্ণবাঃ।
> উপাসতে যতস্তে তু গায়ত্রীং বেদ মাতরম্ ॥"

অর্থাৎ দ্বিজ-সংস্কার-যুক্ত সকলকেই বেদমাতা গায়ত্রীর আরাধনা করিতে হয়। তাহা প্রত্যেক সাধকেরই সন্ধ্যা উপাসনার মধ্যে তখন অপরিত্যাজ্য ক্রিয়া। সুতরাং তাহারা সকলেই প্রকৃত শাক্ত, তাহারা কেবল শৈব বা বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক ভাবযুক্ত নহে।

অভিষেককালে গুরুদেব যে, অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে অভিষেক-বারির মধ্যে স্বকীয় ঐশীশক্তি সঞ্চালিত করিয়া, কঠোর সাধনাভিলাষী প্রিয় শিষ্যকে অভিষিক্ত করেন, তাহতে শিষ্যের পাপ বা কলুষিত শক্তিসমূহ

বিধৌত হইয়া অপূর্ব্ব নবশক্তির ও নূতন নয়ন বা উপনয়নের উন্মেষ হইয়া থাকে। 'পূজাতত্ত্ব'-মধ্যে অভিষেক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু আলোচিত হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শাক্তাভিষেক সাধনমার্গের প্রবেশদ্বার, ইহা ব্রাহ্মণাদি সকলকেই গ্রহণ করিতে হয়। সদ্গুরুর কৃপায় সাধক, এই প্রাথমিক সাধনার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও পুরশ্চরণাদি *অনুষ্ঠানের সহিত আত্মপরীক্ষা দ্বারা তাহা হইতে উত্তীর্ণ বা উন্নত হইতে পারিলে, দ্বিতীয় সাধনা প্রাপ্ত হয়। ইহাই তন্ত্রোক্ত দ্বিতীয়ক্রম **"পূর্ণাভিষেক"**। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতেই সর্ব্ববিধ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার অধিকার জন্মে। ব্রহ্ম মন্ত্র, গুরুপাদুকা মন্ত্র লাভ ও তাহার জপাদির সাধন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই উন্নত সাধনোপযোগী আসন, যম ও নিয়মাদি অনুষ্ঠানসহ পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণের দ্বারা সাধক সাধনমার্গের উচ্চ অধিকার লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই অধিকারের সহিত সাধক, মঠের অন্তর্গত গুপ্তাবধূত বা অন্তর্মণ্ডলের সাধকরূপে মনোনীত হন ও অন্তর্মণ্ডলের গূঢ় আচার অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আজ কালকার 'তত্ত্বসভা' বা পাশ্চাত্য 'লজের' ন্যায় এখন হইতেই চক্রাদি সমস্ত সাধনক্রিয়া গোপনে করিতে থাকেন এবং এই সময় গুরুমণ্ডলী সমবেত হইয়া নূতন সাধককে আনন্দ-সংযুক্ত 'স্বামী' উপাধিতে সম্মানিত করেন। অধুনা অনেকেই কল্পিত বা স্বকল্পিত 'স্বামী' উপাধিতে পরিচিত হইয়া ও স্বামী-ধর্ম্মের বিগর্হিত নানারূপ কার্য্য করিয়া 'স্বামী' উপাধিতেই কলঙ্ক রটাইতেছেন। তাঁহারা কোন্ গুরুমণ্ডলী বা কোন্ মঠের অনুমোদিত 'স্বামী,' একথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা হয়ত অস্থির হইয়া পড়িবেন।

---

* শাক্তাভিষিক্ত হইয়া সাধক ক্রমে ক্রমে বার, তিথি, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর পুরশ্চরণ করিবে। অনন্তর নক্ষত্র, গ্রহ, করণ, যোগ ও সংক্রান্তি পুরশ্চরণ করিবে

পক্ষান্তরে সাধকশ্রেণীমধ্যে প্রচলিত সাঙ্কেতিক কার্য্য ও পরিচয়ের কোন রহস্যই না জানায়, তাঁহারা উচ্চ সাধকদিগের সহিত মিশিতেও পারেন না এবং সাধনার ক্রমোন্নত পথ আদৌ দেখিতে পান না, সুতরাং বাধ্য হইয়া সাধারণ সংসারীর মত দ্বন্দ্ব-পরায়ণ ও বৃথা তার্কিক হইয়া সাধক-সমাজের জঞ্জালরূপে পরিণত হন। প্রাচীন মঠানুমোদিত যে কোনও সাধক গুরু-মণ্ডলিপ্রদত্ত 'স্বামী' উপাধিতে ভূষিত বা সম্মানিত হইলেও, প্রথম অবস্থায় তাঁহারা 'স্বামী' নামে পরিচিত হন না। ইহার পর অন্ততঃ আরও তিনটি অধিকার না পাইলে সাধকমণ্ডলীমধ্যে প্রায় কেহই তাঁহাদের 'স্বামী' বলিয়া আহ্বান করেন না।

অনন্তর সাধনার তৃতীয় ক্রম "ক্রমদীক্ষাভিষেক। এই অবস্থায় মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ব্রাহ্মণ-সাধকগণ এ অবস্থায় অধিকদিন অতিবাহিত না করিয়া কায়মনোযত্নে সত্বর সাধনায় উন্নতিলাভ করিতে থাকেন, নতুবা কোনও অজানিত বা বিশেষ কারণ বশতঃই সাধনাকালে তাঁহাদের নানা বাধা ও বিঘ্ন সহ্য করিতে হয়। ইহাই প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রযোগের মধ্যন্তর। এই সময় আংশিক হঠযোগসহ মন্ত্রযোগের সাধনাবিধি আছে এবং এই সময়েই বীরাচার সাধনা উপলক্ষে সাধককে কঠিনতর ব্রহ্মচর্য্য পুষ্টতার পরিক্ষা দিতে হয়।* মঠান্তর্গত সাধকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কোনও বর্ণ হউক না কেন, এই কঠোর সাধনাকাল হইতে চক্রান্তর্গত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার অধিকারী হন। মহামতি বিশ্বামিত্র ঋষি এই সাধনার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কারণ সাধন-চক্রান্তর্গত প্রত্যেক সাধককেই তখন "সর্ব্বে বর্ণাঃদ্বিজোত্তমাঃ" বলিয়া

---

* "পূজাপ্রদীপ" বীরাচার সাধনা দেখ।

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শূদ্র বা স্ত্রীলোক, যাঁহাদের ব্রহ্মমন্ত্রে বা প্রণব উচ্চারণে অধিকার নাই, এই অবস্থার পর তাঁহারা গুপ্তভাবে ব্রহ্মসাধনার অধিকারী হইতে পারেন। মঠের মধ্যে যে সকল হীনবর্ণের সাধক ব্যক্তাবধূত আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন, এই অবস্থায় তাঁহাদের গলে যজ্ঞসূত্র মালাকারে দিবার বিধি আছে। ইহারই অনুকল্পে সাময়িকভাবে চড়ক-সন্ন্যাসীদিগের গলে যজ্ঞসূত্র মালাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই অশৌচ নাশ ও শোক বিজয় সাধনা। *

অতঃপর সাধনার চতুর্থক্রম, নাম "সাম্রাজ্যাভিষেক"। এ অবস্থায় সাধককে মন্ত্রযোগ সাধনার উচ্চস্তরে রাজতন্ত্রে বা সাম্রাজ্যেশ্বরের ন্যায় ক্ষমতাশালী অর্থাৎ পূজা সাধনার উচ্চ জ্ঞানী বলিয়া সম্মানিত করা হয়।

এই অবস্থায় সাধকের বাহ্যপূজাযুক্ত মন্ত্রযোগ ও সাধনা প্রায় শেষ হয়। লয়যোগের আংশিক ক্রিয়া বিষয়ে সাধককে ইঙ্গিত করা হয়। যথাবিধি পুরশ্চরণ বা পরীক্ষার দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইলে, পরবর্ত্তী পঞ্চম "মহাসাম্রাজ্যাভিষেক" লাভ হইয়া থাকে।

ইহা মন্ত্রযোগের উচ্চতর ক্রম। এই সময় মন্ত্রযোগের মানস পূজায় পূর্ণত্ব লাভের জন্য লয়যোগের অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্রিয়া ও ধ্যানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহার পর ষষ্ঠ "যোগদীক্ষাভিষেক"। ইহাই সাধনামার্গে সর্ব্বপ্রধান কঠিন অবস্থা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্তরের ন্যায় পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ ত করিতেই হইবে উপরন্তু হঠযোগের সাধনাও ইহার অন্তর্গত। এ সময় সততঃ গুরুর নিকটে থাকিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়। গুরূপদেশ ব্যতীত কেবল বাজারের মুদ্রিত পুস্তকাদি পাঠপূর্ব্বক যোগের অভ্যাস করিয়া অনেকেই সহসা নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন; সুতরাং এমন

---

* "গুরুপ্রদীপে" ক্রমদীক্ষাভিষেক দেখ।

অবস্থায় সর্ব্বদা অভিজ্ঞ গুরুর নিকট থাকা যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই অবস্থা গুরু কৃপায় উত্তীর্ণ হইলে. সাধক "পূর্ণদীক্ষাভিষেক"-রূপ সপ্তম ক্রম প্রাপ্ত হইবার অধিকার পান। ইহাই সাধনমার্গের লয়যোগ সাধনা নামক সপ্তম সোপান †

তৎপরে অষ্টম "মহাপূর্ণদীক্ষা" বা অন্তিম অভিষেক।". ইহাই রাজ-যোগ দীক্ষাভিষেক। ('জ্ঞানপ্রদীপে' মহাপূর্ণদীক্ষা দেখ)।

যথাবিধি এই সাধনায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সাধক কৃতশ্রাদ্ধপিণ্ড হইয়া, বিরজাযজ্ঞে, শিখা ও যজ্ঞসূত্র পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন। ইহাই শেষ বা নবম অনুষ্ঠান। চলিত কথায় বলে "যেন পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হওয়া"। কথাটা উল্টাইয়া গিয়াছে—"পৈতে পরে ব্রহ্মচারী এবং পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী" শিখাসূত্র ত্যাগ করা। এই অবস্থায় সাধক পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ সন্ন্যাসপথ অবলম্বন করেন। উচ্চতম সাধক "দণ্ডী" সন্ন্যাসী বা মুক্ত অবধূত এই অবস্থারই পূর্ণ পরিপক্ক ফল। অধুনা ইহার অনুকরণ বা নকল মাত্রই হইয়াছে, আসল সাধু দণ্ডী এখন নাই বলিলেই হয়। সাধক এই সময় জগৎই ব্রহ্ম পরে ব্রহ্মই জগৎ, অনন্তর ব্রহ্মোঽহম্ বা আমিই ব্রহ্ম এইরূপে সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবস্তুর দর্শন করিয়া বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সাধনার এই উচ্চতমশিখরে আরোহণ করিয়া গুরু ও শিষ্য যেন অভেদাত্মা হইয়া যান। তখন শিষ্য গুরুকে এবং গুরুও শিষ্যকে "ওঁ হংসঃ নমো শিবায় শিবরূপায়ঃ" বা "ওঁ নারায়ণ" বলিয়া পরস্পর প্রণাম করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন এবং " * * * গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্" ইত্যাদি বাক্যে তন্ময় হইয়া

† "জ্ঞানপ্রদীপে" পূর্ণদীক্ষাভিষেক দেখ।

যান। * এই সমুচ্চ অবস্থা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। সাধক তাই ব্রহ্মানন্দে তন্ময় হইয়া গাহিয়াছিলেন "এ বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যে ভেদ নাই" ইত্যাদি। ইহাই সাধকের 'শিবোঽহম্' বা 'সোঽহম্' (তিনিই আমি) অবস্থা অথবা 'তত্ত্বমসি' সাধনা। সাধক সোঽহম্ ভাবে তন্ময় হইয়া অবিরত সাধনায় এই 'অহম্' জ্ঞান পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে 'অহম্ সঃ' (আমিই তিনি) বা 'হংস' হইয়া যান্। কিন্তু সোঽহং এবং হংস এই উভয় অবস্থাতেই অহং জ্ঞান বা সাধকের আমিত্ব বর্ত্তমান থাকে, তবে আত্ম-গুরুভার সোঽহং অবস্থা এবং আত্ম-লঘুতায় হংস অবস্থা উক্ত হইয়া থাকে। ইহার পূর্ণতা হইলে সাধকপ্রবর "পরমহংস" অবস্থা লাভ করেন। ইহাই তন্ত্রে জীবন্মুক্ত অবস্থা নামে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক রক্ত-মাংস মেদময় দেহধারী জীবের পক্ষে ইহাই চরম উন্নতি। ইহার পর অবিরত সমাধি. ইহা শ্রীসদাশিবোক্ত তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট গূঢ় অভিমত।

এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই 'অষ্টাভিষেক-দীক্ষার' সাধকের শেষ অনুষ্ঠান বিরজাযজ্ঞের নামোল্লেখ করিলাম, 'গুরু-প্রদীপ' বা 'তন্ত্ররহস্যের দ্বিতীয় খণ্ডে' এই বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের রহস্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি।

সাধনাপঞ্চ-মকার।

যাঁহারা গুরূপদিষ্ট সাধনায় স্বয়ং সিদ্ধ না হইয়া সাধনার মূলতত্ত্ব কিছুমাত্র অবগত না হইয়া, স্বেচ্ছায় সাধনা বা অন্যকে উপদেশ ছলে একেবারে গুরুপনা করিয়া থাকেন, কেবল তাঁহাদের দ্বারাই তন্ত্র-শাস্ত্র ভয়ানক কলুষিত হইয়াছে ও হইতেছে। সামান্য অর্থ লালসা-পরিপুষ্ট পণ্ডিত-নামধারী কতকগুলা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য অসাধক গ্রন্থকারের দ্বারাও তন্ত্রশাস্ত্রের বিষম অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। সাধারণ—মনুষ্যসমাজ তাহাতেই

* "জ্ঞান প্রদীপে" দ্বিতীয় ভাগে বিজয়া সংস্কার ও অন্তিম দীক্ষা দেখ।

ভ্রমান্ধ হইয়া ঘোর তন্ত্র-নিন্দুক হইয়া পড়িতেছে। উচ্চ সাধকগণ বহুদূরে গুপ্ত গুহার মধ্যে থাকিয়াও তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছি মাত্র।

"গূঢ়াশয়ং শঙ্করস্য কো জানাতি মহীতলে।
তদ্বেত্তি কশ্চিৎ কুত্রাপি স সাক্ষাদ্‌গিরীশাংশয় ॥"

বাস্তবিক শঙ্করোক্ত তন্ত্রের গূঢ় রহস্য কেহই অবগত নহেন, শিবতুল্য উচ্চ সাধকগণই সাধনাবলে তাহার কিছু কিছু জানিতে সমর্থ হন। এই কারণ তন্ত্রেই নিষেধ আছে যে, গুরূপদেশ ব্যতীত যে ব্যক্তি স্বয়ং (তন্ত্রের ব্যাখ্যা ত দূরের কথা) তন্ত্র আবৃত্তি বা পাঠ করিবেন, তিনিও মহাশক্তি চণ্ডীর মহাকোপানলে পড়িয়া দগ্ধীভূত হইবেন।

"অজ্ঞাত্বা তন্ত্রশাস্ত্রানামাশয়ং গুরুবক্ত্রতঃ।
স্বয়ং পঠতি যো মূঢ়শ্চণ্ডিকা শাপমাপ্নুয়াৎ ॥"

কিন্তু বার বার নিষেধ সত্ত্বেও অনেকেই তন্ত্রার্থ উদ্‌ঘাটন করিতে বিচলিত হন না।

সে যাহা হউক এক্ষণে পঞ্চ-মকার কি কি, শাস্ত্রানুসারে তাহার রহস্যই বা কি—তাহাই বলিতেছি।

"মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্ ॥"

* * * * *

"পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণ মুক্তিহেতবে ॥"

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্বের বা মকারপঞ্চকের * সাধনা করিলে মহাপাতকাদি বিনষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ-পদ লাভ হয়। এই কথাই—দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, প্রলোভন এবং ইহাই তন্ত্রে বিজাতীয় ঘৃণার প্রধানতম কারণ! তন্ত্রেও সাধারণ লৌকিক ভাষাতেও ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ বিধানই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। তাহা ত আমাদিগের ন্যায় ভ্রান্ত মানবের কল্পিত কথা নহে; উভয় স্থলেই. সে সকল শিববাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং এ সন্দেহের কারণ কি এবং তাহার মীমাংসারই বা উপায় কি? সিদ্ধ যোগিগণ বলেন—"বাপু. তোমাদের অত ব্যস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। ইহার সকল কথাই বৃথা সন্দেহজাল-বিবর্জিত" অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত সাধনাগুলি যে সার্ব্বজনীন সে কথা পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে; যে যেরূপ সাধনার অধিকারী তাহার পক্ষে তদনুরূপ সাধনাই প্রশস্ত। তন্ত্রে তিন প্রকার বিভিন্ন সাধনার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা।
"সাধয়েত্রিবিধৈর্ভাবৈর্দ্দিব্যবীরপশুক্রমৈঃ।"

অর্থাৎ দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব, বা * সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাব; অথবা উচ্চ, মধ্যম ও অধম বা নিম্নসাধনার দ্বারা গুরু-নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করিবেন। "দিব্য বীর পশুনাঞ্চ মকারো পঞ্চ-বিশ্রুতঃ।" অর্থাৎ উক্ত দিব্য. বীর ও পশুভাবে পঞ্চবিধ মকার ব্যবহারের বিধি আছে এই ত্রিবিধ ভাবের সাধনার মধ্যে প্রায় সকল তন্ত্রেই প্রথমে পঞ্চ-তত্ত্বের তামসিক আচারতত্ত্ব বা অতি সাধারণভাবে লৌকিক ভাষায়

---

* মদ্য আদি পাঁচটী তত্ত্বেরই আদ্য অক্ষর "ম" বা ম-কার, সেই কারণ সাঙ্কেতিক ভাষায় উক্ত মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচ তত্ত্বের আদ্য অক্ষর পাঁচটী 'ম' এর সাঙ্কেতিক ভাবে পঞ্চতত্ত্বকে পঞ্চমকার বলে।

---

* "পূজা প্রদীপে" দিব্য, বীর ও পশু ভাবের উদ্দেশ্যপূর্ণ পূজানুষ্ঠান দেখ।

যাহা লিখিত আছে, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া, পরে বীর বা রাজসিকতত্ত্ব ও দিব্য বা সাত্ত্বিক-তত্ত্ব রহস্য সম্বন্ধে গুহ্যতর কথা বলিব। আশা করি সাত্ত্বিকতত্ত্বামোদী ভক্তমণ্ডলী তন্ত্রের এই সাধারণতত্ত্ব দেখিয়া সহসা যেন বিচলিত হইবেন না। পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে, সাধন-শাস্ত্র সকলেরই জন্য—জ্ঞানী অজ্ঞানী, সৎ অসৎ, ভাল মন্দ

পঞ্চ-মকারে তামসিক সাধনা।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই জন্য। সেই কারণ যে যেমন প্রকৃতির তাহার পক্ষে তেমনই সাধন-প্রণালী যুক্তিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। যে সাত্ত্বিক আচারী অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষী ও সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান তাহাকে যেমন উপদেশ দেওয়া হইবে এবং তাহা সে ব্যক্তির পক্ষে যেমন ফলপ্রদ হইবে, যদ্যপি সেই উপদেশ কোন ঘোর সুরাপায়ী, দুষ্টবুদ্ধি, বেশ্যাশক্ত ও বিবিধ পাপাচারী ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কি কখন তেমন ফলপ্রদ হইবে ? না সেরূপ ব্যক্তিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলে সে তাহাই শুনিয়া তখনই তাহার চিরাভ্যস্ত সেই সকল বীভৎস আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থী হইবে ? ক্বচিৎ দুই একজনের পূর্ব্ব পুণ্য-ফলে সহসা তেমন পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আপাতমনোরম সেই অতি ঘৃণ্য ও কলুষিত আনন্দ পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ তাহা যেন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়াই মনে হয়। তাহারা অনায়াসে ধন, ঐশ্বর্য্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সুরার সে মোহিনী-শক্তি ভুলিতে পারে কি ? বারবণিতার সেই অসঙ্কোচ বীভৎস কামোদ্দীপক নৃত্য তাহারা না দেখিয়া থাকিতে পারে কি ; সার্ব্বভৌমিক বৈরাগ্য-ধর্ম্মের উপদেষ্টা সাধক গুরু বলুন দেখি, তবে ইহার উপায় কি ?

মা, জগদম্বে ! তুমি ত মা, দুষ্ট-শিষ্ট, সকলেরই জননী—মাগো, তবে তোমার ঐ দুষ্ট দুর্বুদ্ধি মোহান্ধ সন্তানগুলির কি হইবে মা ! উহাদের

কি উদ্ধারের কোনও উপায় নাই ? মাগো, গললগ্নীকৃতবাসে প্রার্থনা করি উহাদেরও কোন উপায় করিয়া দাও মা ! ঐ যে, মা আমার, নিগমাকারে হাসিয়া বলিতেছেন—"উহাদের উপায় আছে বৈ কি ধন ! শিবতুল্য জ্ঞানী গুরুই ত তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা। তন্ত্রশাস্ত্রের লৌকিকভাষাই কেবল উহাদেরই মোহিত করিয়া সৎপথে আনিবার জন্য। পরমযোগী শিব তাই সকল কথাই তন্ত্রে ত্রিবিধ ভাবাত্মক করিয়া সরলভাবে বলিয়া গিয়াছেন, নতুবা তন্ত্রের ন্যায় কঠিন সাধন শাস্ত্র কি আর আছে ?"

"দুষ্টানাং মোহনার্থায় সুগমং তন্ত্রমীরিতম
নাতঃপরতরঃ শাস্ত্রং কঠিনং মহদদ্ভুতম্ ॥"

অর্থাৎ তন্ত্রের লৌকিক বা সরল ভাষা ও ভাবের ছটায় দুষ্ট পাপাচারী ব্যক্তিদিগকে মোহিত করিয়া, সেই পাপপ্রবাহ দিয়াই তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার সুগম উপায় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক সাধনার এমন কঠিন ও মহদদ্ভুত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নাই।

উক্ত পঞ্চমকারের প্রলোভন ও উপভোগ দ্বারা দুষ্টাশয় ব্যক্তি যত সহজে ধর্ম্মামোদী হয় বা যত সহজে আয়ত্ত হয়, বোধ হয় তত সহজে আর কোন-রূপেই তাহাদিগকে বশীভূত বা নীত করিতে পারা যায় না। কিন্তু সে ভাবে কেবল দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধ ও সুবিজ্ঞ গুরুই তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য সৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন—অন্য আর কেহই তাহা পারেন না, এই হেতু তন্ত্রের সাধন-তত্ত্ব যেমন কঠিন বলিয়া কথিত, তন্ত্রের 'গুরুগিরি' তেমনই অধিকতর কঠিন।

সেই পাপমোহে উন্মত্ত ব্যক্তিকে গুরু ডাকিয়া বল্লিলেন, "বাপু ! মদ খাও আর যাই কর, দিনান্তে একবার ভগবানের নাম লওয়া উচিত, তাঁ'কে স্মরণ করিলে জীবের কোন ভয় থাকে না, তাহার সকল পাপ দূর

হয়, মরণকালে সে শান্তি পায়” ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায়,…সুরাপায়ী, অনাচারী বা ঐরূপ প্রকৃতিগত ব্যক্তিগুলির মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা আছে যে, তাহারা অবসর মত একটু ভগবৎ চিন্তা করে বা সৎপথের পথিক হয়, কিন্তু পোড়া দুষ্টপ্রকৃতি বা সংস্কার তাহাদিগকে কিছুতেই সে পথ হইতে ফিরিতে দেয় না ইহাই তাহাদের বিষম প্রতিবন্ধক। গুরু বলিলেন—“দেখ বাপু! তোমায় মদ ছাড়িতে হইবে না, নিরামিষ আদি ভোজনের জন্য তোমাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, তোমার প্রবৃত্তিপথে থাকিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে তোমার কোন বাধাই পড়িবে না। এই দেখ ‘শাস্ত্র’ কি বলিতেছে—“তন্ত্রে শিববাক্যে কি লিখিত আছে”; গুরুদেব, তন্ত্রের লৌকিক ভাবার্থ বা আভিধানিক সরল অর্থই তখন তাহাকে দেখাইয়া দিলেন—“মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন দ্বারাই মোক্ষপদ পাওয়া যায়। তবে সামান্য বিধিপূর্ব্বক পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধ করিয়া লইলেই হইল” শিষ্য শাস্ত্রের এমন সহজ বিধি শুনিয়া তখনই গুরুর পদপ্রান্তে নিপতিত হইল, বলিল “ঠাকুর, এমনটি যদি শাস্ত্রে আছে—তবে আমায় উহার ক্রিয়া-বিধানে উপদেশ করুন; প্রভো, আমি কায়মনে তাহা প্রতিপালন করিব।” শিষ্যের আনন্দ আর ধরে না। গুরু তখন সাধারণ বা তমোগুণপ্রধান নিম্নাঙ্গের উপাসনা ও পূজা-রহস্য তত্ত্ব-শোধনের ও তত্ত্ব-গ্রহণের লৌকিক বা ব্যবহারিক বিধানগুলি বলিলেন, শিষ্য ও তাহাই অভ্যাস করিতে লাগিল। এদিকে সিদ্ধ গুরুদেব তাহার সঙ্গেই তাহারই প্রবৃত্তিস্রোতে যেন অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া তাহার উদ্ধার-পথে চলিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও মনোরম উপদেশের বলে কিয়দ্দিবসের মধ্যেই সেই পাপোন্মত্ত সুরাসেবী সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াও আর পথে ঘাটে তেমন তাণ্ডবনৃত্য করে না; এখন গৃহমধ্যে গুরু-সন্নিধানে সাধন চক্রে বা গুরু শিষ্য ও শক্তি সহযোগে মণ্ডলীভাবে বসিয়া সেই সুরাশোধন মন্ত্র ভক্তিভরে

উচ্চারণ করিতে লাগিল ও 'মা'—'মা'—'তারা'—'তারা' বলিয়া নেশার ঝোঁকে বা প্রেমে ক্ষণে ক্ষণে বিভোর হইতে লাগিল। দুই এক পাত্র সেবন করিয়াই গুরুর চরণ দুটি ধরিয়া সরলচিত্তে 'মা' 'মা' বলিয়া পাগলের মত হয়ত কাঁদিতে লাগিল। গুরুদেবও সময় বুঝিয়া তাহাকে মার নামে ক্রমে মাতাইয়া তুলিতে লাগিলেন। মাতালের ধর্ম্মই এই যে, সে অবস্থায় কোনও একটা ভাব আসিলে, তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক, সেই ভাবে চিত্ত বিভোর হইয়া যায়। গুরুদেব, এই অবসরে তাহার চিত্তে ভক্তি-ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। তাহার অবস্থা বুঝিয়া সুরা পাত্রের পরিমাণ বিষয়েও ধীরে ধীরে অল্প করিবার শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ প্রথমে যে পঞ্চ তোলক পরিমাণ পাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল, যাহা পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় পাঁচ বারে ৫ × ৫ = ২৫ মোট পঁচিশ তোলা, আজ কালকার বোতলের পরিমাণে প্রায় এক পাইট, তাহাই গলাধঃকরণ হইত, এক্ষণে সেই পরিমাণ ক্রমে কমিয়া প্রতিবারে দুই তোলা করিয়া পাঁচবারে দশতোলায় পরিণত হইল। কিন্তু তাহাতেও তখন তাহার নেশার কিছুমাত্র হ্রাস মনে হইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা নেশার গভীরতা যেন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির বেশ একটি গভীর রেখা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে লাগিল। শ্রীসদাশিব কথিত পঞ্চ-মকারের আদ্যতত্ত্ব এই 'মদ্য', শঙ্কররূপী গুরুদেবের অলৌকিক শিক্ষা ও শোধন বলে এমন ভাব ধারণ করিল যে, মদ খাইলেও আর তেমন মাতালে নেশা হয় না, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কেমন এক প্রেম-ভক্তির অপূর্ব্ব মত্ততায় হৃদয় ভরিতে থাকে, অথচ বার বার মদ না খাইলেও সে নেশা আর ছুটে না। গুরুদেব দেখিলেন যে, ক্রমে সুরার পরিমাণ এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, এখন একদিন না হইলেও বোধ হয় তাহার কষ্ট হইবে না; অর্থাৎ এদিকে যেমনি যেমনি মদের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে, ওদিকে তেমনি

তেমনি ভক্তি-মদে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি শিষ্যকে সুরা-তত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একদিন তাহার সাধন-চক্রমধ্যে মদ্য সাধনার "শাপবিমোচনের" কথা উত্থাপন করিলেন। অর্থাৎ সুরাশোধন করিয়া তাহার শাপবিমোচন ব্যতীত মদ্য পান করিতে নাই। শিষ্য গুরুমুখে শাপবিমোচনের মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহা তখন অভ্যাস করিতে লাগিল। গুরুদত্ত সেই মন্ত্র তখন যন্ত্রচালিতের ন্যায় শিষ্য পাঠ করিতে লাগিল। শাপবিমোচন-মন্ত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥
সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্॥
বেদানাং প্রণবো বীজঃ ব্রহ্মানন্দময়ং যদি।
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু॥"

তত ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপ বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। ইতি তদুপরি দশধা জপেৎ। তত ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রশাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ। ইতি তদুপরি দশধা জপেৎ। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈং ক্রোঁ ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয়-স্বাহেতি দশধা জপেৎ। ততো মূলমন্ত্রং তদুপরি অষ্টধা জপ্তা দেবতাময়ং বিভাবয়েৎ ইত্যাদি।

প্রথমেই শুক্র-শাপ বিমোচন করিবার মন্ত্র অভ্যস্ত হইলে, তৎপরে ব্রহ্মশাপ বিমোচন, অনন্তর কৃষ্ণশাপ বিমোচন আরম্ভ করিতে হয়। ক্রমে উহার রহস্য-কথা, গুরু শিষ্যের নিকট অতি বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিলেন। সে রহস্যের মর্ম্ম সামান্যতঃ এইরূপ—অসুরগুরু মহাকৌল ও

সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য একদা সুরাপান করিয়া এতই চিত্তবিভ্রান্ত ও মদোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, স্বীয় শিষ্য 'কচের' মাংসই ঘটনাচক্রে ভোজন করিয়া ফেলিলেন, পরে যখন জানিলেন যে, কচ তাঁহার উদরে তখন, উদ্দেশে তাহাকে মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উদর হইতে বাহির করিলেন এবং সেই অবধি সুরাপানে এই অভিসম্পাৎ করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি সুরাপান করিবে, সে যেন আমার শাপবিমোচন করিয়া সুরাপান করে। অর্থাৎ আমি অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য, আমিই যখন সুরাপানে স্বীয় মস্তিষ্ক স্থির রাখিতে পারি নাই, তখন অন্যে কি করিবে !—সুতরাং তাহার ভাবার্থ এই যে, কেহ যেন সুরাপান করে না।

ইহার পর ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা, ইনিও একদা ঐরূপ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আপনার কন্যা সন্ধ্যাদেবীর প্রতি কামভাবে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, রুদ্রদেব তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার উর্দ্ধ মস্তক ছেদন করেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইলে, তিনিও সেইরূপ অভিসম্পাৎ করেন—অর্থাৎ আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমি যখন সুরাপানে নিজে ঠিক থাকিতে পারি নাই, তখন অন্যে কাঃ কথা, সুতরাং মর্ম্মার্থ এই যে, কেহ যেন সুরাপান না করে।

অনন্তর কৃষ্ণশাপবিমোচন—যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ তিনিও অভিসম্পাৎ দিয়াছেন যে, সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশ ধ্বংস হইয়াছে. সুতরাং যে কেহ সুরাপান করিবে, সে যেন আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখে। তবেই হইল, তন্ত্রে-শাপবিমোচনের প্রকৃত রহস্য বোধ হইবার পর, অযথা সুরাপান করা আর চলে না। উন্মত্ত শিষ্যকে উপযুক্ত গুরু. ধীরে ধীরে এইরূপে সুরাপরিত্যাগের অবস্থায় আনিলেন। তখন শিষ্য, সুরা তত্ত্ব বুঝিয়া বাহ্য সুরাপানে নিরস্ত হইল। এইরূপে সকল তত্ত্বই উপযুক্ত গুরুদেব, শিষ্যকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তিমার্গে বা দক্ষিণ ও বামাদি বীরভাবের মধ্য দিয়া উন্নত দিব্যভাবে

পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সে সাধনা কেবল মুখের কথায় হয় না, শিষ্যের 'গোড়ে' 'গোড়' দিয়া এমনই করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। সুতরাং তামসিক ভাবেও তন্ত্রের সাধন-কার্য্য অদ্ভুত ফলপ্রদ হইবার কথা যদি শক্তিশালী সদ্‌গুরুর নিকট শিষ্য এইরূপেই উপদেশ পায়! দুর্ভাগ্য— তেমন গুরু এখন সংসারে নিতান্তই দুর্লভ! জলমগ্ন বা নিমজ্জমান ব্যক্তির উদ্ধার মানসে সন্তরণপটু বলবান ব্যক্তি অগ্রসর হইলেই উভয়ের উদ্ধার অবশ্যম্ভাবী, নতুবা ক্লান্ত ও হতজ্ঞান নিমজ্জিতের উদ্ধার করিতে যাইয়া দুর্ব্বল উদ্ধারকর্ত্তাই ক্রমে পরিশ্রান্ত ও শিথিলবাহু হইয়া ডুবিয়া মরেন; সুতরাং তখন কে কাহার উদ্ধার করিবে? কুৎসিত বৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করাই যাহাদের অভিপ্রেত বা যাহা তাহাদের সহজাত বলিলেও এক্ষেত্রে অত্যুক্তি হয় না, তাহারা সে সকলের অনুশীলন না করিয়া কখনই ত থাকিতে পারিবে না। সেই অভিপ্রায়গুলি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেও তাহাদিগকে এমন কতকগুলি গুরু নির্দ্দিষ্ট তন্ত্রোক্ত লৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয় যে, তদ্দ্বারা সময়ে তাহাদের সেই অসৎ প্রবৃত্তির অনেক হ্রাস করিয়া দেয়। তাই তন্ত্রে ঐ দুষ্ট ও কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির অনুমোদিত আপাতরমণীয় সহজসাধ্য বিষয়সমূহ শাস্ত্রনিবদ্ধ করিয়া, তাহার অন্তরালে এমন সুন্দর ও উপাদেয় উপায়সমূহ নিহিত রাখিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা পরিণামে সাধকের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অন্যথা স্বীয় প্রবৃত্তির সর্ব্বদা অননুমোদিত বিষয়ে কখনই কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রবৃত্তির বিনাশকেই ত নিবৃত্তি বলে! যে বিষয়ে যাহার যত প্রগাঢ় প্রবৃত্তি থাকে, সময়ে তাহাতে তাহার তত অধিক বিতৃষ্ণা না জন্মিলে, কি নিবৃত্তি হয়? তাই প্রবৃত্তির পথে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া তাহা নিবৃত্তি করিবার ব্যবস্থাই পঞ্চমকারের তামসিক-সাধনা। বস্তুতঃ সংসারে যাহাদের আজন্ম নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ যাহারা

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিশেষ পুণ্যফলে সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত হইতে পারেন নাই, সাংসারিক বিলাস-বিভ্রমে যাহাদের চিত্ত অহরহঃ মগ্ন থাকে, তাহাদের তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিম্ন অঙ্গ বা প্রবৃত্তি-পথের সাধনায় অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে তাহাদের প্রতি নিবৃত্তিভাবপুষ্ট উপযুক্ত সদ্‌গুরুর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের আবশ্যক, অর্থাৎ শিষ্য কি করিতেছে বা ক্রমে কোন পথে যাইতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ইহাই তন্ত্রের সরলার্থ অনুযায়ী পঞ্চ-মকারের তামসিক আচার সাধনা। ইহাই সাধারণ বীরাচার-বর্ণিত তামসিক সাধনা। বীরাচারের রাজসিক বা উন্নত সাধনা স্বতন্ত্রবিধ। অতঃপর বীরভাব বা বীরাচারের রাজসিক সাধনার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া পঞ্চমকারের দিব্যভাব বা সাত্ত্বিক সাধনার বিষয়ে শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত রহস্য-প্রকাশে যত্নবান হইব।

পঞ্চমকারের রাজসিক সাধন।

বীরভাবে বা রাজসিকভাবে পঞ্চমকারের যে সাধনা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা সাত্ত্বিক ও তামসিক এই উভয়বিধ সাধনার মধ্যবর্ত্তী সাধকের জন্য ইহারও উদ্দেশ্য অতি গভীরভাবে পূর্ণ। এরূপ সাধকের সাধনাশক্তিও নিতান্ত কম নহে। পূর্ব্বে হিন্দু নরপতি ও ঐশ্বর্য্যশালী গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই সাধনাই প্রবর্ত্তিত ছিল। এখনও নেপাল প্রভৃতি স্বাধীন ক্ষত্রিয়-প্রধান প্রদেশে ইহার প্রচলন বর্ত্তমান আছে।

ইহাতে অধম সাধকগণের ন্যায় স্থূল পঞ্চ মকারের ভোগপ্রধান বীভৎস গন্ধ নাই বটে, তবে উন্নত ও পরিমিতভাবে পঞ্চ-মকার ব্যবহার ও তৎসহ শক্তি সাধনা দ্বারা শৌর্য্য ও বীর্য্য রক্ষার জন্যই ইহার অতি গভীর বিধি-ব্যবস্থা আছে। ভগবৎ কৃপালাভার্থে ভক্ত গৃহীমাত্রেই গুরুমুখগত হইয়া এই সাধনা করিবার অধিকারী। এই সাধনায় ভারতবাসী স্খলিতপদ হইয়াছে বলিয়াই আজ এমনভাবে পরপদ-দলিত, হেয় ও শৌর্য্যবীর্য্যহীন

হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পুনরায় প্রকৃত বীর সাধকের আবির্ভাব যে, একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধুনা ব্যাখ্যা-নুষ্ঠানবহুল যে সকল বীরাচারী সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, বা যাহারা বীরাচারী বলিয়া কেবল মুখেই স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই উচ্চ-কর্ম্মি-সাধক গুরুপরম্পরার শিষ্য নহেন, তাঁহারা অনভিজ্ঞ পুঁথিপড়া তান্ত্রিকের শিষ্য। সেই কারণ তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে বীরসাধনার কোন তত্ত্বই না পাইয়া ভীরুরও অধম বীভৎসাচারী হইয়া রহিয়াছেন। 'নিরুক্ত, তন্ত্রে, তাই উক্ত আছে—

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।"

অর্থাৎ কেবল মদ্যপান করিয়াই কেহ বীরভাবাপন্ন হইতে পারে না, মন্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীই একমাত্র বীরপদবাচ্য।

সাধকচূড়ামণি রামপ্রসাদ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, পরমহংসদেব প্রভৃতি প্রকৃত বীর-সাধক ছিলেন। তাঁহাদের অবস্থা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা কত বড় সাধক ছিলেন! স্বামীজীকে 'পিপা' পিপা' মদ খাওয়াইয়াও কেহ মাতাল করিতে পারে নাই, অথচ তিনি না খাইয়াও সতত মাতাল হইয়া থাকিতেন; আবার পরমহংসদেবও বলিতেন— "আমার মদ দেখিলেই এখন নেশা হয়।" শুনিলেই আমার নেশা হয়।" তবেই ভাব দেখি, মদ খাও নেশা হইবে না, আবার মদ না খাইয়াও নেশা ছুটে না, একি সাধারণ কথা—না, এ সাধারণ নেশা—বল দেখি একি সহজ বীরের কথা। এমন সাধকই ত বীর, প্রকৃতই তাঁহারা বীরপদবাচ্য! এমন বীরেন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিলে 'যমভয়'ও বুঝি ভয় পায়!

"দিব্য বীর পশুনাঞ্চ মকারো পঞ্চ বিশ্রুতঃ।"

অর্থাৎ দিব্য, বীর ও পশুভাব অনুসারে পঞ্চমকার তিন প্রকারের এইরূপ শ্রুত হইয়া থাকে।

দিব্য বা সাত্ত্বিক সমুচ্চ সাধকের পক্ষে পঞ্চ-মকারের যে উদ্দেশ্য তন্ত্রেই বিশদভাবে লিখিত আছে, তাহাও অনেকে অবগত নহেন, সেই কারণ তন্ত্রের নাম শুনিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন। 'কুলার্ণব' তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে স্পষ্ট লিখিত অছে যে :—

পঞ্চ-মকারের সাত্ত্বিক সাধনে।

"মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃসর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি ॥
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষ ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবোলোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ ॥
কুলমার্গোমহাদেবি ন ময়া নিন্দিতঃ ক্বচিৎ।"

বাস্তবিক, যদি মদ্যপান করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে জগতের সকল মাতালই ত সিদ্ধ হইয়াই আছে। মাংস খাইলেই যদি পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে জগতের মাংসাশী জীবমাত্রেই ত মহাপুণ্যবান্ বলিতে হয়। আর যদি স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, তবে ত জগতের সর্ব্বজীবই মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহার উদ্দেশ্য বা রহস্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাই ভক্তিভরে সদ্গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক তন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা দেখিলেই পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ-মকারের রহস্য-তত্ত্বের অনেকাংশ উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে।

পঞ্চমকার স্থূল, সূক্ষ্ম বা তাহার অনুকল্প এবং সূক্ষ্মাতীত ভেদে ত্রিবিধ। সাধকের অবস্থানুসারে তাহা সময়াচার মতে সততই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচপ্রকার বিষয়ই পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার বলিয়া কথিত। ইহা সংসারে প্রায় সকল জীবেরই নিত্য ব্যবহার্য্য অপরিত্যজ্য বস্তু। কারণ সর্ব্ববিধ ফল ও উদ্ভিজ্জ রসই মদ্যের উপাদান, যে সকল বস্তু আহার বা পান করিলে মস্তিষ্কের আরামপ্রদ অবসাদ আনয়ন করে, তাহাই অল্পবিস্তর মাদকতা শক্তিযুক্ত; মাংস, সকল শ্রেণীর জীবাঙ্গভূত সামগ্রী, যাহাতে দেহে সাক্ষাৎ ভাবে মাংসের পরিপুষ্টি সংসাধিত হয়, তাহাও মাংস শব্দের অন্তর্গত। উদ্ভিজ্জ-ভোজী প্রায় সকল জীবাঙ্গই অধিকাংশ মানবের আহার্য্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্য, ইহা জলচর জীবের অন্তর্ভুক্ত, ইহাও বহু মনুষ্যের আহার্য্য বস্তু। মুদ্রা; অন্ন শস্যজাত সকল প্রকার আহার্য্যই মুদ্রা নামে কথিত, মানব মাত্রেরই ইহা নিত্য ভোজনের সামগ্রী। মৈথুন প্রজাপতি প্রবর্ত্তিত জগতের জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অনুকূল সুখোপভোগাত্মক স্ত্রী-পুরুষের মিলনজাত সর্ব্বজনবিদিত স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশেষ। কোন্ জীবই সাধারণভাবে তাহা হইতে নিবৃত্ত নহে। **ইহাই রজোগুণানুগত স্থূল বা প্রত্যক্ষ পঞ্চমকার।** বীরভাবপ্রধান সাধকেরই উপযোগী।

সূক্ষ্ম পঞ্চমকার উক্ত রাজসিক তত্ত্বপঞ্চকের অনুকল্প মাত্র। শাস্ত্রে তাহাকে **তামসিক পঞ্চমকার** বলিয়াও কথিত হইয়াছে। পঞ্চভাব-প্রধান সাধকদিগের পক্ষেই তাহা অনুকূল। পরে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

এক্ষণে সূক্ষ্মাতীত পঞ্চমকারের কথাই বলিতেছি। **ইহা সাত্ত্বিকতত্ত্ব-পঞ্চক** বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত। ইহা দিব্যভাবপ্রধান অনুন্নত সাধকেরই উপযোগী। অথর্ব্ব বেদে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"অথ পঞ্চমকারেন সর্ব্বং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্ম্মায়
তৎসর্ব্বং ভূতং ভব্যং যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্যাদৃশ্যমানং
স্থাবরং জঙ্গমম্ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥"

অর্থাৎ পঞ্চমকারের সাধনা দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা যায়। মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা আর নাই। দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থাবর ও জঙ্গমাদি যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, সে সমস্তই পঞ্চমকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সকলকে পঞ্চমকারের কোন না কোন বিষয়ের সেবা করিতেই হয়। তবে কেহ তামসিকভাবে, কেহ বা সাত্ত্বিকভাবে তাহার ব্যবহার করে

"কৈলাস তন্ত্রে" উক্ত আছে, ভগবান ব্রহ্মার প্রশ্নে জগদম্বিকার আকাশবাণী হয় যে,—

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যঃ মুদ্রামৈথুনমেব চ।
এতৈর্মামর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা তস্য তুষ্টাস্মি সর্ব্বদা ॥"

অর্থাৎ "মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা ভক্তিসহযোগে আমার অর্চ্চনা করিলে আমি পরিতুষ্ট হই।"

"মদ্যং বিষ্ণুর্বিধির্মাংসং রুদ্রো মৎস্যস্ততঃ পরম্।
মুদ্রাত্বমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদাশিবঃ ॥"

অর্থাৎ "মদ্য বিষ্ণু, মাংস বিধি বা ব্রহ্মা, মৎস্য রুদ্র, মুদ্রা ঈশ্বর এবং মৈথুন সদাশিব বলিয়া জানিবে।

"নামান্যেতানি তত্ত্বানাং পঞ্চপ্রাণোদ্ভবানি তে।
ইত্যুক্ত্বা সহসা বাণী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥"

"তত্ত্বগুলির নাম এই বলিলাম, পঞ্চপ্রাণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে" এই কথা বলিয়া আকাশবাণী অন্তর্হিতা হইলেন।

কমলাসন বিধাতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলে তাঁহার দেহ হইতেই সহসা পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব হইল। তাঁহার প্রাণ বায়ু হইতে মদিরা, অপান বায়ু হইতে মাংস সমান বায়ু হইতে মৎস্য, উদান বায়ু হইতে মুদ্রা এবং ব্যান বায়ু হইতে শক্তি আবির্ভূতা হইলেন, এই ভাবে পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব হইবামাত্র ব্রহ্মার মনে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইল। তখন তিনি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজাচরণ করিলেন, ও ব্রহ্মশক্তির কৃপা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। তদবধি যে সাধক পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তিনিই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।

পঞ্চমকারের প্রথম তত্ত্ব মদ্য।

পঞ্চ-মকার তত্ত্বের প্রথম ও প্রধান তত্ত্ব 'মদ্য'। ইহা সাধনার যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী, তাহা সাধক হইয়া সে অবস্থায় উপনীত না হইলে, কেহই ঠিক বুঝিতে পারিবে না। পূর্ব্বে যে অষ্টাভিষেকের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে "যোগ-দীক্ষাভিষেকে" উন্নীত হইয়া সাধক যে সময় যোগ-বলে ষট্ বা পক্ষান্তরে নব-চক্র ভেদ করিয়া জীবাত্মা ও জীবনীশক্তির সহযোগে ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত হন, তখন নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মতে আত্মলয় দ্বারা যে "প্রমদন জ্ঞান" হয়, তাহাই 'মদ্য' বলিয়া উক্ত।

"যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥"

সেই সময় সোম-কমল চক্র হইতে শ্বেতবর্ণ মধুর-স্বাদযুক্ত যে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, সাধক তাহাই পান করিয়া পরম আনন্দময় হন।

"ভৈরব বা রুদ্রযামলে" শিব বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মস্থান সরোজপাত্রলসিতা ব্রহ্মাণ্ডতৃপ্তিপ্রদা।
যা শুভ্রাংশুকলা সুধাবিগলিতা সা পানযোগ্যা সুরা ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলকমলরূপ পাত্রের অন্তর্গত শুভ্র সোমকলা কমল হইতে যে ব্রহ্মাণ্ডতৃপ্তিপ্রদায়িনী সুধা বিগলিত হইয়া ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই সাধকের পানোপযোগী মদ্য।

"আগম সারে" ও শ্রীসদাশিব বলিতেছেন :—

"সোমধারা ক্ষরেদ্যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বেরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং স্বাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ ॥"

অর্থাৎ সেই ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সোমচক্র কমল হইতে সোমধারারূপে যে অমৃত ক্ষরিত হইতে থাকে, যে ভাগ্যবান সাধক সেই সুধার অধিকারী হইয়া পান করিতে করিতে আনন্দময় হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ মদ্য সাধক। এ অবস্থায় সাধকের প্রকৃতই একপ্রকার ভাবের মত্ততা উপস্থিত হয়। সাধকের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তখন সে মত্ততার ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে থাকে। স্থানান্তরে শিব বলিতেছেন :—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতা চ মহীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

গ্রন্থব্যবসারী অনুবাদক তথা বাহ্য তত্ত্বামোদী পণ্ডিতমহাশয় ব্যাখ্যা করিলেন—"যে সাধক মদিরা পান করিতে করিতে অধীর হইয়া পুনঃ পুনঃ পান করে ও মত্ততাবশে ভূতলে পতিত হয় এবং সামান্য প্রকৃতস্থ হইয়াই উঠিয়া যদি পুনরায় সুরাপান করে' তাহা হইলে সে সাধকের আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না!" হায়! হায়! এই কারণেই ত আধুনিক তান্ত্রিকের এমন দুর্দ্দশা! অল্পশিক্ষিত কাণ্ডাকাণ্ডবিবর্জ্জিত ব্যবসায়ীগুরু তাহাই নিজ

অজ্ঞানতার ফলে শিববাক্য-বোধে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু দিব্য বা সাত্ত্বিক জ্ঞানপুষ্ট যোগী সাধকদিগের মধ্যে ইহার রহস্য পরম অদ্ভুত! সংক্ষেপেও দুই এককথা না বলিলে তন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহাদের অযথা ভ্রম কখনই দূরীভূত হইবে না। তাঁহারা বলেন সেই সহস্রদলান্তর্গত সোমচক্রবিনিঃসৃত অমৃত বা সুরা পুনঃ পুনঃ পান করিয়া মহীতলে অর্থাৎ ষট্চক্রনির্দ্দিষ্ট পৃথ্বীবীজাত্মক মূলাধারচক্রে ফিরিয়া আসিয়া বা পতিত হইয়া পুনরায় সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবাত্মা-সহযোগে ষট্‌চক্রভেদ করণান্তর, সেই যোগীজনবাঞ্ছিত ব্রহ্মরন্ধ্রে সতত উত্থিত বা উপনীত হইয়া সহস্রার-স্থিত সেই সোমচক্রের বিগলিত সুধা বা সুরা পান করিলে (অর্থাৎ কুণ্ড-লিনী শক্তি সহযোগে সেই কুলামৃত পান করিয়া সম্পূর্ণ সমাধিস্থ হইতে পারিলে) সাধকের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তাই ভক্তচূড়ামণি মন্ত্রযোগী রামপ্রসাদ ভাবমদে সরলপ্রাণে গাহিয়াছিলেন :—

"সুরা পান করি না মা, সুধা খাই জয় কালী বলে।
আমার মন মাতালে মাতাল করে, যত মদ মাতালে মাতাল বলে,
গুরুদত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞান শুঁড়িতে চোয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন মাতালে
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা শোধন করি বলে তারা মা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে॥"

আহা! সাধনার কি গভীর রহস্য শাস্ত্রেও সাধুমুখে নিবদ্ধ রহিয়াছে; মূর্খ পানাসক্ত ও অসংযতেন্দ্রিয় সাধক-কুল-কলঙ্ক, তাহা না জানিয়া সাধনার আবরণে কতই না কুৎসিৎ আচার করিয়া থাকে।

আবার সাধারণ অর্থেও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে মুক্তিকামী

উচ্চসাধক দ্বিজ বা ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে সুরাপান একেবারেই নিষিদ্ধ। 'কুলার্ণবে' লিখিত আছে—

"সুরা বৈমলমন্নানাং পাপাত্মা মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ।
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেয়ং প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পক্ষে পুরীষসদৃশ সুরা পান করা ত দূরের কথা, স্পর্শ বা এমন কি দর্শন পর্য্যন্ত করিলেও প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিতে হয়। তাহা, কেবল শূদ্র বা সাধনার নিম্ন-অধিকারী অথবা পূর্ব্বোক্ত ভ্রষ্টাচারীদিগের প্রাথমিক ক্রিয়া সাধনার জন্যই বিহিত আছে, "এতৎ দ্রব্যদানন্তুশূদ্রস্যৈক"। শ্রীক্রমে লিখিত আছে—

"ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বাম কামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥"

চণ্ডী-রহস্যেও স্পষ্ট সে কথা বর্ণিত আছে—

"* * * রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপঃ॥
বলি মাংসাদি পূজেয়ং বিপ্রবর্জ্যা ময়েরিতা।"

অর্থাৎ পাদ্যার্ঘ্যাদি নৈবেদ্যসহ রুধিরাক্ত বলিমাংসাদি খাদ্যদ্রব্য দ্বারা নৃপতিগণই বীরভাবে, বীরাচারে পূজা করিবেন। ইহা রাজসিক ভাব। রাজ্যশাসক পরাক্রান্ত বীর নৃপতির পক্ষে এরূপ বীরভাবের পূজাই অভিপ্রেত, তাহা দুর্গাপূজারহস্যে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ নিবৃত্তিপরায়ণ বিপ্রের পক্ষে মাংসাদিসমন্বিত পূজা একেবারেই পরিত্যজ্য। শাস্ত্র, এখন যেন ঠিক শাস্ত্র নহে—খেয়াল মাত্র! বিশেষ সাধনশাস্ত্র এখন আর অভিজ্ঞ গুরুর মুখে জানিবার বা বুঝিবার

আবশ্যক হয় না ; সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই যে কেহ বাজারের পুঁথি দেখিয়া গুরু হইয়া বসেন। সুতরাং যাহার যাহা ইচ্ছা বলিলেই বা করিলেই হইল! অনেক শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যসম্রাটপ্রতিম উপন্যাসাদির লেখকও তান্ত্রিক আচার লইয়া চরিত্র-রচনা করিতে যাইয়া তন্ত্রের যে সকল ভ্রান্ত ও অশাস্ত্রীয় চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যৎসামান্য তন্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। নিম্ন অধিকারীর বহু তান্ত্রিক সাধক, যথেষ্টরূপ অন্যায় আচার অবলম্বন করিলেও, এমন অশাস্ত্রীয় আচার কখনই অবলম্বন করে নাই যে, দেবীর প্রীতি কামনায় ব্রাহ্মণ-সাধক হইয়া নরবলির জন্য ব্রাহ্মণ-কুমারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, অথবা কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিয়া ভোগ্যাশক্তিরূপে তাহাকে গ্রহণ করিবে! তন্ত্রে বা কুত্রাপি এমন কথা কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তন্ত্রে উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণের বলি দিবার, বিশেষ নরবলি দিবার অধিকার ত একেবারেই নাই ; তাহা রাজচক্রবর্ত্তী সাধক নৃপতিই দিতে পারিতেন, অবশ্য ব্রাহ্মণ গুরু তাহাতে তন্ত্রধারক মাত্র থাকিতে পারিতেন এবং সেরূপ বলি হীনশ্রেণীর নরের মধ্য হইতেই পূর্ব্ব-কালে গৃহীত হইত ; ব্রাহ্মণ নরবলি সম্পূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। অথচ কোন কোনও শক্তিশালী লেখকের লিখন-ভঙ্গিতে তাহা এখন যথার্থ বলিয়া নির্ব্বিবাদে সাধারণে বিশ্বাস করিয়াছে! তাই বলিতেছিলাম, শাস্ত্র বিশেষ তন্ত্র এখন অনেকেরই খেয়ালের বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে! ইহা শাস্ত্র ও সাধন নিন্দুকের অস্ত্ররূপেও যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

কুলচূড়ামণি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যেখানে ব্রাহ্মণের অবশ্যই মদ্য দিবার বিধি আছে, অর্থাৎ যাহাদের রহস্যবোধে সামর্থ হয় নাই, তথায় তাহার অনুকল্প গুড় ও আদা অথবা তাম্রপাত্রে বারি প্রদান করিলেও মদ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

পঞ্চমকারের স্থূল ও অনুকল্প বিধি :—১। মদ্য—ব্রাহ্মণগণ দুগ্ধজাত, ক্ষত্রিয়গণ ঘৃতজাত, বৈশ্যগণ মধুজাত এবং শূদ্রগণ পৈষ্টী অর্থাৎ ধান্যাদি-জাত স্থূল মদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিতে পারিবে। অনুকল্প স্থলে দুগ্ধ, চিনি ও মধু, ইহা মধুরত্রয় নামে কথিত। মদ্যের অনুকল্পরূপে ইহা নিবেদন করিতে পারা যায়। তাম্বূল (পান), তামাক, গাঁজা, তাড়ী, অহিফেন, খর্জ্জুর রস, ধুতুরা ও সিদ্ধিও অষ্টবিধ সুরারূপে মোদক ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যাক্তিগণ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা বীরভাবের অপুষ্ট সাধক আত্মপরীক্ষা স্থলেই গ্রহণ করে। ('পূজাপ্রদীপে' বীরভাব ও বামাচার দেখ)। উচ্চাধিকারী বীর সাধকের পক্ষে গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী মদ প্রশস্ত।

২। মাংস,—লবণ, আদা, পিষ্টক, শ্বেত তিল, লাল গম, মাষকলাই ও লশুন বা রশুন, মাংসের অনুকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়। শ্বেত কুষ্মাণ্ড মাংস জ্ঞানে নিবেদন করা হয়। এই সকল দগ্ধরূপে গ্রহণ করাও শাস্ত্রাদেশ আছে। পশুভাবের ও বীরভাবের অপুষ্ট সাধকের পক্ষেই এই বিধি। কিন্তু উচ্চাধিকারী বীরভাবের সাধকের আত্মপরীক্ষা স্থলে জলচর, স্থলচর ও খেচর ত্রিবিধ জীবের মাংস ব্যবহার হইতে পারে। ('পূজাপ্রদীপ,'— বলিদানে ষড়্‌বিধ বিষয় তত্ত্ব দেখ)।

৩। মৎস্য—সুদুগ্ধ, শ্বেত বেগুন, লাল মূলা, লাল বর্ণ পাকা আমড়া, বাতাবি লেবু, কাগচি লেবু, ভিজা মসুরকলাই, পানিফল, লাল বর্ণ কন্‌কা শাক ও লাল বর্ণ তিল, মৎস্যের অনুকল্পে গৃহীত হইতে পারে। (পূজা-প্রদীপে' বলিদানে ষড়্‌বিধ বিষয় তত্ত্ব দেখ)। নারিকেল, শ্রীফল, আমলকী ও হরীতকী ফল মৎস্যের পরিবর্ত্তে নিবেদন করা যায়। মৎস্যাভাবে যে কোন দগ্ধ দ্রব্য চলিতে পারে। ইহা পশুভাবের ও অপুষ্ট বীরভাবের পূজাতেই ব্যবহৃত হয়। উচ্চাধিকারী বীর সাধকের আত্মপরীক্ষাস্থলে শাল, বোয়াল ও রুই মৎস্য উত্তম, কণ্টকহীন মৎস্য অর্থাৎ চিংড়ী প্রভৃতি

মধ্যম এবং কণ্টকযুক্ত মৎস্য অর্থাৎ খয়রা, বাটা, ইলিশ আদি মৎস্য অধম বলিয়া গণ্য।

৪। মুদ্রা—ভর্জ্জিত ধান, চাউল, ছোলা, গম আদি যাহা চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া হয়, তাহাই মুদ্রার অনুকল্প। পশুভাবের ও অপুষ্ট বীরভাবের সাধকের পক্ষেই ইহার ব্যবহার আছে। উচ্চাধিকারী বীর সাধকের পক্ষে আত্মপরীক্ষা স্থলে ঘৃতপক্ক লুচি, কচুরী, নিমকি আদি সুস্বাদু ভর্জ্জিত বস্তু-সমূহ নিবেদন করা যায়। ('পূজাপ্রদীপে' বলিদানে ষড়্‌বিধ বিষয় তত্ত্ব দেখ)।

৫। মৈথুন—কূর্ম্ম মুদ্রা করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানান্তে তিন বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অনুকল্প মৈথুন সাধনা। ('পূজাপ্রদীপে' বীরভাব পূজা ও বলিদানে বিষয় তত্ত্ব দেখ)। ইহা পশুভাবের ও অপুষ্ট বীরসাধকের পক্ষে জানিবে। কিন্তু উচ্চাধিকারী বীরসাধকের পক্ষেও কেবল আত্ম-পরীক্ষা স্থলে একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন হইতে পারে। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"মন্ত্রার্থ স্ফুরনার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ।
সেব্যতে মধুমাংসাদি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী॥"

অর্থাৎ কেবল আত্মসংযম শক্তির পরীক্ষাস্থলেই মন্ত্রার্থ চৈতন্য বা ব্রহ্ম জ্ঞান পুষ্টির জন্যই উক্ত স্থূল বা পঞ্চমকার ব্যবহার করিবে। ভোগেচ্ছায় লোভ বা আসক্তি প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থকল্পে এই সকলের কখনই ব্যবহার করিবে না। তাহা হইলে ঘোর পাতকী হইতে হইবে। এই সমুদয়ের অধিকতর গূঢ়তত্ত্ব যথার্থ জ্ঞানী গুরুর নিকটই জ্ঞেয়।

"গুড়ার্দ্রকং তদা দত্মাত্তাম্রে বারি স্থজেন্মধু। এতৎ দ্রব্যন্তু শূদ্রস্য নান্যে-ষান্তু কদাচন"। এ সকল কেবল মাত্র শূদ্র অর্থাৎ নিম্ন অধিকারীর পক্ষেই সর্ব্বদা বিধেয়, অন্য কাহারও পক্ষে নহে। এইরূপ অন্যত্র মহাদেব বলিতে-

ছেন, "মাদকং ধর্ম্মসন্তেদাদ্ব্যজ্র্যমাসীৎ ত্রিলোচনে"। হে ত্রিলোচনে! মাদক দ্রব্য ধর্ম্মের হানিজনক, এই জন্যই ইহা সর্ব্বদা নিষিদ্ধ। বাস্তবিক মাদকদ্রব্য সেবনে চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির সামান্য একাগ্রতা হয় মাত্র কিন্তু তাহাতে মস্তিষ্কের ধারণা বা ধ্যানশক্তি একেবারে নষ্ট হয়। সুতরাং ধ্যানাভিলাষী উচ্চসাধক, ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞানী লোভার্থীর পক্ষে মদ্য বিষবৎ পরিত্যজ্য। দিব্যভাবে মদ্যে যে গূঢ় রহস্যের আভাষ বলা হইল, সাধকের তাহাই নিত্য সাধনার ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এ পার্থিব মদ্য উচ্চাধিকারী সাধকের আদৌ চিন্তনীয় নহে।

পঞ্চ-মকারের দ্বিতীয় তত্ত্ব 'মাংস'।

অব্যবহিত পূর্ব্বে মদ্য-সাধন-তত্ত্বের মধ্যে শ্রীক্রমোক্ত বচনে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণের বা ব্রহ্মজ্ঞের মদ্যের ন্যায় মাংসও ভক্ষণ করিতে নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মসাধকের এ সকলের আদৌ আবশ্যক নাই। প্রথম বা 'আদ্য' তত্ত্বের ন্যায় ইহারও গুহ্য রহস্য শাস্ত্রেই স্পষ্ট লিখিত আছে।

"মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

হে প্রিয়ে! 'মা' শব্দে রসনা বুঝায়, বাক্য তাহার অংশ সম্ভূত। (এস্থলে 'অংশের' শ মূলে 'স' রূপে লিখিত আছে।) সাধক সর্ব্বদা তাহা ভক্ষণ করেন; অর্থাৎ সাধক, বাক্য-সংযমী হইয়া মৌনাবলম্বী হন। আবার জীবের রসনাই যেন বিন্দুলোপে বাসনা, অতএব বাসনা, কামনা বা কামজয় করাও মাংস ভোজনের অন্যতম লক্ষ্য, অর্থাৎ সাধককে সংযমী হইতে হইবে। পক্ষান্তরে সাধনার অন্তর্গত যোগানুষ্ঠান কালে 'রসনাভক্ষণ অর্থাৎ জিহ্বার সংকোচনাদি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা 'খেচরি-মুদ্রায়' সিদ্ধ হইলে, সাধকের ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হয়।

"মানসাদীন্দ্রিয়গনং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মাংসাশীস ভবেদ্দেবি ইতরে প্রাণঘাতকঃ॥"

অর্থাৎ মন দ্বারা বা মানসিক ক্রিয়ারূপ প্রত্যাহারাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা যিনি আত্মসংযম করিতে পারেন তিনিই মাংসাশী যোগী। হে দেবি, মূর্খ নিম্নাধিকারী ব্যক্তি তাহা না জানিয়া পশুবধ পূর্ব্বক মাংস ভক্ষন করে। অন্যত্র * কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি রিপুরূপী পশুগুলিকে জ্ঞানরূপ খড়গদ্বারা বলি প্রদান পূর্ব্বক সমাংস করিয়া ব্রহ্মানন্দ-প্রদ নির্ব্বিষয়রূপ দ্বিতীয় তত্ব মাংস ভক্ষণ করেন।

"মাংসনোতি হি যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
ন চ কায় প্রতীকন্তু যোগিভির্মাংসমুচ্যতে॥"

সাধক নিজকৃত সৎ ও অসৎ কর্ম্ম আমাতেই সমর্পণ করে। এইরূপ সাধকই প্রকৃত মাংস-সাধক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

তৃতীয়-তত্ব 'মৎস্য' সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন:—

"গঙ্গা যমুনয়ের্ম্মধ্যে মৎস্যৌদ্বৌচরতঃ সদা।
তৌমৎস্যৌ ভক্ষয়েৎযস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥"

পঞ্চ-মকারের তৃতীয় তত্ব 'মৎস্য'।

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা এই নদীদ্বয়ের মধ্যে দুইটী মৎস্য সতত বিচরণ করিতেছে, সেই মৎস্য দুইটি ধরিয়া যে সাধক ভক্ষণ করিতে পারেন, তিনিই মৎস্যসাধক। ইহার তাৎপর্য্য "জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রে" স্পষ্ট লিখিত আছে।

"ইড়া ভাগিরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনানদী।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥

---

* "ছিত্বা জ্ঞানাসিনা সর্ব্বান্ কামক্রোধাদিকান্ পশূন্।
ভূংক্তে মোহবিষয়ং মাংস দ্বিতীয়া তত্বমাহৃতা॥"

ত্রিবেণী সঙ্গমোযত্রতীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্রস্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥"

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ এই দেহমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাম্নী নাড়ীত্রয় যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিতা; এই তিনের সঙ্গম-স্থলকে ত্রিবেণী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সাধক এই ত্রিবেণীতে অর্থাৎ যোগ-নির্দ্দিষ্ট মুক্ত ত্রিবেণীর মূল আধার বা কুণ্ডলিনীচক্র হইতে আজ্ঞাচক্রস্থ যুক্ত-ত্রিবেণীতে অবগাহন করিতে পারিলে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। গঙ্গা ও যমুনা প্রকটা, সরস্বতী অপ্রকটা, তাহা কেবল যোগীদিগেরই বোধ-গম্যা; স্থূলচক্ষে প্রয়াগতার্থে ত্রিবেণী-সঙ্গমেও সরস্বতী অন্তঃসলিলা। যাহা হউক এই ইড়া ও পিঙ্গলারূপিণী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ু মৎস্যরূপে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, সাধক তাহাই ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ সাধক যোগাবস্থায় নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিরোধ করিয়া বায়ু সংযম বা কুম্ভকের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। তাহাই তন্ত্রের রহস্যতত্ত্বে মৎস্য-সাধনা। এই জন্যই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—

"ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তমসা জনাঃ
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষ বরাননে।"

জ্ঞানান্ধ মূঢ় লোক এ তীর্থ সে তীর্থ করিয়া ঘুরিয়া মরে, যে যোগবলে আত্মতীর্থ দর্শন করিতে না পারে, তাহার মোক্ষ কিরূপে সম্ভবে? তাই শিব 'জ্ঞানসঙ্কলিনী'তে বলিয়াছেন, "ভ্রান্তি বদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ।" অন্যত্র 'কুলার্ণবে' বলিয়াছেন, "কর্ম্মবদ্ধঃ কর্ম্মমুক্তঃ সদাশিবঃ।" অর্থাৎ ভ্রমে আচ্ছন্ন বা কর্ম্মে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব এবং ভ্রম অথবা, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইলেই জীবের শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। উক্তরূপ সংযমাদি সহযোগে জীব আত্মোন্নতি করিতে পারে। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন যে—

"পুণ্যাপুণ্যো ভয়ং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং স মাংসাশী নিগদ্যতে॥"

যে যোগবিদ্ সাধক জ্ঞানরূপী খড়্গের দ্বারা পুণ্য ও পাপ ধ্বংস করিয়া চিত্তবৃত্তি লয় করিতে পারেন, তিনিই মাংসাশী বলিয়া কথিত হন।

"মৎসমানং সর্ব্বভূতে সুখদুঃখাদি মৎপ্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্ত্বিক জ্ঞানং তম্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ যে সাধক বুঝিতে পারেন যে আমার ন্যায় সকল জীবেরই সুখ ও দুঃখ আছে; আমার ন্যায় সকলেই সুখী ও দুঃখী হয় এইরূপ যথার্থ বা সাত্ত্বিক জ্ঞান পুষ্ট ব্যক্তিই মৎস্য সাধক বলিয়া কথিত হন।

চতুর্থতত্ত্ব 'মুদ্রা' সম্বন্ধে শিব বলিতেছেন—

"সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্।
অসৎসঙ্গে মুদ্রনং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতম্॥"

অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা জীবের মুক্তি হয় ও অসৎসঙ্গের দ্বারা বন্ধন হয়, যে সাধক অসৎসঙ্গের মুদ্রণ বা পরিহার দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারেন তিনিই মুদ্রাসাধক।

পঞ্চ-মকারের চতুর্থ তত্ত্ব 'মুদ্রা'।

"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ।
আত্মাতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্॥
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্॥
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।"

হে দেবেশি! সহস্রদল মহাপদ্মের অন্তর্গত মুদ্রিতা কর্ণিকার অভ্যন্তরে শ্রীগুরুপাদুকাকমলের মধ্যে শুদ্ধ পারদসদৃশ যে আত্মা বা পরমাত্মার অবস্থিতি আছে, যাহার তেজ কোটিসূর্য্যসদৃশ হইলেও স্নিগ্ধতায় কোটীচন্দ্রের সমতুল্য, এই পরম পদার্থ অতি কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীশক্তি সমন্বিত।

উচ্চ সাধক, যোগবলে তাহার জ্ঞান লাভ করিলেই মুদ্রাসাধক বলিয়া কথিত হন। পক্ষান্তরে :—

"আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সাভয়বিশদঘৃণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ।
ব্রহ্মাগ্নাবষ্টমুদ্রাঃ পরসুকৃতিজনঃ পচ্যমানঃ সমন্তাৎ॥
নিত্যং সংখাদয়েত্তানবহিতমনসা দিব্যভাবানুরাগী।
যোঽসৌ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডে পশুগণ বিমুখোরুদ্রতুল্যো মহাত্মা॥"

যে দিব্য বা সত্ত্বভাবাপন্ন উচ্চসাধক নিত্য অতি সাবধানচিত্তে আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা ও আক্রোশ বা ক্রোধরূপ (পাঠান্তরে শঙ্কা বা সন্দেহ) অষ্টবিধ মুদ্রাকে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা পাক করিয়া ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ এই বৃত্তিগুলিকে শাসন বা দমন করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড মধ্যে পশুপাশবিমুক্ত রুদ্রসম মহাত্মা বলিয়া পূজিত হন।

পঞ্চ-মকারের পঞ্চম তত্ত্ব 'মৈথুন'।

পঞ্চ-মকারের শেষ বা পঞ্চম তত্ত্ব 'মৈথুন'। ইহা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। ভাষায় ইহার নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কেবল গুরুকৃপায় কঠোর সাধনা-সাহায্যে উপলব্ধি হয়।

"মৈথুনস্য পরংতত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারণম্।
মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্॥"

মৈথুনতত্ত্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে পরমতত্ত্ব নামে উল্লেখ আছে। গুরুমুখাগত হইয়া যোগ রহস্যসাধনায় যখন সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়, তখনই সাধক দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৈথুন সিদ্ধ হইয়া থাকেন। ইহার অতি সামান্য আভাষমাত্র মহাদেব যাহা প্রকটভাবে বলিয়াছেন তাহা এই—

'সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডলীং মিলনং শিবে,
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতীনাং পরিকীর্ত্তিতম্।'

সহস্রারের উপরিস্থিত বা তাহার মধ্যস্থিত পাদুকাকমলের উপরিস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিন্দু বা পরমাত্মার সহিত কুণ্ডলিনী বা জীবনীশক্তি-আশ্রিত জীবাত্মার মিলনসাধনই সাধুগণ পঞ্চমী বা 'মৈথুনতত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। * যোগিগণ অহর্নিশ এইরূপ মৈথুন বা রমণ ক্রিয়ায় রত থাকেন।

"আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্ততুচ্যতে।"

আত্মাকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মার সহিত যে সাধক আপনাকে শক্তিরূপ ভাবনা করিয়া তাহাতেই রমণ করেন, অর্থাৎ লীন হইয়া যান, তিনিই দিব্যভাবে 'মৈথুনসাধক'।

"যা নাড়ী সূক্ষ্মরূপা পরমপদগতা সেবনীয়া সুষুম্না।
সা কান্তালিঙ্গনার্হা ন মনুজরমণী সুন্দরী বারযোষা॥
কুর্য্যাচ্চন্দ্রার্কযোগে যুগপবনগতে মৈথুনং নৈব যোনৌ।
শেতে যোগেন্দ্রবন্দ্যাঃ সুখময় ভবনে তাং সমাদায় নিত্যম্॥"

কুণ্ডলিনী-চক্র বা মূলাধার হইতে যে অতি সূক্ষ্ম সুষুম্না নাড়ী বা তাহার অন্তর্গত শক্তিস্রোত সহস্রদলস্থিত পরমপদে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই যোগীজনের সেবনীয়া বা সেব্যা, সেই কান্তাই আলিঙ্গনযোগ্যা, মনুষ্যরমণী সুন্দরী বারযোষা বা বেশ্যা সাধকের সেবনীয়া নহে। চন্দ্র এবং সূর্য্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীতে প্রবাহিত নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুদ্বয়ের সংযম করিয়া সুষুম্নাপথে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া প্রবাহিত করিলে, অর্থাৎ মৈথুনাসক্ত হইলে, যোগীশ্রেষ্ঠ সাধকগণ পরমানন্দময় সমাধিলাভ করেন: ইহাই দিব্যভাবে 'মৈথুন' সাধনা।

---

* "যা প্রোক্তা কুণ্ডলীশক্তি লিঙ্গে নৈব স্বয়ম্ভুনা।
রমতেঽহর্নিশং যত্র পঞ্চমী স্যাদ্বরাঙ্গনা॥"

সাধারণ তামসিকাচারের মধ্যেও কলিতে মৈথুন-বিধি নাই ; সেই সময় চক্রমধ্যে মহাশক্তির ধ্যান করিয়া জপ করিবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইহাই দিব্যভাবে পঞ্চমকারের সাধনা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মদ্য—বিষ্ণু, মাংস—ব্রহ্মা, মৎস্য—রুদ্র, মুদ্রা—ঈশ্বর, এবং মৈথুন—সদাশিব। এক্ষণে সাধক মূলাধার হইতে চক্রে চক্রে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এই দেবতাপঞ্চকের ধ্যানান্তে নিজ আত্মশক্তিকে সমুন্নত করিয়া চিদ্ঘনানন্দপ্রাপ্ত হন।

সাত্ত্বিক পঞ্চমকারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নির্ব্বাণতন্ত্রের ১১ পটলে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—হে শৈলজা, এই মদ্যপান করিতে পারিলে অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ বা পরম মোক্ষ লাভ হয়, মাংস ভক্ষণে সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য হওয়া যায়, মৎস্য ভক্ষণে কালিকাদির প্রত্যক্ষতা লাভ হয়, মুদ্রা সেবনে পৃথিবীতেই বিষ্ণু সদৃশ এবং মৈথুন দ্বারা মহাযোগী পুরুষ বা মৎসদৃশ হইতে পারা যায়।”

পূর্ব্বে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যে,—

“সাধয়েত্ত্রিবিধৈর্ভাবৈর্দ্দিব্যবীরপশুক্রমৈঃ।”

অর্থাৎ দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধভাবে সাধনার রীতি তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে ; পরন্তু সেই দিব্যভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান শঙ্কর বলিতেছেন :—

“দিব্যাস্তু দেববৎ প্রায়াঃ সদাচার পরায়ণাঃ।
ঋণাধানং তথা শাঠ্যং হিংসাঞ্চৈব বিশেষতঃ॥
স্নানং সন্ধ্যাঞ্চ পূজাঞ্চ দিবা কুর্য্যাত্রয়ং ত্রয়ম্।
পরস্ত্রী মাতৃবদ্বুদ্ধ্যা পরং পুত্র বদিষ্যতে॥

সদা সত্ত্বগুণং স্থিত্বা ব্রহ্মচারী ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
যোষাবক্ত্রমূরুঞ্চাপি কুচং বা সাধকোত্তমঃ ॥
দৃষ্টা মাত্রং জপেল্লক্ষং দ্বাদশং স্বর্ণমুৎসৃজেৎ ।
তর্পয়েৎ সুধয়া দেবীং তারাং তারকদায়িনীম্ ॥
সাক্ষাদিন্দ্রো ভবেৎ সোঽপি যদি যোষাং ন চ স্পৃশেৎ ।
যোষাস্পর্শনমাত্রেন দিব্যভাবো বৃথা ভবেৎ ॥
যাবত্তপস্যা কর্ত্তব্যা তাবদ্ যোষাং বিবর্জ্জয়েৎ ।
মৎস্যো মাংসং তথা তৈলং স্নিগ্ধান্নং মোদকস্তথা ॥
স্ত্রী শূদ্রৌ নৈব দ্রষ্টব্যৌ চান্যথা পতনং ভবেৎ ॥
যাতে সিদ্ধে চ তপসি ঋতুকালে ব্রজেৎ স্ত্রিয়ম্ ।
পঞ্চপর্ব্ব বর্জ্জয়িত্বা নোচেদ্ভ্রষ্টো ভবিষ্যতি ॥”

অর্থাৎ দিব্যভাবালম্বী সাধকগণ, দেবতাগণের ন্যায় সতত সদাচার নিরত থাকিবেন, ঋণাধান শাঠ্য, বিশেষতঃ হিংসা দ্বেষ আদি অসৎ বৃত্তিসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য দিবাভাগে স্নান, সন্ধ্যা ও পূজাদি কার্য্য, ত্রিসন্ধ্যায় নিয়মিত সম্পন্ন করিবেন। তাঁহারা পরস্ত্রীকে মাতার মত জ্ঞান করিবেন, অন্য সাধারণকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিবেন এবং সদা সত্ত্বগুণান্বিত থাকিয়া সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী হইবেন। স্ত্রীলোকের বদন, উরু এবং স্তন দর্শন করিলে বা দর্শন করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্বাদশ লক্ষ জপ এবং স্বর্ণ উৎসর্গ করিয়া দান করিবেন এবং তারকদায়িনী তারাদেবীর সুধা-সমন্বিত তর্পণ করিবেন। যে সাধক স্ত্রীকে স্পর্শ না করিয়া সাধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনি ইন্দ্র সমতুল্য হইতে পারেন। স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিলে, সাধকের দিব্যভাব বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তপস্যা বা সাধন-সময়ে স্ত্রীসংসর্গ একেবারে

পরিত্যাগ করা বিধেয়। মৎস্য, মাংস, তৈল, স্নিগ্ধান্ন ও মোদকাদি পরিত্যাগ করা উচিত। এমন কি স্ত্রী ও শূদ্রাদিকে বা অধম সাধকদিগকে দর্শন পর্য্যন্ত করিবেন না; কারণ তাহাদের সংসর্গে সাধকের চিত্তে সহসা লৌকিক ভাবের উদয় হইতে পারে, সুতরাং তাহাতে পতন অনিবার্য্য। তপস্যায় সিদ্ধি, বা নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে কেবল ঋতুকালে স্ত্রীতে উপগত হইতে পারিবে, তাহাও শ্রেষ্ঠ পঞ্চপর্ব্ব অর্থাৎ 'অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও সংক্রান্তি', এই পঞ্চ দিবস বর্জ্জন করিয়া স্ত্রীর ঋতু-রক্ষা কর্ত্তব্য; নতুবা সাধন ভজন সমস্তই ভ্রষ্ট হইবে। অতএব সাধারন পঞ্চ-মকার বিশেষ সাধন ক্রিয়ার স্থলে মৈথুন-সাধনা, উন্নত সাধকের পক্ষে কতদূর দোষাবহ তাহা এখন সহজেই অনুমেয়।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাবে পঞ্চ-মকারের যে সকল সাধনার কথা উক্ত হইল, তৎসম্বন্ধে যাহার যেমন অধিকার প্রবৃত্তি বা মনোভাব, তিনি তেমনই বুঝিয়া লইবেন *; তবে মোট কথা—সাধনার বস্তু গুরুমুখাগত না হইলে হৃদয়ে ঠিক উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই। রাজর্ষি-জনকের ন্যায় কামিনী কাঞ্চনে সদা সমাবৃত থাকিয়াও রাজসিক বা বীরভাবের সাধনায় যাঁহারা তাহাতে আসক্ত হইবেন না, শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় বীর-সাধককে দুষ্টগণ শত চেষ্টায় দশ বিশ বোতল তীব্র সুরা সেবন করাইলেও যাঁহার মত্ততা হইত না, অথবা যাঁহাকে মদ্য পান করাইয়া নগ্ন সুন্দরী যুবতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া অতি বীভৎস পরীক্ষা করিলেও. যাঁহার বিন্দুমাত্র কামের উদ্রেক হওয়া দূরের কথা, কিঞ্চিন্মাত্র চিত্তচাঞ্চল্যও উপস্থিত হইত না, তাঁহার ন্যায় বীরাচারীর সাধন-সামর্থ্য কি 'ছেলে খেলা' কথা, না সে বীরশক্তি সামান্য সাধনায় পুষ্ট? মদ্যকে যিনি

---

* "পূজাপ্রদীপে" পূজা ও উপাসনা ভেদ দেখ এবং উহাতে বলিদানে ষড়্‌বিধং বিষয়তত্ত্বও দেখ।

সাধনার বলে, এক কথায় সুধা বা অমৃতে পরিণত করিতে পারেন, কামাদি প্রলোভনময় সাংসারিক কথা, যাঁহাকে স্বপ্নেও দেখা দিতে শঙ্কা বোধ করে, পঞ্চভূত ভৃত্যরূপে যাঁহার সেবক হইবার জন্য সশঙ্ক ভাবে প্রতীক্ষা করে, রিপুদল যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তিনি দিব্যভাবাপন্ন হউন, অথবা বীর বা পশু যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই ! যাহা হউক, এ সকল সাধনার রহস্যকথা, চিরদিন ধরিয়াই অতি গুপ্ত সাধনাপদ্ধতির অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে।

সাধন প্রদীপে পঞ্চমকারের অনুকল্প বিধি—'কৌলিকার্চ্চন দীপিকায়' দেখিতে পাওয়া যায় :—

"বিজয়াত্বাদ্যমদ্যং স্যাৎ আদ্য শুদ্ধিস্তু আর্দ্রকম্।
আদ্যমীনস্তু জম্বীরম্ আদ্য মুদ্রাতু ধান্যকম্।
আদ্যশক্তিঃ স্বদারাঃ স্যাৎ তামেবাশ্রিত্য সাধয়েৎ ॥"

অর্থাৎ বিজয়া বা ভাং সিদ্ধিই আদিমদ্য আদ্রক বা আদাই আদি শুদ্ধি স্বরূপ মাংস, জম্বীর বা লেবুই আদি মৎস্য, ধান্যই আদি মুদ্রা এবং নিজ পত্নীই আদি শক্তি, এই পঞ্চমকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই সাধক সতত নিজ সাধন কার্য্য করিবে। ইহাই পঞ্চমকারের আদি অনুকল্প।

বৈষ্ণবী পঞ্চমকার সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব নির্ব্বানতন্ত্রে বলিয়াছেন যে,—

"শৃণু তত্ত্বং বরারোহে বৈষ্ণবস্য ত্রিলোচনে।
গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং বর্ণতত্ত্বং সুরেশ্বরি ॥
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥

হে ত্রিলোচনে, হে সুরেশ্বরি, হে বরাননে, গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্বকেই বৈষ্ণবী পঞ্চতত্ত্ব বলে।

গুরুতত্ত্ব—

"স তৈলং বর্ত্তিকাযুক্তং দেহস্থং ব্রহ্মতেজসম্।
গুরুণা মন্ত্রদানেন তৎসূত্রং দীপিতং ভবেৎ॥"

মন্ত্রতত্ত্ব—

"দেবোক্তাত্মা শরীরং হি বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।
অতএব হি তস্যাত্মা দেবরূপো ন সংশয়ঃ॥"

বর্ণতত্ত্ব—

"ঈশ্বরস্য তু যদ্বীর্য্যং তদেব অক্ষয়াত্মকম্।
তেন বর্ণাত্মকং দেহং জন্তোরেব ন সংশয়॥
সর্ব্ববর্ণেন সর্ব্বাত্মা নীয়তে পরমেশ্বরি।
বর্ণতত্ত্বমিদং দেবি মম সর্ব্বস্ববস্তুবেৎ॥"

দেবতত্ত্ব—

"স্বয়ং দেবো ন চান্যোঽস্মি নির্ম্মলো দেবরূপধৃক্।
সর্ব্বত্র দেবতাং ধ্যায়েদ্ গুরুগুল্মলতাদিষু॥"

ধ্যানতত্ত্ব—

"ধ্যানেন লভতে সর্ব্বং ধ্যানেন বিষ্ণুরূপকঃ।
ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি বিনা ধ্যানং ন সিদ্ধ্যতি।"

অধুনা অধিকারীর অভাবে বেদের ক্রিয়াভাগ উর্দ্ধাম্না বা তন্ত্রশাস্ত্র অথবা বেদান্তের সাধনাংশ লোকসমাজে অতি অল্পই প্রকাশিত আছে। সাধারণ মানবের দুরধিগম্য প্রাচীন মঠ, গুহা বা আশ্রম সমূহে সেই প্রত্যক্ষ শাস্ত্রগ্রন্থগুলি নানাভাবে অতি যত্নে রক্ষিত আছে; সময়ে তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। অধুনা শ্রীমদ্ গুরুমণ্ডলীর আদেশ ক্রমেই তাহার প্রকাশ ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল।

গূঢ় রহস্যময় তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রের প্রতি অক্ষরের অর্থ ও উদ্দেশ্য

বা তাহার তত্ত্ব অতি গভীর ভাবে পরিকল্পিত রহিয়াছে; সে কঠিন গুপ্ত সাধনতত্ত্ব তর্কপরায়ণ অনধিকারী ব্যক্তির বোধাতীত রাখিবার জন্যই দেবাদিদেব মহাদেব সাঙ্কেতিকভাবে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রে বার বার এ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রত্যক্ষরাণাং ব্যুৎপত্তিরাগমে পরিকল্পিতা।
সঙ্কেতার্থং শিবপ্রোক্তং কথং জ্ঞাস্যন্তিস্থূরয়ঃ ?"
"শিবো জানাতি তন্ত্রার্থং সুগমং তন্ত্রমীরিতম্।
শ্রীনাথকৃপয়া বাপি দেবানামনুকম্পয়া ॥"

শিবপ্রোক্ত আগম-নিগম বা তন্ত্র শাস্ত্র কেবল সদ্‌গুরুর কৃপায় অবগত হইতে পারা যায়, অন্যথা উহার মর্ম্ম গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। এক্ষণে আগম ও নিগম সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া "তন্ত্র কি" শীর্ষক দ্বিতীয়োল্লাস সম্পন্ন করিব।

"আগতং শিববক্ত্রেভ্যোঃ গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ।
মতঞ্চ বাসুদেবেন তেনাগম ইতি স্মৃতঃ ॥"

আগম ও নিগম দ্বৈতাদ্বৈত্য তত্ত্ব।

শিব বক্ত্রবৃন্দ হইতে আগত, গিরিজাকর্ণে গত ও নারায়ণের দ্বারা সমর্থিত এই তিন কারণে—'আগতং' 'গতং' ও 'মতং' এই তিনটী শব্দের আদ্যাক্ষর একত্র যোজনা করিয়া আ+গ+ম=আগম হইয়াছে। এইরূপ নিগম সম্বন্ধে—

"নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাৎ গতঞ্চ গিরীশশ্রুতৌ।
মতঞ্চ বাসুদেবেন নিগমস্তেন কীর্ত্তিতম্ ॥"

গিরিজা-বক্ত্র হইতে নির্গত, পঞ্চাননের শ্রুতিগত গত এবং শ্রীবাসুদেব দ্বারা সমর্থিত এই তিন কারণে 'নির্গতঃ' 'গতং' ও 'মতং' এই ত্রিশব্দের আদ্যাক্ষর যোজনা করিয়া নি+গ+ম=নিগম হইয়াছে।

আগম ও নিগম শিবশক্তির ন্যায় অভেদ্য সাধন-শাস্ত্রের দুইটি অংশ মাত্র। 'শিব' ও 'শক্তি' এই দ্বৈতভাবের মধ্য দিয়া একধারে 'শিবশক্তি' বা তুরীয়ভাবে অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বে যাইবার শিবনির্ণিত পন্থামাত্র। বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রোক্ত বা জ্ঞানতন্ত্রোক্ত অদ্বৈততত্ত্ব স্বরূপতত্ত্ব সত্য, কিন্তু দ্বৈতদর্শী সংসারী জীব-সাধারণের পক্ষে তাহার চিন্তা বা অনুভব সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ অদ্বৈত পথে যাইতে হইলে, প্রথমে দ্বৈত পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, অর্থাৎ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য প্রথমেই গুরুর শরণাগত হওয়ারূপ দ্বৈতভাবের অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় যে নাই। অদ্বৈতের সে পথ দেখাইয়া দিবে কে ? সুতরাং তন্ত্রোক্ত সাধনাবিধির মধ্যে প্রাথমিক দ্বৈতভাবের সাধনা, অদ্বৈতজ্ঞানের পক্ষে অনুকূল ব্যতীত প্রতিকূল নহে। তন্ত্রেই আবার তাহার সম্পূর্ণ ভরসা দিয়া শ্রীসদাশিব বলিয়াছিলেন—

> "অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
> মূলতত্ত্বং বিজানন্তি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিতাঃ।"

কেহ অদ্বৈতজ্ঞান কেহ বা দ্বৈতজ্ঞানের ইচ্ছা করেন, কিন্তু যাঁহারা আমার তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় তত্ত্বের অতীত হইয়াছেন অর্থাৎ এই আনন্দময় সংসারে "আমায়" জানিতে পারিলে আর কোন চিন্তাই থাকে না। 'আমিময়' বা 'শিবময়' জগৎ বুঝিতে পারিলে, তাহার আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তখনই তুরিয়ানন্দে সাধক বলিয়া ফেলেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্"! ইহাই তন্ত্রের শেষ লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু অদূরদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি অপুষ্ট সাধনা ও অপরিণত বুদ্ধির ফলে কেবল মুখে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া অন্য সাধারণের উপাস্য দেবতা 'কালী', 'তারা', 'কৃষ্ণ' বা 'বিষ্ণুকে' ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া, নিজেরই দ্বৈত বা ভ্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া

থাকেন। সাধারণ সাধক, তন্ত্র বা আগম-নির্দ্দিষ্ট 'কালী' অথবা 'কৃষ্ণ' এখন যাঁহারই উপাসনা করুন না, তাঁহার উপাস্য-দেবতাকে তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী বা ব্রহ্মময় বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; সুতরাং সেই প্রথম অবস্থা হইতেই দ্বৈতের মধ্যে * অদ্বৈতের জ্ঞান পুষ্টিলাভ করিবার পক্ষে তাঁহার সম্পূর্ণ অবসর হয়। এখন সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, অদ্বৈতবাদী, যাহাকে 'দ্বৈত' বলে, তাহাই 'অদ্বৈতজ্ঞানের' প্রথম সোপান; নতুবা 'তুমি' ও 'আমির' জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত নিগমাগম-রূপে সংসার সতত-দ্বৈতভাবময়, তাহার পর সম্পূর্ণ সাধন-সমাধি অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর সাধকের 'শিবোঽহম্' রূপ অদ্বৈত-অবস্থা! তন্ত্রে পর্য্যায়ক্রমে তাহাই নির্দ্দিষ্ট আছে। এই পরমাদ্ভুত 'তন্ত্রশাস্ত্র' এই প্রবল কলির দিনে ক্রমে প্রকৃত রহস্যসহ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইবে। তাহাও সেই দেবাদি-দেব শিবের আজ্ঞা! ওঁ সদাশিব ওঁ॥

---

* "পূজাপ্রদীপে" 'উপাস্যভেদ' এবং মহামায়া ও শক্তিতত্ত্ব দেখ।

তৃতীয়োল্লাস

আগমে আচার-তত্ত্ব

আগমোক্ত আচার-তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে সাধারণ

বোধাদি

পাঠকের পক্ষে পূজা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িবে। সাধনাকাঙ্খিগণের মধ্যে সেই কারণ বৃথা সন্দেহ ও

নবধা আচার

তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। ভগবৎতত্ত্বাভিলাষী সাধকের পক্ষে ঊর্দ্ধাম্নায় শাস্ত্রে যে নব-সংখ্যক আচার ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করিবার বিধি আছে, তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট নয় প্রকার আচার যাহা কুলাচার বা ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানসাধনার পক্ষে নয়টি সোপান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা ত্রিবিধ ভাব প্রধান হইয়া নিম্ন, মধ্য ও উচ্চরূপে যথাক্রমে পশুভাব বীরভাব ও দিব্যভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে। * রুদ্রযামলে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীরভাবকম্।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ॥"

অর্থাৎ সাধকের মনোবৃত্তির অনুকূল জ্ঞানাধিকারে নিম্নস্তরকে পশুভাব, মধ্য বা দ্বিতীয় স্তরকে বীরভাব এবং উচ্চ বা তৃতীয় স্তরের জ্ঞানাধিকার পুষ্ট উপাসনাকে দিব্যভাব বলে।

এই ত্রিভাব আচার তমঃ, রজ ও সত্ত্বগুণের প্রাধান্য অনুসারে প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার হইয়া ৩×৩=৯ সমষ্টিরূপে নয় প্রকার অনুভাব বা

---

* 'পূজাপ্রদীপে' উপাসনা ভেদ দেখ।

আচারে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পশুভাবের তিনটি, বীরভাবের তিনটি এবং দিব্যভাবের তিনটি অনুভাবেই যথাক্রমে—'পশুভাবে' (১) বেদাচার, (২) বৈষ্ণবাচার, (৩) শৈবাচার। 'বীরভাবে' (৪) দক্ষিণাচার, (৫) সিদ্ধান্ত-চার, (৬) বামাচার। 'দিব্যভাব' (৭) অঘোরাচার বা চীনাচার (৮) যোগা-চার, (৯) কৌলাচর, জ্ঞানাচার, সন্ন্যাসাচার বা অবধূতাচার।

'কুলার্ণবে' উক্ত আছে :—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমাঃ বেদাঃ বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তমুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি।

বেদ-বিহিত বিধানে সমস্ত অনুষ্ঠানই 'বেদাচার' নামে প্রসিদ্ধ।

বেদাচার। গৃহস্থের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ গুলিই বেদাচার বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদাচার আর্য্যের মূল আচার অথবা হিন্দুমাত্রের সর্ব্বপ্রথম অবলম্বনীয় সাধারণ নিয়মাদি। আবার ইহাই সাধনার বিরাট আচার, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নবসংখ্যক সমস্ত আচারই ইহার অন্তর্গত। শাস্ত্রে যেমন স্থূল সূক্ষ্মদেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার উল্লেখ আছে, তাহা যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অথবা স্থূলকথায় দুগ্ধের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেই যেমন নবনীত অন্তর্নিহিত থাকে, শাস্ত্রোক্ত সাধনার সোপান গুলিও সেইরূপ ঐ মূল বেদাচারেরই অন্তর্গত। বেদাচার স্থূল দেহরূপ অন্যান্য আচারগুলি আবরক মাত্র। অনভিজ্ঞতা বশতঃ উক্ত সূক্ষ্ম আচারসমূহ ক্রমে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র আচার বলিয়া সাধকগণের নিকট পরিচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; সুতরাং তাহা সাম্প্রদায়িক অঙ্গ বলিয়া যেন কেহ বিবেচনা না করেন। সাধকের জন্মার্জ্জিত সাধন-জ্ঞান বা

অবস্থা অনুসারে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হয় মাত্র। যখন সাধনাভিলাষী মানব ধর্ম্মবিশ্বাসরূপ বেদাচার নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও সাধনার দ্বারা অর্থাৎ সাধনপথে বিচারশূন্য হইয়া গুরূপদেশ অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া মনের মলিনতা নাশ, নিজে ভক্তিমান্ ও অন্তর বাহিরে পবিত্র হইয়া উঠেন, তখন সাধক সাধনার দ্বিতীয় স্তর বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবাচার। ভগবদ্বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন সাধক ব্রহ্মের পালনী-শক্তির পুরুষাকার ভগবান বিষ্ণুর বা স্ব স্ব ইষ্টদেবতার প্রেম ও দয়ার আলৌকিক মহিমারাশি হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন, তখন কেবল-মাত্র অন্ধবিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া শুদ্ধ পূজাদি অনুষ্ঠানে আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; তখন সাধক 'ভক্তি মাতোয়ারা' হইয়া কামসঙ্কল্প বর্জ্জন পূর্ব্বক পূজা অর্চ্চনা বা ভগবদ্‌গুণ-গান কীর্ত্তন করিতে করিতে জগৎকে মাতাইয়া তুলেন। ভক্তের হৃদয়োত্থিত সেই প্রেম ও ভক্তিভাবের তরঙ্গ-মালা চারিধারে, ক্রমে বিশ্বাসমুগ্ধ জীবের অন্তর পর্য্যন্ত, তাহা প্রতিহত হইতে থাকে। ইহাই সাধনা পথে 'বৈষ্ণবাচার'! বেদাচাররূপ বিরাট আবরণের অন্তর্নিহিত ইহাই দ্বিতীয়স্তর, অথবা ইহাকে বেদাচারের অন্ত রাবরণ বা কোষ বলা যাইতে পারে। 'বৈষ্ণবাচার' বৈষ্ণবদিগের নিজস্ব বা একমাত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে। ভ্রান্তজীব, ক্রমে সংস্কারদোষে আমাদিগের এই পবিত্র সনাতন-ধর্ম্মরূপ বিরাট-প্রতিমাকে সাম্প্রদায়িকভাবে ছিন্নভিন্ন করিয়া, সমাজের সেই সমবেত-শক্তিকে ক্রমেই বিনষ্ট ও ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রে পরিণত করিতেছে। আর্য্যদিগের চাতুর্ব্বর্ণ-বিভাগের যে কি গভীর উদ্দেশ্য তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ চিন্তা করিবারও অবসর পান না, এবং তাহার

সেই রহস্যও বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসহ কাহাকেও শিক্ষা দেন না, কাজেই আর্য্যসন্তান উদভ্রান্ত ও সংশয়জড়িত ভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই যে বিভাগ চতুষ্টয়, যেমন সমগ্র আর্য্যদিগের মূল বা স্থূল বিভাগ; সেইরূপ অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সময় ও অবস্থা ভেদে এই চারিটী বিভাগই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যখন মানব, ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া পূজা ও পাঠাদিতে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক সতত গুরু বা সাধুসেবা করিতে থাকে, ক্রমে সেই সেবা বিস্তৃতভাবে সংসারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে. তখনই মানবের ব্যক্তিগত শূদ্রত্বের সমাপ্তি হয়। এইভাবে জাতিগত সেবাই আর্য্যের নিম্নস্তর-নির্দ্দিষ্ট শূদ্রত্ব। ইহার উপরেই 'বৈশ্যত্ব'। যখন মানব, সেবা করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, আত্মপর বিচারশূন্য হইয়া, আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, সকলের পালনোদ্দেশ্যে পবিত্র-ভাবে কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এবং কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাসহ অবিরত ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখনই তাহাকে মানবের 'বৈশ্যত্ব' বলা যায়। সমস্ত বার-ব্রতে বৈশ্যগণই অগ্রণী। সেই কারণ অধিকাংশ ব্রতকথার নায়ক—বৈশ্য, বণিক বা সওদাগরদিগেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশ্যদিগের সর্ব্বসাধারণের অভীষ্টদেব সাধারণতঃ জগৎ প্রতিপালক ভগবান 'বিষ্ণু'। এই হেতু ভারতের সকল স্থলেই বৈশ্য বা বণিকগণ এখনও পর্য্যন্ত ব্রহ্মের পালনী বা 'বৈষ্ণবী-শক্তির' উপাসক হইয়া আছেন। ইহাই আর্য্যদিগের সমাজগত বা জাতিগত বৈশ্যত্ব' সাধকমাত্রের বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করাই ব্যক্তিগত বৈশ্যত্ব বা বৈষ্ণবত্ব। এই অবস্থায় যখন মানব পূর্ব্ব-কথিতভাবে ভগবদ্ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া, বৈষ্ণবের প্রধান কর্ম্ম কামবাসনা বর্জ্জিত হইয়া 'প্রভুর' অনির্ব্বচনীয় মহিমারাশির কীর্ত্তন করিতে করিতে,

নয়নে দর-দর-ধারায় প্রেমানন্দ অশ্রু অবিরত বহিতে থাকে, গদগদভাবে ভক্তের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আইসে, হৃদয় অপূর্ব্বভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, কীর্ত্তনের সে স্বভাবময়ী ভাষা আর যখন মুখে একটীও বাহির হয় না, অথবা সে ভাব ভাষায় বুঝি আদৌ ফুটে না, কেবল অন্তরেই তাহা উপলব্ধি করিবার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, তখনই সাধক, পরমানন্দে বৈষ্ণবাচারের সীমারেখায় আসিয়া উপনীত হন।

অনন্তর সাধক, তাঁহার সেই পরমারাধ্য নিত্যধন 'চিন্তামণিকে' কেবল অন্তরে ধ্যান বা ধারণা করিবার জন্য একাগ্রভাবে প্রয়াস করিতে থাকেন। এখন দল ছাড়িয়া, সকলে গোল ভুলিয়া কেবল নিভৃত স্থানে একান্তমনে 'তাঁহারই' চিন্তায় বসিয়া থাকেন। তখন অষ্টাঙ্গযোগের যথাসম্ভব উপদেশ সহ গুরুনির্দ্দিষ্ট বিধানে স্ব স্ব দেবতার উপাসনা ফলে সাধকের ধ্যান সমাধি বিদ্যমান থাকে তখন সাধনার সেই অবস্থাকেই শাস্ত্রে 'শৈবাচার' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের বিনাশ-সাধনাও তখন তাঁহাদের আর এক লক্ষ্যস্থল হইয়া পড়ে। বৈশ্য বা বৈষ্ণব অবস্থায় দয়া ও প্রেমাদি কমনীয়ভাবপুষ্ট-হৃদয়ে সে কার্য্য সম্পন্ন করা তখন কিছু কঠিন বলিয়া মনে হয়; সেই কারণ ব্রহ্মের 'সংহারী-শক্তির' পুরুষাকার ভগবান শ্রীমহেশ্বরের আচার অবলম্বন করাই সে সময় সাধকের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং সাধক, তখন দয়াদাক্ষিণ্যাদির সহিত কিছু কঠোর ভাবেরও পুষ্টিসাধন করিতে আরম্ভ করেন। পক্ষান্তরে, সাংসারিক মায়ামোহ আদি সংসার পালনের সহায়ক-গুণাবলীর বিনাশ সাধনও সাধনমার্গে 'শৈবাচার' গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য। ক্রমোন্নত সাধনাপথে, এখন শৈবাচার লাভ করাই ব্যক্তিগত ক্ষত্রিয়ত্ব!

শৈবাচার।

যখন প্রেম ও দয়াগুণে আশ্রিতের পালন করিতেছিলেন, তখনই দুষ্ট-দিগের দ্বারা আবার সেই আশ্রিত শিষ্টদিগের নানাবিধ উৎপীড়ন হইতেছে-

দেখিয়া, আর্য্য-সন্তান, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিতে যত্নবান হন, এবং তজ্জন্য আত্মজীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা আশঙ্কিত হন না, অথচ তৎসহ ভগবদ্ভাবে মত্ত হইয়া অন্তরে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তির অদ্ভুত মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে করিতে ক্রমে প্রবৃত্তির কণ্টকপথ পরিষ্কৃত করিতে থাকেন, তখনই তাহার জাতিগত বা সমাজসম্মত শৈবত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব। সেই কারণ ক্ষত্রিয়গণ এখনও একাধারে বিষ্ণু ও শিবোপাসক। জাতিগতই বা ব্যক্তিগতই হউক, সাধকের সাধনমার্গে 'শৈবাচার সেই পশুভাব পুষ্ট বিরাট বৈদিকাচারের তৃতীয় অন্তরস্তর বা সাধনার তৃতীয় অবস্থা। এই আচারের সমাপ্তির সহিত সাধকের পশুভাব উত্তীর্ণ হয়। পশুভাব অর্থে, লোমলাঙ্গুলযুক্ত জীব বিশেষের ভাব নহে, 'পশু' অর্থে দেবতা তাই দেবাদিদেব 'পশুপতি' নামে প্রসিদ্ধ। অতএব মত্তভাব বা শৈবাচার ব্রহ্মচর্য্যাদিপুষ্ট সাধকের দেবভাব বা দেবাচার বলিয়া শিবোপ্রোক্ত। ইহা কাহারও অবজ্ঞার বস্তু নহে।

ইহার পর বীরভাবের সাধনা আরম্ভ হয়। বীরভাবের প্রথমেই দক্ষিণাচার। শৈবাচারের পর বলিয়া এই 'দক্ষিণাচার' সাধনার চতুর্থ আধ্যাত্মিক অবস্থা। তন্ত্রে, 'দক্ষিণ' শব্দে অনুকূল, এইরূপ বর্ণিত আছে; সুতরাং 'দক্ষিণাচার' বা উচ্চ-সাধনার অনুকূল আচার গ্রহণ করাই, সাধকের পক্ষে এখন একান্ত কর্ত্তব্য। যখন সাধক, সাধনার অতি ধীর পদবিক্ষেপে অতি নিম্নস্তর হইতে ক্রমে একাধারে ব্রহ্মের ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রিশক্তির ধ্যান ও ধারণা করিতে সমর্থ হন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সমন্বয় দেখিতে পান, তখন হইতেই পূর্ণাভিষেকাদি দীক্ষান্তে সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল এই 'দক্ষিণাচার' গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। 'শূদ্রত্ব' 'বৈশ্যত্ব' ও 'ক্ষত্রিয়ত্ব' হইতে 'ব্রাহ্মণত্বের' ক্রিয়া কঠিন এই সময় হইতেই তাহা আরম্ভ হয় বলিয়া, তাঁহারা একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও

'দক্ষিণাচার।'

মহেশ্বরের ত্রি-শক্তি, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই ত্রি-সন্ধ্যায় উপাসনা করিবার অধিকার পান; অর্থাৎ তাঁহারা সাবিত্রী দীক্ষান্তে গায়ত্রী-মন্ত্রে উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই সাধনাবস্থায় প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং-সন্ধ্যার সমাহারভূত গায়ত্রী বা উক্ত ত্রি-শক্তির সমন্বয়ে চতুর্থ সন্ধ্যা বা 'নিশা-গায়ত্রী' * অর্থাৎ 'দক্ষিণামূর্ত্তি', দক্ষিণাচার সাধনার প্রধানা উপাস্যা বলিয়া সর্ব্ব তন্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ ইনি ব্রহ্মের পরমা প্রকৃতি আদ্যশক্তি বা প্রথমা মহাবিদ্যা। দেবীর 'ধ্যান-রহস্যে' ও সে কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণাচারী উচ্চ অবস্থার সাধক, অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা-বর্ণনায় তাই শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে "অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবাচরেৎ" ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানপুষ্ট ব্রাহ্মণগণ ত্রি-সন্ধ্যায় পৃথক পৃথকভাবে অন্তরে ব্রহ্মের ত্রি-শক্তির ধ্যান বা উপাসনা করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহাদের অন্তর ভগবানের সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় রূপ ত্রিবিধ শক্তিজ্ঞানে সদাই পূর্ণ, বাহিরে মহাযোগী শিবের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের নির্লিপ্ত অবস্থা, স্বীয় পরিচ্ছদাদির প্রতি ও কিছুমাত্র তাঁহাদের লক্ষ্য নাই, অথবা গলে মহাশঙ্খের মালা বা তাহার পরিবর্ত্তে হয় শঙ্খ অথবা স্ফটিক, না হয় রুদ্রাক্ষাদি কোন মালায় শোভিত কপালে বিভূতি চর্চ্চিত অন্তর বাহিরে যেন সাক্ষাৎ ভোলানাথ শঙ্কর শিবস্বরূপ আর সভায় বা সাধারণ লোক সমাজের উপদেশস্থলে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবভাব, অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ভক্তিপূর্ণ শ্রীভগবনের নাম গুণানুগান দ্বারা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা (mass education) প্রদান করিয়া থাকেন। সেই কারণ ব্রহ্মশক্তির সেই মধ্য পুরুষাকার সর্ব্বদেবপূজ্য জগৎ-পালক শ্রীভগবান বিষ্ণুরই প্রশংসা বা তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করেন। ইহাই সনাতন-

---

* 'গায়ত্রী-তত্ত্ব' এ বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সন্ধ্যারহস্য বা সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখ।

শাস্ত্রের উপদেশ। এই অবস্থায় ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়ার্থ অতীব কঠোর উপাসনা করেন বলিয়া, তাঁহারা নিবৃত্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণ, বা সর্ব্ববর্ণ-গুরুরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় এবং ফলাকাঙ্খায় নিবৃত্তি সাধনাই এই অবস্থার তাঁহাদের প্রধানতম লক্ষ্য। ইহাই সাধনার চতুর্থ অবস্থা বা ব্যক্তিগত ব্রাহ্মণত্ব। দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণবাচারের ন্যায় দক্ষিণাচারের কতক কতক অংশমাত্রকেই বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার অবস্থা-বিশেষের সুখ্যাতি, নিন্দা প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেকেই সমাজের এবং শাস্ত্রের যে কি, শোচনীয় বলক্ষয় করিতেছেন, তাহা আর বলিবার নহে। বাস্তবিক পক্ষে এই সকল আচারের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব আদৌ নাই। প্রথম, বেদাচারে—সনাতন ধর্ম্মে অচঞ্চল বিশ্বাস দৃঢ়ীকরণ; দ্বিতীয়, বৈষ্ণবাচারে—ধর্ম্ম বিশ্বাসসহ ভগবদ্ভক্তির মিলন সাধন; তৃতীয়, শৈবাচারে—সেই বিশ্বাস ও ভক্তি অন্তর্লক্ষের সহিত সম্পূর্ণ একীকরণ; চতুর্থ, দক্ষিণাচারে—পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিশ্বাস, ভক্তি ও অন্তর্লক্ষের সহিত সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপা শক্তিত্রয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিষয়ে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করণ। ইহাই পশু-ভাবের পর বীরভাবের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ পর্য্যন্ত প্রাথমিক আচার চতুষ্টয়ের স্থূল মর্ম্ম।

ইহার পর বীরভাবানুগত সাধনার মধ্য অবস্থা বা পূর্ব্বনিষ্ঠ আচার অনুসারে ইহা সাধনার পঞ্চম অবস্থা—সিদ্ধান্তাচার। 'সিদ্ধান্তাচার' এই শব্দ হইতেই সাধকের পঞ্চম অবস্থার উদ্দেশ্য নির্ণীত হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ প্রথম হইতে চতুর্থ পর্য্যন্ত সিদ্ধ আচারগুলির সমন্বয় দ্বারা সাধনায় অভিনব মার্গের স্থিরীকরণ। এ পর্য্যন্ত সাধক যে ভাবে সাধনপথে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন এক্ষণে সে ভাব

সিদ্ধান্তাচার।

হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নভাবে তিনি অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন! পূজাতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে, "পরস্পর বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হইলেই পরস্পরের মধ্যে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ হয়।" সিদ্ধান্তাচারে সাধক সেই চির প্রসিদ্ধ বিরুদ্ধমুখী ক্রিয়ার ফল স্বরূপ এক অভিনব বৈজ্ঞানিক অবস্থায় উপনীত হন।

অনন্তর সাধক বীরভাবে বীরাচার সাধনার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানে বা প্রথম হইতে সাধনার ষষ্ঠ অবস্থা,—'বামাচার' গ্রহণ করিয়া থাকেন। * ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত সাধক যে দক্ষিণ বা অনুকূল আচারের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এক্ষণে বাম অর্থাৎ প্রতিকূল আচার দ্বারা সেই চিরপুষ্ট প্রবৃত্তিরাশির নিবৃত্তি বা বিনাশ, অথবা তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান সহযোগে সাধনার নূতন ক্রিয়া আরম্ভ করিতে লাগিলেন এই সকল উচ্চ সাধনতত্ত্ব অনেকের পক্ষে কিঞ্চিৎ জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে, কারণ এ বিষয় ভাষায় ঠিক প্রকাশ করাও সম্ভবপর নহে। তাহা কেবল গুরুকৃপায় সাধনা যোগে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয় মাত্র। প্রবৃত্তিময় সংসারের সাধারণ মানব, প্রবৃত্তির কথা যেমন সহজে বুঝিতে পারিবেন নিবৃত্তির বিশেষবিধি ঠিক সেইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। সাধক এই বামাচার সাধনদ্বারা যে ক্রিয়া লাভ করেন, তাহাতে কুলশীল ভয়-লজ্জা আদি অষ্টপাশ মোচন করিতে যত্নবান হয়। অষ্টপাশেই জীব সংসারের মায়ায় আবদ্ধ থাকে, এবং অষ্টপাশ মুক্ত হইলেই জীব 'শিবত্ব' বা দেবত্ব লাভ করে। ভগবান বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ মানবীয় লীলায় তাই অষ্ট-পাশ বা অষ্ট-সখীর ভ্রান্ত-আবরণরূপ বস্ত্রগুলি উন্মোচন বা হরণ করিয়া জগৎকে কি অদ্ভুত শিক্ষাই প্রদান করিয়া গিয়াছেন! অষ্ট-পাশ বাস্তবিক অষ্ট-সখীর ন্যায় সততই জীবের চারিধারে

বামাচার।

* পূজা প্রদীপে বামাচার দেখ।

কত ভাবে কত ভঙ্গিতে কতই না মনোমুগ্ধকর ক্রিয়া করিতেছে! মোহ-পাশে জীবকে একেবারে অষ্ট অঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যতক্ষণ সে প্রবৃত্তি-গুলির বিনাশ বা নিবৃত্তি অর্থাৎ ভ্রান্তিরূপ বস্ত্রগুলি অপহৃত না হইবে, ততক্ষণ সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার অধিকারই পাইবেন না। কারণ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর মানবগণ পবিত্র সাত্ত্বিক-গুণান্বিত হইয়া, জাতি, বর্ণ, স্থান ও সাত্ত্বিকগুণ-বিরোধী যে কোন জীব এবং শবাদির প্রতি যে স্বাভাবিক ঘৃণাদি প্রদর্শন করিয়া এবং তাহা হইতে যেরূপ অযথা ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উচ্চ সাধনাবস্থার পক্ষে তাহা একেবারেই অনুমোদিত নহে।

বামাচার অতীব গুপ্তসাধন ক্রিয়া। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—"ইহা মাতৃজারবৎ গোপনীয় সাধনা। কখনই অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিবে না।" কারণ ইহা বীরভাব সাধনার অতি ভীষণ পরীক্ষার সঙ্কটময় সাধনা। ইহাতে কারণাদি স্থূল পঞ্চমকার ব্যবহারের বিধি আছে। সাধক পশুভাব সাধনায় ব্রহ্মচর্য্যাদি পরিপুষ্ট হইয়া উক্ত জীবমোহকর পঞ্চমকারাদি সামগ্রী সমূহ সম্মুখে রাখিয়া নিশার অতি নিস্তব্ধ ও নিভৃত ক্ষণে নগ্ননারী বা নিজ সহধর্ম্মিণী শক্তিতে নির্ব্বিকার চিত্ত হইয়া জগন্মাতা জ্ঞানে পূজা করিতে বসিবে। ইহাই বামমার্গের প্রকৃত চক্রানুষ্ঠান। ইহাতে সাধকের চিত্তের, প্রাণের বা ইন্দ্রিয়াদির কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হয় কিনা তাহারই পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি এই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে তবে বারবার তাহার অনুষ্ঠান সহযোগে আত্মপুষ্টি লাভ করিতে হইবে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। নতুবা সাধকের ইহ-পরকাল সমস্তই বিনষ্ট হইবে। অধুনা হেয় বা বিষয়ভোগীদিগের দ্বারা এই বামাচার সাধনার অতি বীভৎস প্রচার

হইয়াই সমাজ ও সাধনমার্গ অতীব ঘৃণ্য ও কলুষিত হইয়াছে। শ্রীগুরু-মণ্ডলীর কৃপায় পুনরায় ইহার সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছে।

স্বভাবলব্ধ শিক্ষা হইতে উক্ত ঘৃণা ও ভয় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কঠিন

অঘোরাচার। কঠিন প্রবৃত্তিগুলির বিনাশের জন্য বামাচারের পরই সাধক দিব্যভাবের অন্তর্গত প্রথম সাধনা বা সাধারণতঃ সাধনার সপ্তমস্তর—'অঘোরাচার' গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাও সেই মূল ও বিরাট 'বেদাচারের' অঙ্গ হইতে এক্ষণে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। 'অঘোরাচার' যে, সেই সনাতন-ধর্ম্মের বহিরাবরণরূপ 'বেদাচারের' অন্তরস্থিত সপ্তম কোষ, পশু ও বীরভাবের সাধন পরিপুষ্টির ফলরূপ কঠোর সাধনা তাহা আর কেহই ধারণা করিতেও পারেন না। শিক্ষাদীক্ষার অভাবে, শৈব ও শাক্তের ন্যায় ইহাও এক সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্ম-রূপে 'অঘোরপন্থী'দিগের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। অনেক ভ্রান্ত সাধক যথার্থ সিদ্ধ-গুরুর নিকট শিক্ষা না পাইয়া বাহ্যতঃ অঘোরাচারী হইয়া কেবল হিংস্র পশুর ন্যায় শবমাংস ভোজীই হইয়াছে! যাহা হউক এই অঘোরাচার হইতে ক্রমে মহাচীনাচারের সূত্রপাত হইয়া থাকে। হায় হায়! সেই ভাব জ্ঞানহীন কেবল অনাচার বৃত্তিই কি সাধনার পবিত্র সপ্তম স্তর অঘোরাচার? 'অঘোর' শব্দের অর্থ কি? ন+ঘোর=অঘোর; অর্থাৎ যাহাতে আর ঘোর নাই, সেই অঘোর। প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশে সংসারের মোহময় সকল ঘোর যাঁহার ঘুচিয়াছে, তিনিই হইলেন প্রকৃত 'অঘোরাচারী'। যখন ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, সন্দেহ, মান, অপমান জাতি ও শীলরূপ বন্ধনের বিনাশ-সাধন-দ্বারা সাধক মোহ ঘোরশূন্য হন, বা সাক্ষাৎ দেবভাবাপন্ন হন ও শবসাধনা বা শব-বিশ্লেষণাদি করিয়া স্থূল যোগভূমি গুলির সন্দর্শন অনুভব সহ মানসিক প্রবৃত্তির স্থিরতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ সমর্থ হন, তখনই তাহার 'অঘোরাচারের' সমাপ্তি হইয়াছে জানিতে হইবে।

অনন্তর সাধকের দিব্য ভাবানুগত মধ্য সাধনা 'যোগাচার' বা প্রথম

যোগাচার।

হইতে সাধকের অষ্টম অবস্থায় যথার্থ যোগ সাধনা গ্রহণ করিবার অধিকার হয়। ইহা দ্বারাই সাধক সাধনার সমুচ্চ শিখরে উঠিবার অভিনব পথ আবিষ্কার করিতে পারেন। এই অবস্থায় মহাযোগী শিবের ন্যায় শ্মশানবাসী না হইতে পারিলে, যোগের প্রকৃত রহস্য যে কি, তাহা সাধকের ঠিক বোধগম্য হইতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত শবচ্ছেদনাদি কার্য্য, শ্মশানবাস ও শবাসনে বসিয়া নিশা-সন্ধ্যার উপলব্ধির জন্য শ্মশান-সাধনাই তাই এই অবস্থায় একমাত্র অবলম্বন। দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ পথে কিরূপে কোন্ বায়ু কোন স্থানে রক্ষা ও পরিচালনার দ্বারা মানসিক বৃত্তিসমূহের স্থিরতা ও সহজে অন্তর্লক্ষ্য সম্পাদিত হইতে পারে, ভূগোল-শিক্ষায় মানচিত্র দর্শনের ন্যায় সাধক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বসকলও এই সময়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ইহাও সেই মূল 'বেদাচারের' অতি অন্তরের স্তর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচারের ন্যায় অতিশয় রহস্যপূর্ণ গুরুকৃপা ব্যতীত বিন্দুমাত্রও কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। সাধক, যোগদীক্ষা-অভিষেক সময়ে যথার্থ 'যোগাচার' গ্রহণ করিবার পূর্ণ অধিকারী হন।

পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট 'অষ্টাঙ্গ যোগ' যথাবিধি সমাধা করিয়া যোগপুষ্ট হইলে, শেষ বা সাধনার নবম আচার অর্থাৎ 'কৌলাচার' গ্রহণ করিতে পারেন। এই কৌলাচার সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। এই অবস্থায়

জ্ঞানাচার কৌলাচার বা সন্ন্যাসাচার।

সাধকের প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যাহার জন্য মানব, সাধনার এত পথ পর্য্যটন করিল, এই স্থানেই তাহার প্রায় পরিসমাপ্তি ; আবার এই সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের নির্ব্বিকল্প-সমাধির ভাব উপস্থিত হয়। সাধক এই সময়ে জীবত্ব-মুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। সেই 'শিবত্ব' আবার যখন উৎকট সাধনার ফলে 'শবত্ব' বা নিষ্ক্রিয় ভাব লাভ করে, তখনই পরমা প্রকৃতি মহাশক্তি

মা আমার, সাধকের হৃদয়-শ্মশানবাসিনী হইয়া থাকেন। সেই অনির্ব্বচনীয় সাধন সময়ে, সাধক মহাপূর্ণ দীক্ষায় ঋণত্রয়ের মুক্তির ছলে ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের যথাবিধি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে নিজের শ্রাদ্ধপিণ্ড নিজেই সমাধা করিয়া 'বিরজা-যজ্ঞে' পূর্ব্ব সংস্কারলব্ধ নাম, রূপ, ভাব, বেশ ত্যাগ ও 'শিখা-সূত্র' পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া কোনও নিভৃত স্থানে বসিয়া অবিরত সাধনায় তন্ময়তা বা সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। এই জ্ঞানাচার 'কৌলাচার' সন্ন্যাস বা অবধূতাচার, আর্য্যদিগের সেই মূল প্রথম সাধনা বা বিরাট 'বৈদিকাচারের' অন্তস্বরূপ এবং ঊর্দ্ধাম্নায় বা তন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ ক্রিয়ানুষ্ঠান।

এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, জ্ঞানতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট 'কৌলাচার' ও 'বৈদিকাচার' বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ বেদের তথা বেদান্ত তত্ত্ব সনাতন-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান এবং তাহার অন্তর্নিহিত একমেবাদ্বিতীয়ম্' সাধনাই ঊর্দ্ধাম্নায়-নির্দ্দিষ্ট 'মহাকৌল-সাধনা' ইহাই সাধকের হংস ও পরমহংস অবস্থা। *

কৌলিন্য-প্রথা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

মহারাজ বল্লালসেন এই কৌলাচারের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হইতেই ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের 'কৌলিন্য-প্রথা' বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই বিশাল নবসংখ্যক আচারের পরিবর্ত্তে 'আচারোবিনয়ঃ ইত্যাদি' সংক্ষিপ্ত-গুণমাত্র তখন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

আর্য্যগণ জন্মান্তর মানেন, যোগবলে ত্রিকালদর্শী হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই কারণ তাঁহারা বর্ণাশ্রমের এতাধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে. জীব দৈববলে শক্তি-সম্পন্ন হইলেও, কর্ম্মফলে জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিয়া আসিতেছে। যাহার যেমন কর্ম্মফল, সে তেমনি উপাদান সহ উপযুক্ত ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্বকৃত ফলভোগী হয়। মানব, এক দিনে বা এক জন্মেই সেই কর্ম্মরাশির

---

* "পূজা-প্রদীপে"—উপাস্যভেদ দেখ।

লয়সাধন দ্বারা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না! কত জন্মের-উৎকট সাধনা দ্বারা যে তাহা সম্পন্ন হয়. সে কথা সহজে বলিবার উপায় নাই।

যখন আর্য্যের চাতুর্ব্বর্ণ-বিধি দৃঢ়তর ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে স্ব স্ব আচার বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইত, তখন সাধনার ক্রমোন্নত-বিধি স্তরে স্তরে সকলেই প্রতিপালন করিতেন। তখন মানব কর্ম্মফলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মক্ষয় করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শিথিল হওয়ায়. কেহই আর তাহা যথাবিধি পালন করেন না। অধুনা উচ্চ নীচাচারী, নীচ উচ্চাচারী, হইয়া আচারশঙ্কর বা আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাই জাতি বা বর্ণানুগত আচার এখন আর ব্যক্তি মাত্রেই শুদ্ধভাবে পরিলক্ষিত হয় না; ইহাই কলির প্রকৃত ভাব! সেই কারণ, জীবের সতত মঙ্গলময় মুক্তিদাতা দেবাদিদেব শিব, তন্ত্রশাস্ত্রে পূর্ব্বাহ্নেই সাধকমাত্রের উপযোগী ব্যক্তিগত আচার-তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

যাহা হউক জীব, অনুলোম সাধনা-সহযোগে অতি নিম্নস্তর হইতে কর্ম্ম বা প্রবৃত্তিপুষ্ট হইয়া ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব বা অনুকূল আচার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেই, সময়ে উপযুক্ত গুরূপদেশ অনুসারে পুনরায় প্রতিলোম সাধনাযোগে প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের বিনাশ করিতে আরম্ভ করেন। তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণে যাহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অনুলোমগতিতে যে আচার 'ব্রাহ্মণত্ব' পর্য্যন্ত প্রসারিত করে. পুনরায় প্রতিলোমগতিতে অর্থাৎ সর্ব্বগুণাশ্রিত তমোগুণে তাহাই শেষ আচার বা সাধনার প্রান্ত-বিন্দুর নিরাচার অথবা পূর্ণ কৌলাচাররূপে বিলীন হইয়া যায়, ইহাই আর্য্যের তন্ত্রোক্ত সাধনার অন্তিম লক্ষ্যস্থল। সুতরাং এই আচার সমূহের কোনটীই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, বা কোনটীই সাধকের কোনও রূপে পরিত্যাজ্য নহে, সাধক মাত্রেরই অবস্থা বিশেষে সেই 'বেদাচার' হইতে 'কৌলাচার' পর্য্যন্ত প্রত্যেক আচারই এক

জন্মে হউক বা জন্মজন্মান্তরে হউক ভোগ করিতেই হইবে। সেই কারণেই কেহ 'বৈষ্ণব', কেহ 'শৈব', কেহ বা 'সৌর' কিম্বা গাণপত্য * ভাবের সাধনায় আনন্দ অনুভব করেন, আবার অনেকস্থলে উপযুক্ত গুরুর অভাবে বা গুরুনামধারী সাধনানভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষার দোষেই একে অন্যের সাধনামার্গের প্রতি অযথা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নতুবা সাধনা-পথে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ জন্মিতে পারে না। সমগ্র সনাতন সাধনা প্রথা সেই কারণ অতি উদার ও পূর্ব্বোক্ত নবধা-আচার-সমন্বিত করিয়াই সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য সেই যোগবক্তা পঞ্চবক্ত্র ও ত্রিকালদর্শী ত্রিনেত্র দেবাদিদেব সদাশিব নিগমাগমে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ওঁ সদাশিব ওঁ॥

---

* পূজা-প্রদীপ—উপাস্যভেদ দেখ।

চতুর্থোল্লাস।

আগমে পূজা-তত্ত্ব।

ঊর্দ্ধাম্নায় বা স্থ-তন্ত্রশাস্ত্রে পূজার ত্রিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভেদে, সাধকের অবস্থা বা অধিকার অনুসারে ক্রমোন্নত ভাবে পূজার তিনটী ব্যবস্থা আছে। জীব যেমন স্তরে স্তরে উন্নতি লাভ করিবে, তাহাদের অনুকূল পূজা বা সাধনার ব্যবস্থাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই চিরকাল স্তরে স্তরে গঠিত রহিয়াছে। সাধনাকাঙ্ক্ষী যে কেহ যথাশাস্ত্র দীক্ষিত হইলে, পূজা করিবার অধিকারী হন। সাধারণ মানব বৎসরান্তে বাহ্য শৌচাদি সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে নৈমিত্তিক মহাপূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু-সোপানে অধিষ্ঠিত সাধকমাত্রেই নিত্য সেই অনির্ব্বচনীয়া মহাশক্তিময়ীর পূজা করিয়া থাকেন। তখন তাহাদের পুষ্প-চন্দনাদি বাহ্য অনুষ্ঠানেরও আবশ্যক হয় না—মানসপূজাই সে সময় তাঁহাদের প্রশস্ত ব্যবস্থা।

পূজাত্রয়।

যে সকল পূজা নিম্নস্তরের জন্য নির্দ্দিষ্ট; তাহাই তামসিক পূজা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। রাজসিক পূজা, ইহার পরবর্ত্তী মধ্যস্তর নির্দ্দিষ্ট মধ্যম পূজা; এবং সাত্ত্বিক পূজা, উচ্চস্তর নির্দ্দিষ্ট উত্তম পূজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে একটী অপূর্ব্ব কথা বলিবার আছে, অর্থাৎ এই উত্তম এবং অধম ইহাদের প্রান্ত গুণদ্বয়ের সমন্বয় বা সংযোগ সাধনাই সাধকের উচ্চতম অবস্থা। সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাবে সাধারণের চক্ষে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ বোধ হইলেও, সাধকের নিকট তাহা একই প্রকার বলিয়া উপলব্ধি হয়। যেমন বালক ও বৃদ্ধ, প্রাতঃকাল ও

সায়ংকাল; সময়ের বিভিন্ন অবস্থা ক্রম, বা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির রূপ পৃথক হইলেও দেখিতে অনেকাংশ প্রায় একরূপ, উভয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান আছে; সেইরূপ সাধনামার্গে সাত্ত্বিক ও তামসিক পূজোপাসনা সাধনার সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখী অবস্থা হইলেও বৃত্তাকারভাবে দেখিলে এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের ঠিক সম্মুখীন হইয়া থাকে। আবার বাহ্য-চক্ষে ইহা দেখিতে কতকটা একপ্রকার হইলেও, ইহাদের গুণে বিষম পার্থক্য আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট হইলেই, যে কোনও শক্তিদ্বয়ের সহসা সংযোগ বা মিলনদ্বারা কোনও এক অভিনব ক্রিয়ার উন্মেষ হইয়া থাকে। গুরু-শিষ্য, বক্তা-শ্রোতা, ঘাত-প্রতিঘাত, খাদ্য-খাদক শত্রু-মিত্র, তড়িৎ শক্তিতে 'নেগেটিভ-পজেটিভ্' প্রাণায়াম যোগ-সাধনায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস আদি পরস্পর বিপরীত শক্তির মিলন না হইলে যেমন তাহাদের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ সাত্ত্বিক ও তামসিক অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত না হইতে, সাধন-মার্গের ক্রিয়া আরম্ভই হয় না। এই হেতু মহাশক্তির রূপ-কল্পনাতে সাধক যেন সিদ্ধকাম! তিনি কেবলই দয়াময়, মায়াময়, কৃপাময়, প্রেমময়, স্নেহ বা করুণাময়, একথা বলিলে তাঁহার রূপ-কল্পনায় যেন সঙ্কোচ বা খণ্ডিত ভাব আসিয়া পড়ে। তাই এক দিকে যেমন দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, প্রেম ও আনন্দের মনোহারিণী পূর্ণ প্রতিকৃতি বা চিত্র, অন্য দিকে তেমনই ভীম, উগ্র, প্রচণ্ড ও কঠোর, শাসন এবং শিক্ষার অত্যুজ্জ্বল জলন্ত আদর্শ। একাধারে কৃপা ও নিষ্ঠুরতার অদ্ভুত সম্মিলন। মুখে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, কিন্তু চক্ষে তাড়নার তীব্র স্ফুলিঙ্গ—অথচ মা আমার সাক্ষাৎ আনন্দময়ী। * তাই সাধন পথেও কেবল সাত্ত্বিকাচারী হইলেও মুক্তি নাই—সাত্ত্বিকের পরপারে তামসিকের অন্তরমধ্যে কি শক্তি আছে, তাহাও সাধকের সাধনার বিষয়!

* 'পূজাপ্রদীপে'—'কালীকরালবদনা' দেখ।

পবিত্র চন্দনসংযুক্ত তুলসী ও বিল্বপত্রে, মনোরম সৌরভ বিশিষ্ট কুসুমস্তবকে তাঁহার যে ভাব যে প্রীতি, নরকসদৃশ ঘৃণ্য ও পূতিগন্ধময় বিষ্ঠাজাত ক্রিমিসমূহের সহিতও তাঁহার সেই ভাব সেই প্রীতি। উচ্চসাধনায় এইরূপ অপূর্ব্ব মিলন-সিদ্ধিই সাধকের প্রধানতম লক্ষ্য। সেই কারণ পূর্ব্বোক্ত 'আচারতত্ত্বে' দক্ষিণাচারের পর হইতেই বামাচারের বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাধকের হৃদয়-সুলভ বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি বা তাহার একীকরণ সম্পাদনই পূজাতত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান রহস্য। 'জ্ঞানপ্রদীপে' মন্ত্রযোগ অংশের ষোড়শ অঙ্গ এবং 'পূজাপ্রদীপে' পূজার বিজ্ঞান ও রহস্য সমূহ দেখ।

একক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত পূজাত্রয়ের মূলীভূত উদ্দেশ্য ও প্রণালী কি? মনের একাগ্রতা আনয়ন করাই এইরূপ পূজা বা সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু যতক্ষণ চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ কিছুতেই কিছু হইবে না, ইহা অবধারিত সত্য। সুতরাং পূজা ও সাধনার ক্রিয়া ফলে চিত্তের সেই বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে হইবে। 'পূজা প্রদীপে' সাধকের সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মকৃত্যাদিও দেখ।

যোগশাস্ত্রের আবিষ্কার।

বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিসমূহ সাধারণতঃ যে পরিমাণ উত্তাপ প্রদায়ক, কোন বিন্দুজাকার বা আতসীকাচের সাহায্যে সেই বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি-গুলিকে কেন্দ্রীভূত করিলে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এমন কি অনতিবিলম্বে অগ্ন্যুৎপন্নও হয়, এবং সেই অগ্নিদ্বারা অনায়াসে বহুবিধ সামগ্রী দগ্ধ করা তখন অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। সাধুমুখে কথিত আছে—"ভগবান পতঞ্জলি সূর্য্যকিরণ ও সূর্য্যকান্তমণি বা বিন্দুজাকার স্ফটিকখণ্ডের এবম্বিধ ধর্ম্ম দেখিয়াই যোগসূত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।" সূর্য্যরশ্মির অন্তর্নিহিত ঐ দাহিকাশক্তি সতত বিদ্যমান থাকিলেও, বিক্ষিপ্তভাবে থাকিবার জন্য যে কোনও দ্রব্যই

কেবল সামান্য উষ্ণ মাত্রই হয়, কখনও কোন দ্রব্য দগ্ধ হয় না—আমাদিগের মন বা চিত্ত, মানসিক নানা বৃত্তি, কামাদি, বিবিধ বিষয়ের সহিত বিক্ষিপ্তভাবে থাকিবার কারণ, মনচ্ছক্তির সেইরূপ সম্যক বিকাশ হইতে পারে না। বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মিকে একত্রীভূত বা কেন্দ্রীভূত করিবার উপযোগী নুব্জাকার উক্ত আতসীকাচের ন্যায়, মনচ্ছক্তিরও ঐরূপ বিক্ষিপ্ত ভাব নিরোধ বা একীভূত করিবার পক্ষে যোগসাধনই একমাত্র অবলম্বনীয়। তাই মহামতি পতঞ্জলি "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই মহাবাক্য প্রথমেই মূল সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিলেন। অনন্তর ক্রমে 'চিত্ত কি', 'তন্নিরোধ করিবার উপায় কি', সেই সকল বিষয় আলোচনা ও আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। আবিষ্কারসিদ্ধ সেই সকল অনুষ্ঠানগুলিই ঋষিগণ কর্তৃক আমাদের পূজা ও অর্চ্চনার মধ্যে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে অতি সুন্দর ভাবে কেমন সন্নিবেশিত হইয়াছে, পূজাতত্ত্ব সেই সকল কথাই কতক কতক বলিব।

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে :—

যোগ কাহাকে বলে। "অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণো হি যথা শাস্ত্রানি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥"

ক-কারাদি বর্ণমালা অভ্যাস দ্বারা যেরূপ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায়, সেইরূপ ঐ ক্রমোন্নত পূজা বা যোগাভ্যাস দ্বারাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়।

প্রকৃত পূজার সিদ্ধাবস্থাই যোগ। যোগ আর কিছুই নহে একের সহিত অন্যের মিলনকার্য্যই যোগ। তাই 'দেবী ভাগবতে' দেবী, হিমালয়কে বলিতেছেন :—

"ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ॥"

স্বর্গে, পৃথিবীতে বা রসাতলে কোন স্থানেই যোগ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, যোগ-বিশারদ যোগিগণের জীবনীশক্তিসহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনই যোগ বলিয়া জানিবে। 'হঠযোগপ্রদীপিকা', 'ঘেরণ্ড সংহিতা,' 'যোগবীজ' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' আদি সমস্ত যোগশাস্ত্রেই এই কথা একবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ, ব্রহ্মযোগ, বিবেকযোগ, বিভূতিযোগ, প্রকৃতিপুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, মোক্ষযোগ, ক্রিয়াযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি অসংখ্য যোগের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।* এই সকলের প্রত্যেকটীই ঐ জীবনী-শক্তি বা কুণ্ডলিনীশক্তিসহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র। বাস্তবিক যোগ বহুবিধ নহে—যোগের মূলীভূত উদ্দেশ্যগুলি সমস্তই এক। যোগসাধনার জন্য ক্রমে ক্রমে যে সমুদয় প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় স্থান বিশেষে তাহারই উপদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াগাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে সাধনোদ্দেশে যোগের যে ত্রিবিধ প্রধান উপায় সাধক-সাধারণে প্রচলিত আছে, সেই দুই একটি কথা বলিতেছি।

ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ।

গুণবির্ব্বিশেষে পূজার্চ্চনীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব ভেদে যেমন ত্রিবিধ পূজার ব্যবস্থা আছে, যোগসাধনায় ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান নির্ব্বিশেষে সেইরূপ ত্রিবিধ যোগের বিধি নিয়মিত আছে।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়াপ্রোক্তং নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া !
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥"

"ভাগবত"।

ভগবান কহিতেছেন :—আমি মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম ও

* "জ্ঞানপ্রদীপ" প্রথম ভাগে যোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে।

ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলিতেছি, সাধকগণের মধ্যে যাহার যেমন অধিকার, প্রথমে তিনি সেইরূপই পূজার বা যোগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এক শ্রেণীর সাধক বলেন, 'ভক্তিযোগই যোগত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ!' বাস্তবিক ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই বলিলেই হয়; কিন্তু তাহা হইলে কি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অন্য দ্বিবিধ যোগ কেবল কর্ম্মভোগ মাত্র? এইরূপ ক্রিয়াযোগী ও জ্ঞানযোগী স্ব স্ব অবলম্বিত যোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। এ প্রশ্নের উত্তরে উক্ত সাধকমণ্ডলী বলিয়া থাকেন, ভক্তিই সাধনার প্রাণ ও প্রথম অবলম্বন বটে, কিন্তু অন্য সাধনাদ্বয়ও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ভক্তির মূলে অন্য আর একটী অমূল্য সামগ্রী আছে, তাহার নাম 'বিশ্বাস'। সর্ব্বপ্রথম সেই সন্দেহ-বিমুক্ত বিশ্বাসই ভক্তির আধার স্বরূপ হয়। সেই বিশ্বাস দ্বারা পুষ্ট হইলে, সাধক তর্কশূন্য ভক্তি লাভ করিতে পারে। তৎপরে কোন বস্তুতে বা তাঁহার শক্তিবিশেষে ভক্তিমান হইলে, ক্রমে তাহার ক্রিয়া করিবার অভিলাষ আইসে, অনন্তর ক্রিয়াবান সাধক সাধনার উচ্চ অবস্থায় জ্ঞানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাই যথাক্রমে ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান যোগ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাধকের অধিকার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন যোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যখন পৃথক-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন যোগাবলম্বন করিয়া সাধক সাধনাকার্য্যে নিয়োজিত থাকেন তখন তিনি ভক্তি-যোগীই হউন বা ক্রিয়াযোগীই হউন অথবা জ্ঞান-যোগীই হউন, সেই সাধক নিম্নস্তরের সাধক বলিয়া বিবেচিত হন। যাঁহাদের ভগবদ্‌তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ষড়দর্শনের গভীরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই, এবং শারীরিক ক্রিয়াবলীর অনুষ্ঠান করিবারও সেরূপ সামর্থ নাই, কিন্তু চিত্ত-সংযম করিবার যথেষ্ট শক্তি আছে ও হৃদয় বেশ ভাবপ্রবণ, তাঁহারাই 'ভক্তিযোগের' পক্ষপাতি। আবার যাঁহাদের চিত্ত সংযমের শক্তি অল্প ও মনে তেমন ভাব প্রাবল্য নাই, এবং দার্শনিক তত্ত্বাবলিরও মর্ম্ম

উদ্‌ঘাটন করা তাঁহাদের সহজসাধ্য নহে, পরন্তু দৈহিক ক্রিয়ানুষ্ঠান বা লস্থূ কর্ম্ম করিতে অত্যন্ত সুপারগ, তাঁহারাই 'ক্রিয়া-যোগের' বিশেষ পক্ষপাতী। সেইরূপ যে সকল সাধক শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সংযম করিতে সে প্রকার সুপটু নহেন, অন্ধ বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাবও হৃদয়ে তেমন নাই কিন্তু ষড়দর্শনের অতি গভীর তত্ত্ব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সুনিপুণ তাঁহারাই জ্ঞানযোগের পক্ষপাতী। এইরূপ ত্রিবিধ যোগীই 'যোগী' বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু নিম্নস্তরের। পূর্ব্বোক্ত সাধনার আচার অবলম্বনের ন্যায় যোগাবলম্বনও যেন সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট হইয়াছে। বিরাট সনাতন সাধনতত্ত্ব তাহারই একাঙ্গভূত বলিয়া শাস্ত্রে ও গুরুমুখে বর্ণিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ সাধনার ক্রমবিধানে ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই যোগত্রয়ের একত্র সমাহারেই পূর্ণযোগী বলিয়া উক্ত আছে। সুতরাং পূজার্চ্চনার সহিত চিত্তাদি সংযম আত্মোন্নতি ও ভগবদ্-জ্ঞানলাভের জন্য ঐ ত্রিবিধ যোগই অবলম্বন করা সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক ভেদে জ্ঞানলাভের দুইটী উপায়ে পূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে। বাসনা ও সঙ্কল্পপূর্ব্বক গৃহিগণ যে সমুদয় পূজা করিয়া থাকেন, তাহার নাম প্রবর্ত্তক, তাহা দ্বারা পূণ্য সঞ্চয় ও পুনর্জ্জন্মসহ ফললাভ হইয়া থাকে; এবং বাসনা ও সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র, আমায় করিতে হইবে—ইহাই আমার কর্ত্তব্য—এইরূপ জ্ঞানে যাহা কিছু করা যায়—যাহার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না—নিষ্কাম বা একমাত্র ভগবদ্ কামনা ব্যতীত সাংসারিক অন্য যে কোনও কামনা পরিশূন্য হইয়া যোগিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাই নিবর্ত্তক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। ইহা দ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। এই কারণ ভবভীরু ব্যক্তিগণ নিষ্কাম বা নিবর্ত্তক পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্তি, ক্রিয়া এবং জ্ঞানযোগ সমন্বিত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও

তামসিক পূজার দুইটী প্রধান বিভাগ রহিয়াছে; সাধক নিজ অভিলাষ অনুসারেই সেই প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অষ্টাঙ্গ-বিশিষ্ট যোগ।

যাহাই হউক সকল প্রকার পূজাতেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা সাধক মাত্রের প্রধানতম লক্ষ্য। পূজাকালে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট যে সকল নিয়ম আছে, সে সমস্তই চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ অনুকূল। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই আটটী পূজা বা যোগের প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এই কারণ অষ্টাঙ্গযোগ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।*

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তথৈবচ।
প্রাণায়ামস্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা॥
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে॥"

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

ইহা ব্যতীত গোরক্ষসংহিতা, দত্তাত্রেয়সংহিতা ও সমস্ত তন্ত্রাদি নানাবিধ যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিধ, ষড়্‌বিধ, সপ্তবিধ, অষ্টবিধ, নববিধ, দশবিধ ও ষোড়শবিধ যোগাঙ্গ বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু সেগুলি মোটের উপর ঐ অষ্টাঙ্গ যোগেরই অন্তর্গত। যাহা হউক এইগুলি যথাবিধি অবলম্বন করিতে পারিলেই চিত্ত আপনা হইতে সংযত হইয়া থাকে।

যোগের অষ্টাঙ্গের ন্যায় যমেরও আবার দশটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। তাহা এই—

যোগের প্রথমাঙ্গ 'যম'।

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্ম্মিতাহারঃ শৌচন্তেতে যমাদশ॥

* যোগ সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ। মন্ত্রযোগ প্রত্যেক সাধকের সর্ব্বপ্রথম অবলম্বনীয়। মন্ত্রযোগ ষোড়শ অঙ্গ বিশিষ্ট। 'জ্ঞানপ্রদীপ' ১ম ভাগ দেখ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ এই দশটীই 'যম' বলিয়া কীর্ত্তিত। (১) অহিংসা—কোন জীবকে কেবল মাত্র বধ করাকেই যে হিংসা বলে তাহা নহে, পরন্তু কায় দ্বারা হউক, মন দ্বারা হউক অথবা বাক্য দ্বারা হউক কোনও জীবকে কোন প্রকারে ক্লেশ দেওয়াকেই হিংসা বলা যায়। আবার শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইলে, কোন জীবের ক্লেশদায়ক কর্ম্ম বা হিংসাও অহিংসা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (২) সত্য—সাধারণের হিতকর অভ্রান্ত উক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবে। (৩) কায়মনোবাক্যে অন্যের দ্রব্যে স্পৃহাশূন্য হওয়াতে বা লোভ না করাকে শাস্ত্রে অস্তেয় বলে। (৪) দেহক্ষয় ও স্মৃতিধ্বংসকর মৈথুন পরিহার বা বীর্য্য ধারণকেই যোগিগণ ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু যথাবিধানে কেবল ঋতুরক্ষার্থ নিজ ভার্য্যা-গমনকে গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া শাস্ত্রে বিধি আছে। আহার বিহার আদি সর্ব্ববিধ দৈহিক সংযম রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত। গুরুজনের সেবাও ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। (৫) সর্ব্বজীবে সমুচিত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষাকে দয়া বলা যায়। (৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে সমতার ভাবকে আর্জ্জব বলে। (৭) প্রিয় অপ্রিয় সকল বিষয়ে তুল্যভাবকে অর্থাৎ অপ্রিয় ভাবে বিরক্ত না হইয়া উপেক্ষা করাকে ক্ষমা বলিয়া থাকে। (৮) শোক ও তাপাদি কোন কষ্ট হইলে, মনের ধৈর্য্য অবলম্বন করাই ধৃতি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। (৯) অধিক নহে এরূপ পরিমিত আহার মিতাহার বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ঋষিগণ অষ্টগ্রাস, বনবাসী ষোড়শ গ্রাস, গৃহীরা দ্বাত্রিংশৎ গ্রাস এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি ইষ্ট গুরুতে আত্মসমর্পন করিয়া ভগবদ্ ইচ্ছানুরূপ যাহা ভোজন করেন, তাহাকেই মিতাহার বলে। (১০) শৌচ দুই প্রকার,—বাহ্য-শৌচ স্নানাদি দ্বারা দেহ পরিষ্কৃত হইলে বাহ্য-শৌচ এবং ভগবদ্ চিন্তাদি দ্বারা মনঃ শুদ্ধিকে অন্তর-শৌচ বলে। দেহ মন অপবিত্র বা পবিত্র যেমনই

থাকুক না কেন সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান শ্রীইষ্ট গুরুকে স্মরণ করিলেই বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্বাবয়ব শুচি বা শুদ্ধ হইয়া থাকে। পূজা করিবার পূর্ব্বে সাধক এই সকল চিত্তস্থিরতা সম্পাদক বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে।

'পুরশ্চরণ প্রদীপে' উচ্চাধিকারীর ষড়ঙ্গ 'যমের' বিষয় বলা হইয়াছে। ইহার পর নিয়মের কথা বলা হইয়াছে। যমের ন্যায় নিয়মও দশবিধ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।*

যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ 'নিয়ম।'

"তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণশ্চৈব হ্রীমতিশ্চ জপোহুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র বিশারদৈঃ॥"

তন্ত্রসার॥

অর্থাৎ তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ এবং হোম বা যজ্ঞ এই সমস্তকে নিয়ম কহে। (১) চান্দ্রায়নাদি ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শোষণের নাম তপঃ। (২) আত্মরক্ষা ও সংসার প্রতি-পালন কল্পে যদৃচ্ছা লাভের দ্বারা লোকের মন অবিচলিত থাকিলে সন্তোষ বলা যায়। (৩) ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ইষ্টগুরুতে দৃঢ় বিশ্বাসকে আস্তিক্য বলা যায়। (৪) ন্যায়ার্জ্জিত ধন যাহা শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে স্বেচ্ছায় প্রার্থীকে প্রদান করা হয়, তাহাই দান বলিয়া কথিত আছে। (৫) প্রসন্ন চিত্তে বিষয়াসক্তি রহিত হইয়া, মিথ্যা ভাষণাদি বর্জ্জিত হইয়া এবং হিংসাদি কার্য্য-বিরত হইয়া গণেশাদি সর্ব্বদেবতার পূজাকে ঈশ্বর-পূজা বলা যায়। (৬) বেদ, বেদান্ত, দর্শন, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণকে সিদ্ধান্ত-শ্রবণ বলিয়া থাকে।

---

* গৃহস্থসাধকদিগের জন্য যম ও নিয়ম সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ এই যে—

"এতে যমা স নিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চপ্রকীর্ত্তিতা।"

"যম ও নিয়ম পাঁচ পাঁচটী করিয়া কথিত"। "গুরু-প্রদীপে" যোগদীক্ষাভিষেক দেখ।

(৭) সনাতন শাস্ত্র বিরুদ্ধ বা যে কোন গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠানে কিংবা নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ হইবে বলিয়া গুরুসন্নিধানেও মনে যে লজ্জার উদয় হয়, তাহাই হ্রী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। (৮) বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানের নাম মতি। (৯) বিধিপূর্ব্বক গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রাদি অভ্যাসের নাম জপ। (১০) গুরূপদিষ্ট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মাস্বরূপ অগ্নিমধ্যে আহুতি প্রদানকে হোম কহে। এ সমুদয়ই মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা সাধনে বিশেষ অনুকূল। যম ও নিয়ম দ্বারা সাধক ব্রহ্মচর্য্যরূপ বীর্য্যধারণ, অন্তরে দৃঢ়ভাবে সত্যপ্রতিষ্ঠা ও নিত্য নিয়মিত সময়ে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইবে। ইহাই সাধন রাজ্যে প্রবেশ লাভের প্রথম সোপান। ইহা না হইলে সাধকের যোগযাগ সবই পণ্ডশ্রম হইবে; আত্ম-প্রবঞ্চনা বাড়িবে, কোন কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। সাধক প্রথমতঃ এই ভাবে কার্য্য করিলে কতকটা স্থির ও দৃঢ়চিত্ত হইবে; তাহার পর বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসনেরও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

যোগের তৃতীয়াঙ্গ 'আসন'।

শাস্ত্রে উক্ত আছে, নিরাসনে পূজা করিতে নাই—করিলে পূজা নিষ্ফল হয়; অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা হয় না। সুতরাং পূজা-কালে আসনের সহিত পূজকের চিত্তের সর্ব্বপ্রধান সম্বন্ধ বিদ্যমান। আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ ভূ-বিজ্ঞানের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতের দ্বারা যাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই কতক কতক পাশ্চাত্য পদার্থ-বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়া জগতের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিতেছে। অনেকের ধারণা, পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের উন্নতিতে সনাতন ধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, জীব নাস্তিক হইয়া উঠিবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইবার নহে। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র লৌকিক ও অলৌকিক বিজ্ঞানের যে সমুন্নত শিখরে সংস্থাপিত, পাশ্চাত্য লৌকিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা পুনরায় নবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া জগতে

সত্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সনাতনত্ব বিশেষভাবে প্রমাণ করিবে। যে বিজ্ঞানের চরমোন্নতি করিয়া আর্য্যগণ তাহা ভগবদ্ সাধনার অন্তর্লক্ষ্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, পাশ্চাত্যগণ তাহারই কতক অংশ পরীক্ষায় সিদ্ধ করিয়া কেবল লৌকিক ভোগ ও বহির্জগতের শোভা সম্পাদনের জন্যই প্রয়োগ করিয়াছে। দেবাদিদেব শিব বলিয়াছেন, সময়ে বিজ্ঞান সাহায্যেই অন্তর্লক্ষ্যে চিত্ত নিয়োজিত হইয়া থাকে।

চিত্তের সহিত যে, আসনের অতি নিকট সম্বন্ধ, তাহা বিজ্ঞান সাহায্যেই সহজে উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেই পূজাকালে কুশাসন বা তদনুরূপ কোন আসন বসিবার আধাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাটি, মাতুর, মসলন্দ, চ্যাটাই, সতরঞ্চি, সূক্ষ্মবস্ত্র, মৃত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠ, তৃণ ও পত্রাদি রচিত বহুবিধ আসন সত্ত্বেও কুশাসন প্রভৃতি কয়েকটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট আধারে পূজাসনের ব্যবস্থা কেন? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যোগাবিষ্কারক ভগবান শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলি যখন দেখিলেন, চিত্তের নিবৃত্তিই যোগ-সাধনার প্রধান অবলম্বন, তখন কোন কোন্ উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, সে সকলের বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধানে অথবা যোগগুরু মহাযোগী শঙ্করের উপদেশানুসারে তাহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যম ও নিয়মাদি দ্বারা মনের স্থিরতা কিয়ৎপরিমাণে সংগঠিত হইলেও, পূজাসনে বসিয়াই সাধকের ধ্যেয় বস্তুতে সহসা চিত্ত নিয়োজিত হয় না; মন, তথাপি চঞ্চল, চিত্তবিক্ষেপক নানাবিধ চিন্তায় ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্যস্থিরতা সম্বন্ধে বাধা উৎপাদন করে। পুনঃ পুনঃ তাহার হেতু অনুসন্ধানে সর্ব্ব-প্রথম আধাররূপী আসনের পার্থিব ভাবসমূহের গতিরোধক শক্তির অভাবই প্রকৃত ও প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইল। তখনই আসনের সংস্কারার্থে তিনি যত্নবান হইলেন। অনন্তর তদ্বিষয়ে সিদ্ধকাম হইয়া পূজানুষ্ঠানে যে পঞ্চবিধ সিদ্ধাসনের বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাহা

এই :—১ম, কাশ-কুশোত্তর ; ২য়, কম্বলাজিন-কুশোত্তর ; ৩য়, রাঙ্কবাজীন-কুশোত্তর ; ৪র্থ, কৃষ্ণাজিন-কুশোত্তর ; ৫ম, ব্যাঘ্রাজিন-কুশোত্তর। এই পাঁচ প্রকার আসনই আশু সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানসিক বৃত্তিগুলির স্থিরতা সম্বন্ধে বস্ত্রাদি নির্ম্মিত বা সাধারণ যে কোন আসন কোনও প্রকারেই অনুকূল নহে। শ্রেষ্ঠ তড়িৎ-আধার পৃথীতত্ত্বের সহিত আমাদিগের এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহপিণ্ডস্থ তড়িচ্ছক্তির বা ঐরূপ কোন অব্যক্ত শক্তির সতত আদান প্রদান চলিতেছে। সে শক্তি যাহাই হউক, বর্ত্তমান ভাষায় 'তড়িৎ' বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। যতক্ষণ সেই শক্তি পরস্পরের মধ্যে অবিরোধে পরিচালিত থাকে, ততক্ষণ পার্থিব ভাবসমূহ হৃদয় হইতে উন্মোচিত করা কিছুতেই কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আর্য্যঋষিগণ গভীর গবেষণা ও পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেই হেতু উক্ত অব্যক্ত শক্তির গতিনিরোধক পূর্ব্ব-কথিত অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন আসনগুলির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে সর্ব্বস্থানের তড়িৎরাশি সমানভাবে বিশুদ্ধ নহে—সুতরাং সেই বিমিশ্র বা অপরিশুদ্ধ তড়িতের শোধনার্থে পূর্ব্বোক্ত আসনগুলি সম্পূর্ণ উপযোগী। এই জন্য এবং আরও কয়েটি গুপ্ত কারণে ঐগুলি সহজে সিদ্ধিপ্রদায়ক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তড়িতানুরূপ সেই শক্তি যে সকল স্থানের বিশুদ্ধ নহে, তাহা সাধকগণ 'স্থান-মাহাত্ম্য' বলিয়া সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে স্থানে সর্ব্বদা মহাত্মাগণের গতিবিধি থাকে, অথবা কোন সাধকের আশ্রম ছিল বা আছে, সেই সকল স্থানের তড়িত যে, স্বাভাবিক ভাবে বিশুদ্ধ তাহা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সাধকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নিমিত্ত পবিত্র তীর্থস্থানাদি প্রত্যেক সাধকের পক্ষে নিতান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। বর্ত্তমান সময়ে বহুতর কলুষিত ব্যক্তির গমনাগমন-সহযোগে তীর্থের সেই চির-পবিত্রতা যে, ক্রমান্বয়ে

তিরোহিত হইতেছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। তথাপি কঠোর কর্ম্মী সাধকদিগের সাধনা বলে অনেক স্থলে এখনও সে পূত শক্তির উগ্রতা বেশ উপলব্ধি হয়। কলুষিতাত্মা শত শত অধম ব্যক্তিও সহসা তথায় যাইয়া সাময়িকভাবেও চিত্তে কি এক অভিনব পবিত্রতা অনুভব করিয়া থাকে। এই কারণেই শিবোক্ত উর্দ্ধাম্নায়শাস্ত্রে স্থান ও আসনবিধির বিস্তৃত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন অপবিত্র স্থানে অর্থাৎ তমোগুণযুক্ত তড়িৎ-প্রবাহিত স্থানে সহজে সাধনা ফলবতী হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এই হেতু তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, পর্ব্বতশিখর, দেবালয়, নির্জ্জন উদ্যান, গুরু-সন্নিধান, নিজগৃহ, গো-শালা, তুলসী, বিল্ব, অশ্বত্থ, বট, আমলকী, কুলবৃক্ষসমূহ অথবা পঞ্চবটীমূল এবং জীবের শেষ শান্তির আলয় শ্মশানই সাধনার প্রশস্ত স্থান বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। এইরূপ যে কোন স্থানে পূর্ব্বোক্ত আসন স্থাপনপূর্ব্বক পূজা বা সাধনার বিধি প্রশস্ত; এই আসন-গুলির উপাদান-সমষ্টির এমন সুন্দর সমাবেশ আছে যে, তাহা দেখিলেই শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলিদেব অরণ্যের সকল তৃণ পত্রাদি পরীক্ষার পর কুশ ও কাশ সকল, পশু-লোমের মধ্যে মেষ-লোম, সর্ব্ববি পশু-চর্ম্মের মধ্যে মৃগ, ব্যাঘ্র, সিংহ ও হস্তি চর্ম্মই সেই বিদ্যুৎসম পার্থিব শক্তির গতিরোধে যে, সম্পূর্ণ অনুকূল তাহা পুনঃ পুনঃ সূক্ষ্ম পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারণ করিলেন এবং পরে পরস্পরের মিলনজাত ত্রিতয় আসনসমূহের আবিষ্কার করিয়া সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর সাধন প্রক্রিয়া মধ্যে যে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

একণে নানাবিধ আসন প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করিব। প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর বস্ত্র, তৎপরে কাশরচিত আসন পাতিয়া পূজাসন প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকেই কাশ-কুশোত্তর আসন বলে।

এইরূপে প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর কার্পাস বস্ত্র, অনন্তর মেষ-লোমজাত কম্বল বা রঙ্কুলোমজাত বস্ত্র অথবা কৃষ্ণসারের চর্ম্ম কিম্বা ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাই যথাক্রমে কম্বলাজিন কুশোত্তর, রাঙ্কবাজিন-কুশোত্তর ও ব্যাঘ্রাজিন-কুশোত্তর ইত্যাদি আসন বলিয়া শাস্ত্র-বিখ্যাত। এই সকল আসন সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে দুই হস্তের অধিক হইবে না, প্রস্থে দেড় হস্তের অনধিক হইবে না, এবং ঐরূপ তিন অঙ্গুলি হইতে অধিক বা দুই অঙ্গুলি অপেক্ষা অল্প স্থুল হইবে না। উর্দ্ধাম্নাদি যোগশাস্ত্রে আসন প্রস্তুতের এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আসনের এইরূপ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও উপর্যুপরি কুশাদি ত্রিবিধ দ্রব্যের সমাহারে পূজাসনের কি অদ্ভুত শক্তি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে প্রায় কোন পূজকই আসনের এইরূপ ব্যবস্থা করেন না, অথবা অনেকে জানেনই না। এই সমুদয় কারণে তাঁহাদের পূজা যে প্রায় নিষ্ফল হইয়া থাকে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার জ্ঞান নাই। অনেকে 'নিরাসনে বসিতে নাই' বলিয়া হয় ত একটি মাত্র তৃণ গ্রহণ করিয়া উপবেশন করে, সে মূর্খ পূজক আসনের আবশ্যকতা বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত নহে। কাশ-কুশোত্তর আসনই সাধারণ পূজকদিগের পক্ষে প্রশস্ত। সাধক, দীক্ষিত অথবা অভিষিক্ত হইয়া পূজা করিলে. কাম্যপূজায় গুরুর উপদেশ মত কম্বলাজিন ও রাঙ্কবাজিন আসনদ্বয় ব্যবহার করিবেন। অভিষেক ক্রিয়ার পর গুরুপ্রদত্ত ঐশীশক্তি অথবা আধুনিক ভাষায় বিশুদ্ধ তড়িচ্ছক্তি লাভ হইলে, উচ্চ সাধনাভিলাষী পূজক জ্ঞানসিদ্ধি-কার্য্যে ও মোক্ষসিদ্ধি-কার্য্যে যথাক্রমে কৃষ্ণাজিন ও ব্যাঘ্রাজিন-কুশোত্তর নামক আসনদ্বয়ে উপবিষ্ট হইয়া পূজার্চ্চনা করিবেন। এই আসনগুলি যথাক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর শক্তিসম্পন্ন। সাধারণ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাক্রমে যে কোনও আসনে

উপবিষ্ট হইয়া সাধনা করিলে উহাদের তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। ফলে কোনও না কোন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়াও অসম্ভব নহে। সেই কারণ সাধনার উন্নতির সহিত গুরুর উপদেশ মত যথাবিধি আসনে উপবেশন করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিবে। *

আজকাল অনেকে নামে সনাতন শাস্ত্রানুমোদিত সাধক বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বেচ্ছা-সাধনই তাহাদের কার্য্য, এবং স্বীয় শিষ্য-মণ্ডলীকেও সেইরূপই শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—"আসনের কোনও আড়ম্বর বা আবশ্যকতা নাই, কেবল ভক্তি-পূর্ণ ও একাগ্র হৃদয়ে 'তাঁহার' চিন্তা করিলেই হইল।" জিজ্ঞাসা করি—পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণ আপনাদের অপেক্ষা এতই কি মূর্খ ছিলেন, তাঁহারা এ মোটা কথাটা কি একবারও ভাবিবার অবসর পান নাই? যদি ইচ্ছা করিলেই একাগ্র চিত্ত হওয়া যাইত, তবে বাস্তবিক এত আড়ম্বরের কোন প্রকারই উদ্দেশ্য ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানব-বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের এতই অনুবর্ত্তী যে, সহজে কোনও রূপে তাহাকে ইচ্ছাধীন করা দুঃসাধ্য। যিনি আসনাদির বিরোধী, তিনি হয় মহাপুরুষ, তাঁহার সাধনা-পথের উচ্চাবস্থায় সতত তিনি সমাধিস্থ, অথবা তিনি সাধনার কোন কথাই সম্যক অবগত নহেন, অর্থাৎ সাধনাপথে তিনি একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। সেই কারণ বলিতেছিলাম, সাধনাকাঙ্ক্ষীগণের পক্ষে আসনের এই ক্রমোন্নত বিধি অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাও শিবের আদেশ। গুরু-পরম্পরায় শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত যে কোনও খেয়াল-সিদ্ধ উপদেশ, শিষ্যগণের মধ্যে প্রচার করা কোন ক্রমেই গুরুর কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে শিষ্যের

---

* 'গুরুপ্রদীপে ও 'জ্ঞানপ্রদীপ, ১ম ভাগে আসন সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় লিখিত আছে।

সাধনা যত হউক আর না হউক, তাহারা বৃথা তার্কিক ও ঋরিভ্রম পরিদর্শক হইয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ সাধারণ ভাষায় "এঁচোড়ে পাকিয়া যাইতেছে"। সুতরাং অতি সাবধানে শিষ্যকে সকল বিষয়ে উপদেশ করা গুরুগণের পক্ষে এখন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। সাধনাকাঙ্ক্ষীগণের প্রতিও বার বার অনুরোধ, তাঁহারাও সন্দেহশূন্য ও ভক্তিপুষ্ট হৃদয়ে সিদ্ধগুরুমুখোক্ত শাস্ত্রোপদেশানুসারেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

ইহার পর **আসনে বসিবার প্রণালী** শাস্ত্রে যাহা ব্যক্ত আছে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। যেরূপ ভাবে বসিলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির ও মনের চঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, অথচ হৃদয়ে পবিত্রভাব অনুভূত হইতে থাকে, সেইরূপ ভাবে উপবেশন করাকেই বসিবার প্রণালী বা আসন-বিধি কহে। শাস্ত্রে আসনের বহুবিধ প্রণালীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পাঁচটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১ম, সিদ্ধাসন, ২য়, পদ্মাসন; ৩য় বীরাসন; ৪র্থ, ভদ্রাসন; ৫ম, স্বস্তিকাসন।* এই আসন প্রণালীগুলিরও শাস্ত্রকারः সাধকের অবস্থানুসারে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। উপযুক্ত গুরু, শিষ্যের সাধনাবস্থা দেখিয়া যথাবিধি তাহার উপদেশ প্রদান করিবেন।

মানবের মনোবৃত্তি অনুসারে বাহ্যিক ভাবের যে, স্বাভাবিক বিকাশ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভয়, ক্রোধ, ভক্তি, দুঃখ, চিন্তা, আনন্দ ইত্যাদি অবস্থায় প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই তাহার ভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সে সময় দেখিলেই অন্য ব্যক্তি সহজে বুঝিতে পারে যে, এ-ব্যক্তির মনের ভাব এখন এইরূপ; অর্থাৎ এ ব্যক্তি নয় উত্তেজিত, ভীত বা রাগান্বিত হইয়াছে, না হয় দুঃখ, চিন্তা ও মর্ম্মপীড়ায় পীড়িত হইয়াছে, অথবা আনন্দোৎফুল্ল-হৃদয়ে কোন সুখভোগের আস্বাদ পাইয়াছে বা ভগবদ্ ভাবে গদ-গদ হইয়া পড়িয়াছে। এ সকল ভাব মানবের স্বাভাবিক। ইচ্ছা

* 'গুরু-প্রদীপ' ও 'জ্ঞান-প্রদীপ' দেখ।

করিয়া সহজে গোপন করিতেও পারা যায় না, আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। মানব যখন নানাবিধ সুন্দর মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া সম্মানার্হ আসনে উপবিষ্ট থাকেন, অথবা, তদবস্থায় অনাবশ্যক অধিক ধন ঐশ্বর্য্য সঙ্গে লইয়া পদব্রজে স্থানান্তরে গমন করেন, সে সময় পথিমধ্যে ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিহিত কোনও দরিদ্র ব্যক্তি সম্মুখে পড়িলে যেন সহজেই গর্ব্বের সহিত তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় "এই হট্ যাও"। আবার সে ব্যক্তিই সময়ান্তরে সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া কোনও কারণে অতি আবশ্যকীয় অর্থও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিতান্ত চিন্তিত ও ক্ষুণ্ণ মনে যাইতে যাইতে সম্মুখে পূর্ব্বরূপ কোনও ব্যক্তিকে যাইতে দেখিলে, তাহাকে কোনও কথা না বলিয়া নিজেই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবেন, অথবা বলিলেন "বাপু একটু রাস্তা দাও ত"। আবার যখন সেই ব্যক্তি প্রাঃতকালে পবিত্র হৃদয়ে গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিলে স্নান করিয়া, সুপবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, পুষ্পচন্দনাদি পরিশোভিত মন্দিরমধ্যে পূজাসনে উপবিষ্ট হন, তখনই বা তাঁহার চিত্তের কি ভাব, প্রত্যেক মানব তাহা নিজে নিজেই বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অবস্থা বিশেষে মনের ভাব সতত বিভিন্ন প্রকার ধারণ করে। এইরূপ যখন যাহা স্বাভাবিক, তখন তাহাই প্রত্যেক ক্রিয়ার অনুকূল। মনে রাগ হইয়াছে, এক ব্যক্তিকে তখনই শাসন করিতে হইবে, সে সময়ে গালে হাত দিয়া 'চুপটী' করিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অবিলম্বে জামার 'আস্তিন' গুটাইয়া বা 'মালকোঁচা' বাঁধিয়া, অথবা বাহুস্ফোট্ করিতে করিতে অন্য ব্যক্তির 'গর্দ্দান' আক্রমণ করিবে, ইহাই তখন স্বাভাবিক ; আবার এক সময়ে কোনও গভীর শোকের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, সে সময় বীরোচিত আচরণ কখনই আসিবে না, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিন্তা-নিমগ্ন চিত্তে মস্তক অবনত হইবে, নয়নে অবিরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিবে, হস্ত কপোলসং-

যুক্ত হইবে, ইহাই সেই সময়ের পক্ষে স্বাভাবিক। এইরূপ ভগবদ্ভক্তি ও আরাধনা উদ্দেশ্যে মানবের যে ভাবগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক, তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ উপবেশন প্রণালী বা আসনপ্রকরণাদি-রূপে বিবিধ বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ আসনের মধ্যে পদ্মাসন, বীরাসন ও স্বস্তিকাসন এই তিনটীই সরল ও সুবিধাজনক। সাধনাকাঙ্ক্ষীর অবগতির জন্য নিম্নে তৎসম্বন্ধে উক্ত হইতেছে।

পদ্মাসন :—বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বামপদ স্থাপন করিয়া, উন্নতভাবে স্থিরনেত্রে বসিবার নাম 'পদ্মাসন'; এবং উভয় হস্ত পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি এবং বাম হস্তের দ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে, তাহাকে 'বদ্ধপদ্মাসন' বলা যায়।

বীরাসন :—এক পদ এক উরুর উপর এবং অন্য পদ ভিন্ন উরুর নিম্নে স্থাপন করিয়া বসিবার নাম 'বীরাসন'।

স্বস্তিকাসন :—জানুদ্বয় ও উরুদ্বয়ের সন্ধিদেশে পদতলদ্বয় সংস্থাপন করিয়া লম্বভাবে উপবেশন করাকে 'স্বস্তিকাসন' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

এই তিন প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যেটি ইচ্ছা সেইটীই ব্যবহার করিতে পারেন, তবে বীরাসন রাজসিক পূজায় প্রশস্ত, স্বস্তিকাসন সাত্ত্বিক পূজায় এবং পদ্মাসন বা বদ্ধপদ্মাসন সাত্ত্বিক ও রাজসিক উভয় পূজাতেই বিশেষ উপযোগী; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উচ্চাবস্থায় সাত্ত্বিক ও তামসিক উভয়ই সমান। এই সকল উপদেশ গুরু-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রে প্রকট নাই। সেই কারণ কেবল গ্রন্থ পড়িয়াই সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সকল আসনের যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শাস্ত্র, আসন সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে :—

"আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্ব্বরোগনিবারণাৎ।
নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

অর্থাৎ 'আত্মসিদ্ধি প্রদান যেতু' এই বাক্যের আদ্যাক্ষর (আ), 'সর্ব্বরোগ নিবারণ হেতু' এই বাক্যের আদ্যাক্ষর (স), এবং 'নবসিদ্ধি প্রদান হেতু' এই বাক্যের আদ্যাক্ষর (ন) যথাক্রমে আ+স+ন মিলিত হইয়া 'আসন' হইয়াছে।

সাধনার্থীর হৃদয়ক্ষেত্র সাধনোপযোগী হইবার পর বা সঙ্গে সঙ্গেই আসনানুষ্ঠানের আবশ্যক। যতক্ষণ জীবের হৃদয় ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা সুবিমল না হয় ততক্ষণ কেবল আসনের অনুষ্ঠানেও সাধনার কোনও ফল পরিলক্ষিত হইবে না। অর্থাৎ সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত যম ও নিয়মনির্দ্দিষ্ট অহিংসা, অলোভ, সত্যানুষ্ঠান, ভগবদ্-বিশ্বাস ও ভক্তিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেই যথাশাস্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা বিধেয়। শ্মশান বা শব-সাধনা প্রভৃতি সময়ে আসনের আরও কঠিনতর বিধি আছে।

ভূমিতে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে আসনের আধার শক্তিসমূহের পূজা করিতে হয়। অনন্তর তদুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন আসন বিস্তৃত করিয়া "আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ"। এই মন্ত্রে ঋষ্যাদির স্মরণপূর্ব্বক—

"ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥"

এই মন্ত্রে আধার শক্তি দেবীর আরাধনা করিতে হয়, পরে "হ্রীঁ

আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিবার বিধি আছে। এই সময় আসনোপবিষ্ট হইয়া আসন পূজা করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, সে সমস্তই আসনস্থিত শক্তিসমূহের স্থিরীকরণ জন্য জানিতে হইবে। *

যোগের চতুর্থাঙ্গ 'প্রাণায়াম'।

যখন যম, নিয়ম ও আসনসহযোগে যোগের তিনটী অবস্থায়, পূজক বা যোগীর চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে পুষ্ট হইবে, তখনই তাহার প্রাণায়াম কার্য্য অভ্যাস করা বিধেয়, নতুবা নানাবিধ ব্যাধির সূচনা হইতে পারে। অনেকেই পুঁথি পড়িয়া বা প্রাণায়াম বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াই নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির হ্রাস, বৃদ্ধি ও নিরোধ বা পূরক, কুম্ভক ও রেচকরূপ নানাবিধ প্রাণায়াম করিয়া পরিশেষে শ্বাসকাশ রোগ ভোগ করিয়া দেহপাত করিয়া থাকেন। সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধগুরূপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হওয়া কোনও প্রকারেই উচিত নহে। যোগাঙ্গ মধ্যে প্রাণায়াম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। * ইহার সংক্ষিপ্তবিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল। গুরু-মুখাগত হইয়া এই সকল কার্য্য অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

সাধনপাদ পাতঞ্জল যোগদর্শনে লিখিত আছে যে :—

“তস্মিন সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।”

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর সাধারণ গতির যোগবিধি অনুসারে বিচ্ছেদ সাধনই প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত আছে। এই প্রাণায়াম সাধারণতঃ বৃত্তি ভেদে ত্রিবিধ। বাহ্য, অভ্যন্তর ও স্তম্ভবৃত্তি। বাহ্য প্রাণায়াম

---

* 'পূজাপ্রদীপে' ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কৃত্য আসনশুদ্ধি প্রভৃতি দেখ।

* 'গুরুপ্রদীপে যোগদীক্ষাভিষেকে প্রাণায়াম দেখ।

অর্থাৎ রেচক বা প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা, বাহিরেই কুম্ভক করা। ইহাতে বায়ু নিঃশ্বাস সহযোগে গ্রহণ করিয়া ভিতরে কুম্ভক না করাই বিধি। এই কার্য্যে রেচকান্তে বা বায়ুত্যাগ করিয়া যতক্ষণ সময়, আর বায়ু আকর্ষণ করিবে না, সেই সময়টুকু সাধকের বাহ্যকুম্ভক বা প্রাণায়াম হইবে। অভ্যান্তর প্রণায়াম অর্থাৎ পূরক বা ভিতরে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা বা ভিতরে কুম্ভক করিয়া, তাহার পর বায়ু ত্যাগ বা রেচন করা এবং স্তম্ভ প্রাণায়াম অর্থাৎ কুম্ভক বা নিশ্বাস বায়ুতে দেহ পূর্ণ করিয়া ইচ্ছামত রুদ্ধ করিয়া রাখা। যাহা হউক এই ত্রিবিধ প্রাণায়ামেই যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন প্রকার ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। সাধারণতঃ এই তিনের সমষ্টিকেই প্রাণায়াম বলে। দীর্ঘ ও সূক্ষ্মভেদে এই প্রাণায়াম আবার দ্বিবিধ। তাহা সংখ্যা ও শরীরের অবস্থা অনুসারে অবগত হওয়া যায়। ৪ মাত্রায় পূরক, ১৬ মাত্রায় কুম্ভক এবং ৮ মাত্রায় রেচক দ্বারা যে প্রাণায়াম হয় তাহাই সূক্ষ্ম। ইহা হইতে দীর্ঘ-কাল অর্থাৎ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ অথবা এইরূপ তদপেক্ষাও অধিকক্ষণ করিতে পারিলে দীর্ঘ প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হয়। চক্ষের পলকের নাম মাত্রা। মাত্রার সংখ্যা মূলমন্ত্র দ্বারা গণনা করিতে হয়। প্রাণায়ামে বায়ু কুম্ভককালে সর্ব্বশরীর যদ্যপি চিন্ চিন্ করিতে থাকে, তাহা হইলেই উহা দীর্ঘ প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে এবং ঐরূপ চিন্ চিন্ না করিলেই সূক্ষ্ম প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ কার্য্যের সমাহারকেই প্রাণায়াম বলে। আবার প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সংযোগকেও প্রাণায়াম বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত যম, নিয়ম ও আসন আদির বিবিধ ভেদের ন্যায় প্রাণায়ামও অষ্টবিধ।

"সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকাঃ॥

১ সহিত, ২ সূর্য্যভেদ, ৩ উজ্জায়ী, ৪ শীতলী, ৫ ভস্ত্রিকা, ৬ ভ্রামরী, ৭ মূর্চ্ছা, ৮ কেবলী এই অষ্টবিধ কুম্ভক বা প্রাণায়াম।

১। সহিত :—সাধারণ ভাবে নাসিকার দ্বারা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বায়ুর যথাক্রমে পূরণ ও রেচণাদি ক্রিয়ার যে প্রাণায়াম হয়, তাহারই নাম সহিত। ইহা আবার দ্বিবিধ, সগর্ভ ও নিগর্ভ। ইষ্ট-দেবতার বীজমন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে যে প্রাণায়াম, তাহার নাম সগর্ভ, এবং বীজমন্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কুম্ভকাদি করণের নাম নিগর্ভ।

সূর্য্যভেদ :—প্রথমে সূর্য্যনাড়ী বা পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক করিবে, যে পর্য্যন্ত কেশের মূল ভাগ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবে ও সেই সঙ্গে 'সমান' বায়ুকে নাভিমূল হইতে সুষুম্নার পথে উদ্ধত করিতে যত্নবান হইবে, পরে ইড়া অর্থাৎ বাম নাসাপথে ক্রমশঃ অতীব ধৈর্য্যের সহিত বা সম্পূর্ণ বেগ না দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিবে। ইহাই একটি পূর্ণ প্রাণায়াম। বার বার ঐরূপ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। এই ভাবে অন্ততঃ তিন বার প্রাণায়াম করা দরকার। প্রত্যহ প্রতি সন্ধ্যা ক্রিয়ার সময়ে এই ভাবে প্রাণায়াম ক্রিয়া নিজ স্বাস্থ্য ও সাধ্যানুসারে বাড়াইয়া ক্রমশঃ বিশবার পর্য্যন্ত করিতে অভ্যাস করিবে। ইহাদ্বারা জরা মৃত্যু বিনষ্ট, কুণ্ডলিনী-শক্তি উদ্বোধিত হইবে ও সাধকের দৈহিক অগ্নি এবং দীপ্তি বৰ্দ্ধিত হইবে।

৩। উজ্জায়ী :—উভয় নাসিকা-পথ দ্বারা 'বহির্ব্বায়ু এবং উদর, হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা 'অন্তর্ব্বায়ু' আকর্ষণপূর্ব্বক মুখের মধ্যে কুম্ভক করিয়া ধারণা করিবে। পরে মুখ-প্রক্ষালনের ন্যায় করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে 'জালন্ধর' নামক মুদ্রা করিবে, এইরূপে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া অবিরোধে বায়ু

ধারণা করিবে। ইহাতে আমবাত, ক্ষয়, কাশ, জর ও প্লীহাদি রোগ জন্মিতে পারে না, এবং জরা মৃত্যু বিনষ্ট হয়। সাধারণ বা অভ্যন্তর কুম্ভকযুক্ত যে কোন প্রাণায়ামে কোনরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে, ইহাই তাহার প্রতিশেধক বিধি।

৪। শীতলী :—ওষ্ঠ ও অধর পক্ষীর চঞ্চুবৎ করিয়া জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদরপূর্ণ করিয়া কুম্ভক করিবে, পরে উভয় নাসাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। ইহাতে অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মিবে না। ইহাও বিকৃত প্রাণায়াম জাত ব্যাধি বিনাশক ঔষধ স্বরূপ।

৫। ভস্ত্রিকা :—কর্ম্মকারগণ ভস্ত্রিকা বা জাঁতা দ্বারা যেমন করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করে, সেইরূপ উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উদরে চালিত করিবে। এইরূপে সাধ্য মত ক্রমশঃ বিংশতিবার বায়ু ভিতরে চালনা করিবে, অনন্তর কুম্ভক দ্বারা বায়ু ধারণ করিবে, পরে উভয় নাসাপুট দ্বারা জাঁতাকলের ন্যায় বায়ু রেচন করিবে। সাধক তিন-বার এই কুম্ভক বা প্রাণায়াম করিবে, ইহাতে কোন রোগ বা ক্লেশ থাকে না ; থাকিলে, ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা গুরুর নিকট ইহার প্রক্রিয়া জানিয়া লইবে।

৬। ভ্রামরী :—গভীর নিশাকালে জন-মানবপরিবর্জ্জিত যোগসাধনো-যোগী স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উভয় কর্ণ হস্তদ্বারা বন্ধ করিয়া পূরক ও কুম্ভকাদি করিবে। এইরূপ করিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ অনাহত শব্দ প্রতিবিম্ব-রূপ নাদ শব্দ শ্রুত হইবে। প্রথমে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত শব্দ, পরে বংশীধ্বনি শুনিতে পাইবে, তৎপরে মেঘগর্জ্জন. ক্রমে ঝর্ঝরী, ভ্রামরী, কাংশ তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ ও একত্র অনেক দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের নিনাদ শুনিতে পাইবে। ক্রমে নিত্য অভ্যাস সহযোগে যোগিগণ হৃদয়পদ্মস্থিত প্রকৃত অনাহত-ধ্বনি শুনিতে পাইবে, অনন্তর সেই ধ্বনি-মধ্যস্থিত আত্ম-

জ্যোতিঃ যোগীর দর্শন লাভ হয়। সেই কলিকাকার দীপজ্যোতিঃই ব্রহ্ম-স্বরূপ, যোগীর চিত্ত তাহাতে সম্মিলিত হইলেই সমাধি সিদ্ধির পথ সুগম হইয়া থাকে।

৭। মূর্চ্ছা :—সাধারণ ভাবে প্রাণায়াম করিয়া চিত্তবৃত্তিকে জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্তি করাইয়া আজ্ঞাচক্রের সম্মুখস্থ দ্বিতল প্রান্তে বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের পিছনে মস্তিষ্ক মধ্যে মনঃসংযোগদ্বারা কূটস্থ চৈতন্য-রূপ আত্মজ্যোতিতে লীন হইবার নাম মূর্চ্ছা প্রাণায়াম। ইহা দ্বারা পরমানন্দ সমুদ্ভূত হয়।

৮। কেবলী :—জালন্ধর বন্ধ সহ উভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুম্ভক করিলে কেবলী প্রাণায়াম বলা যায়। এক হইতে ক্রমে চতুঃষষ্টীবার পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা জপসংখ্যা রাখিয়া বায়ু পূরণ বা ধারণ করিবে। এই কুম্ভক প্রতি প্রহরে প্রহরে করা আবশ্যক। তাহাতে অসমর্থ হইলে সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচবার, তাহাতেও অসমর্থ হইলে চতুর্থ সন্ধ্যায় ও ত্রিসন্ধ্যায় কুম্ভক করিবে। যে পর্য্যন্ত 'অজপা' পরিমাণ বা একুশ হাজার ছয় শত বার কুম্ভক পরসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে কুম্ভক করিবে এবং প্রত্যহ কুম্ভকের সংখ্যা পাঁচবার করিয়া বৃদ্ধি করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ একবারও বৃদ্ধি করা বিধেয়। কেবলী প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে, যোগিগণের ভূতলে কিছুই অসিদ্ধ থাকে না।

অষ্টবিধ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সংক্ষেপেই বলা হইল; ইহা দ্বারা বুদ্ধিমান পূজক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই চিত্তস্থির হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত বহুবিধ যোগৈশ্বর্য্য বা যোগবিভূতিও লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পরমাত্মচৈতন্য দর্শন প্রাপ্তির শক্তি ক্রমে উদ্বোধিত হয়, মনের

নির্লিপ্ততা ভাব ও পরমানন্দ সম্ভোগ হইয়া থাকে। দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন, বাক্‌সিদ্ধি, ইচ্ছাগমন, এমন কি ত্রিলোক-পর্য্যটন করিবারও শক্তি আইসে, ইহা শিবের আজ্ঞা ; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাণায়াম যে, যোগের প্রধান অঙ্গ বা পূজাতত্ত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে সিদ্ধ হইলে ক্রমে নিম্নোক্তরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, নিম্ন বা অধম অবস্থায় সাধকের দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়। (সেই ঘর্ম্ম শরীরে মর্দ্দন করা আবশ্যক, না করিলে শরীরে ধাতু বা তেজ বিনষ্ট হইয়া থাকে।) দ্বিতীয় বা মধ্যমাবস্থায় শরীরে কম্প এবং তৃতীয় বা উত্তম অবস্থায় দর্দ্দুর বা ভেকের ন্যায় গতি অর্থাৎ স্বস্তিকাসন বা পদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্লুত-গতির ন্যায় চালিত করে। ক্রমে অধিককাল কুম্ভকের অভ্যাস হইলে, সাধক ভূমি হইতে শূন্যে বিচরণ করিতেও সমর্থ হন। ইহা প্রাণায়াম অভ্যাসের ফল মাত্র; ইহাতেও অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শন হয় না। ইহা কেবল মনস্থির করিবার একটি কৌশল মাত্র। মুমুক্ষু সাধক এই প্রাণায়াম সিদ্ধিরূপ বিভূতিতে যেন ভুলিয়া প্রকৃত লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতত সাবধানে থাকা প্রয়োজন।

প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, যোগীর অল্প নিদ্রা, অল্প মলমূত্র হইবে ; শারীরিক বা মানসিক রোগ বা শোক দুঃখ থাকিবে না ; সাধক সদাই হৃষ্টচিত্ত হইবে। তখন প্রত্যাহারাদি যোগের উন্নত ক্রিয়া করিবার সুবিধা হইবে।

যোগের পঞ্চমাঙ্গ 'প্রত্যাহার।'

ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা মনকে বিষয়লিপ্ত হইতে না দেওয়ার অভ্যাসকে প্রত্যাহার করে। মন স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে নানাবিধ ভোগ লালসায় প্রধাবিত হইতে থাকে, এই ক্রিয়ায় তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। মনকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে ; ইন্দ্রিয়াদি সাহায্যে মন যেন আর বাহিরে না

যায়; ইহা ব্যতীত মানস পূজার অভ্যাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র অর্থাৎ ইচ্ছা-মাত্রই অন্তর মধ্যে মনের কুম্ভক করাকেই প্রত্যাহার বলে।

আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে, ধারণা অভ্যাস করিতে হইবে। চিত্তকে বাহিরের ও ভিতরের কোনও বস্তুতে, যথা—নিজ নখের উপর, নাভিতে, নাসাগ্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃৎপদ্মে, চন্দ্রে, সূর্য্যে বা কোন স্ফটিকাদি মণিতে দর্পণে, ঘটে, পটে, প্রতিমূর্ত্তিতে অথবা ব্রহ্মে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার নাম ধারণা। ষোড়শ প্রকার আধারে, মূলাধারে লিঙ্গমূলে, স্বাধিষ্ঠানে নাভিদেশে, মণিপুরে, হৃদ্দেশে, অনাহতে ও ভ্রূমধ্যে, উর্দ্ধদেশে এই পঞ্চ স্থানে যোগিগণের উপাস্য বস্তুর ধারণা করিতে হয়। *

<u>যোগের ষষ্ঠাঙ্গ 'ধারণা'।</u>

ধারণা দ্বারা ধারণীয় বস্তুতে চিত্তের যে একাগ্রতাভাব জন্মে, তাহারই নাম ধ্যান। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ধ্যান সাধারণতঃ দুই প্রকার। ষট্‌চক্র মধ্যে বা দেবতাদিগের ধ্যান-মন্ত্রানুসারে যে ধ্যান করা যায়, তাহার নাম সগুণ ধ্যান, এবং সহস্রারে যে পরমাত্মার ধ্যান করা হয়, তাহার নাম নির্গুণ ধ্যান। মন্ত্রযোগে সগুণ ব্রহ্মের স্থূল দৈবমূর্ত্তি ধ্যান, হঠযোগে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ধ্যান, লয়যোগে সূক্ষ্মতর বিন্দুধ্যান এবং রাজযোগে নির্গুণ ব্রহ্মধ্যান প্রশস্ত। এ সকল বিষয় 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'গীতাপ্রদীপ' ও 'পূজাপ্রদীপে' বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধকের অবস্থানুসারে ক্রমে এই সকলের অভিজ্ঞতা জন্মিবে।

<u>যোগের সপ্তমাঙ্গ ধ্যান'।</u>

ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানরূপ ত্রিপুটির লয় বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বিধানকেই সমাধি বলে। সমাধি

---

* 'গুরুপ্রদীপে' ও 'জ্ঞান-প্রদীপে' দেখ।

যোগের অষ্টমাঙ্গ 'সমাধি'। অবস্থায় সাধকের বা ধ্যাতার মন, প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, এমন কি 'আমিত্ব' পর্য্যন্ত ধ্যেয় বস্তুতে লয় হইয়া যায়। সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প ও অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্পভেদে সমাধি দুই প্রকার। সমাধি অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর জ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত ভাব, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সে সব কিছুই থাকে না। ধ্যেয় ও ধ্যাতা উভয়ের একত্ব হেতু সে এক অব্যক্ত ভাবে পরিণত হয়। এ সকল কথা সাধকের হৃদয়ে সাধনা দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে, নতুবা বৃথা বাক্যজাল ও তর্কের উপাদান মাত্রেই পর্য্যবসতি হইতে দেখা যায়। * সেই কারণ সাধু মহাত্মাগণ বলেন, ক্রমে সাধনা সহযোগেই এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে। পূর্ব্ব হইতে ইহার এই আভাষ মাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইল। সুতরাং এ সম্বন্ধে গুরুমুখাগত ও যথানিয়ম প্রাণায়ামাদি পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে যথাক্রমে অভ্যস্ত না হইয়া বৃথা তর্ক, প্রতিবাদ বা অধিক আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পূজা বা যোগ সাধনার নিমিত্ত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট কালেরও উল্লেখ আছে। যোগারম্ভ কাল। অনভিজ্ঞ গুরু বা সাধনাভিলাষী শিষ্য তাহা না জানিয়া যে কোনও একখানি যোগ শাস্ত্রের দুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই তাহার কিয়ৎ পরিমাণ স্থূল মর্ম্ম গ্রহণান্তর সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেই তাঁহারা সময় সময় সাধনপর যোগীরূপে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া করিয়া অবশেষে শ্বাস-কাশের ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সিদ্ধ-যোগিগণ শিষ্যকে যোগশাস্ত্রের উপদেশকালে বলেন—"বাবা বসন্ত অথবা শৎকালে নৈমিত্তিক পূজা সাধনা বা যোগাভ্যাস আরম্ভ করিবে, তাহা হইলেই অনায়াসে যোগসিদ্ধ হইতে পারিবে।"

---

* 'জ্ঞান-প্রদীপে—যোগ চতুষ্টয়ের অনুগত সমাধি দেখ।

"বসন্তে বাপি শরদি যোগারম্ভং সমাচরেৎ !
তদা যোগো ভবেৎ সিদ্ধো বিনায়াসেন কথ্যতে ॥"

তাহার পরই আবার বলিতেছেন :—

"হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা ।
যোগারম্ভং নকুৰ্ব্বীত কৃতে যোগো হি রোগদঃ ॥
বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগারম্ভং সমাচরেৎ ।
তথা যোগী ভবেৎ সিদ্ধো রোগান্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

অর্থাৎ হেমন্ত, শিশির বা শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যোগ বা নৈমিত্তিক পূজা বা যোগ ক্রিয়া আরম্ভ করিবে না, তাহা হইলে সেই যোগ হইতে নিশ্চয়ই রোগ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু শরৎ ও বসন্তকাল যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইবে, পরন্ত কোন রোগ থাকিলে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

এক্ষণে বৎসরের মধ্যে কোন্ কোন্ মাস কোন্ কোন্ ঋতু-পরিজ্ঞাপক তাহাও যোগিগণ যোগশাস্ত্রানুসারে নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন। চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত; জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুই মাস গ্রীষ্ম; শ্রাবণ ও ভাদ্র—বর্ষা; আশ্বিন ও কার্ত্তিক—শরৎ; অগ্রহায়ণ ও পৌষ—হেমন্ত; মাঘ ও ফাল্গুন—শিশির বা শীতকাল বলিয়া জানিবে।

"বসন্তশ্চৈত্র বৈশাখৌ জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ৌ চ গ্রীষ্মকৌ।
বর্ষা শ্রাবণ ভাদ্রাভ্যাং শরদাশ্বিন কার্ত্তিকৌ।
মার্গপৌষৌ চ হেমন্তঃ শিশিরো মাঘ ফাল্গুনৌ ॥"

গোরক্ষ-সংহিতা ।

দেখা যাইতেছে, প্রকৃতি অনুসারে জল বায়ুর যেমন পরিবর্ত্তন হয়, শরীর মধ্যেও সেইরূপ নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা সাধনারও সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও নৈমিত্তিক পূজা বা আরাধনার প্রচলিত দুইটি প্রশস্ত কাল দেখিতে পাওয়া যায়। একটি শরৎকাল আর একটী বসন্তকাল। শরতে শারদীয়া নবরাত্র বা দুর্গাপূজা হইতে লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী আদি যেমন বহু পূজা হইয়া থাকে, বসন্ত কালেও সেইরূপ বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শ্রীরাম-নবমী ও চড়ক-সংক্রান্তি আদি নানা পূজা বা সাধনার ব্যবস্থা আছে; সুতরাং এই সমস্ত প্রধান প্রধান পূজা ও অর্চ্চনার সহিতই প্রাথমিক সাধনা আরম্ভ করা বিধেয়।

সাধনানুকূল স্থান।

শাস্ত্রে সাধনানুকূল কালের ন্যায় স্থানেরও যথেষ্ট উল্লেখ আছ। শাস্ত্রের সেই সকল বিস্তৃত শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মানুবাদ ও উদ্দেশ্য নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

সাধনার জন্য এমন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া আবশ্যক, যেখানে পূজার্চ্চনার পক্ষে কোন বিঘ্ন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়। প্রথমতঃ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা বা জমিদারের রাজ্যে অথবা উপদ্রববিহীন স্বধর্ম্ম নিরত ভদ্র-পল্লীর প্রান্তভাগে যে স্থানে গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ এবং সহজ-প্রাপ্য, অথচ স্থানটী স্বাস্থ্যানুকূল বেশ নির্জ্জন, কূপ, তড়াগ, সরোবর বা দীর্ঘিকা অথবা স্রোতস্বতী ও নির্ঝরিণী আদিতে সুপেয় জলের সুবিধা আছে, এমনই স্থানে প্রাচীরাদি পরিবেষ্টন দ্বারা নিরাপদ করিয়া তন্মধ্যে অতি উচ্চও নহে, নিতান্ত নিম্নও নহে, বাসোপযোগী মনোরম কুটীর নির্ম্মাণ করাইবে। মৃত্তিকা ও গোময় আদি দ্বারা চতুর্দ্দিক এমনভাবে মার্জ্জিত করিয়া লইবে যাহাতে স্থানটী সম্পূর্ণ কীটাদি বর্জ্জিত হয়। কুটীর প্রাঙ্গন পবিত্র তুলসী আদি ও পুষ্পসমূহ তরু, গুল্ম ও লতাদি দ্বারা পরি-

শোভিত করিবে। এইরূপ স্থানই ভগবদানন্দপ্রদ পূজার্চ্চনা বা সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল বলিয়া জানিবে। প্রথম সাধনাবস্থায় দূরদেশ, নিবিড় বন, কোলাহলপূর্ণ রাজধানী বা বহুলোকাকীর্ণ প্রদেশ, জীর্ণ-গোশালা, উন্মুক্ত নদীতট, শ্মশান ও সরীসৃপাদির ভয়যুক্ত স্থান এবং কোটরযুক্ত প্রাচীন বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিবে। এসকল স্থান প্রথম প্রথম যে চিত্ত স্থিরীকরণে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সুতরাং যেখানে কোনরূপ বাধা পাইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ স্থানটী বেশ মনোরম ও চিত্তে আনন্দপ্রদায়ক, সেই স্থানই সাধনারম্ভের অনুকূল বিধায় তথায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবে।

সাধনার সময় সাধকের আহারাদির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই অবস্থায় প্রয়োজন মত ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, কর্পূর, শম্বুকাদির-চূণ বর্জ্জিত তাম্বুল, শালিঅন্ন, যব, গোধুম, পটল কাঁঠাল, মানকচু, কাঁকুড়, বদরি, করঞ্জ, কদলী, ডুমুর, কাচকলা, কদলীদণ্ড, মূলা, বেগুণ ইত্যাদি তরকারী; পল্‌তা, হিঞ্চা, ও পালমাদি শাক; ত্বক-বর্জ্জিত মুগ ও ছোলা আদি হইতে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা সাধনার অনুকূল বলিয়া শাস্ত্রাদেশ আছে। সাধনানুকূল স্থানে বাস, আহার্য্যাদির এইরূপ বিধান এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারাই সহজে চিত্ত স্থির করিতে পারা যায়।

সাধনানুকূল আহার্য্যাদি।

এই সময় অম্ল, রুক্ষদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, লবণ, সর্ষপতৈল, তীক্ষ্ণদ্রব্য ও কটুদ্রব্য ভক্ষণ, অধিক পথপর্য্যটন প্রাতঃস্নান, অন্যায় পূর্ব্বক পরধনহরণ, প্রাণিহিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ, অহঙ্কার, কুটীলতা, উপবাস, অসত্যভাষণ, মোহ অর্থাৎ সংসারে অত্যাসক্তি, প্রাণিপীড়ন, মৈথুন, অগ্নিসেবন, বহুভাষণ ও অতিভোজনাদি চিত্তস্থিরতার পক্ষে বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে কোনও কার্য্যই পরিত্যাগ করিবে।

প্রাণায়ামান্তে ঘর্ম্ম হইলে তাহা শরীরে মর্দ্দন করিবে। সহসা শীতল বায়ুতে বসিয়া ঘর্ম্ম নিবারণ করিবে না। পূর্ণোদরে বা ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় অথবা মলমূত্রের বেগ রোধ করিয়া কিম্বা পথশ্রান্ত বা চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া কোন সময়ে পূজার্চ্চনা করিবে না। তাহাতে আদৌ চিত্ত স্থির হইবে না, সুতরাং তাহাতে সাধনায় কোন ফলই হইবে না, বৃথা পণ্ডশ্রম হইবে। 'পূজাপ্রদীপে' বর্ণিত মনের চিন্তাশূন্যতা বা মনের রেচন ক্রিয়ার বিশেষ অভ্যাস করিবে।

পূর্ব্বকথিত অনুষ্ঠানসহ সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ত্যাগশীল ও স্পৃহা শূন্য ভাবে নিত্য ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিলে এক বৎসরের মধ্যেই তাহার ফলস্বরূপ চিত্ত-স্থিরতা ও কোনরূপ যোগবিভূতি পরিলক্ষিত হইবে এবং সিদ্ধির পথ সুগম হইবে। আজকাল অনেকেই নানা লৌকিক চিন্তা ও সাংসারিক নানা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে দিবারাত্রি কেবল স্বার্থপরতা এবং হীন প্রবৃত্তির বিবিধ কর্ম্ম করণান্তর যেন না করিলে নয় ঠিক এই ভাবে কয়েক মুহূর্ত্তকাল সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়াই মনে করেন, আমরা যথেষ্ট সাধন ভজন করিলাম, কৈ কিছুই ত হইল না! অনন্তর নিজ সাধন ভজনে যেন বীতশ্রদ্ধ হইয়া সন্দেহপরায়ণ হন ও সিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া শাস্ত্রনিন্দুক হইয়া পড়েন। কিন্তু একাগ্র চিত্তে, দৃঢ় বিশ্বাসপুষ্ট হৃদয়ে ও অচঞ্চল ভক্তি-যুক্ত হইয়া অদম্য উৎসাহে গুরু নির্দ্দিষ্ট এই প্রত্যক্ষ সাধন-শাস্ত্রের বিধি নিষেধে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিলে যে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। তবে সকলের চিত্তের গতি ও ধারণাশক্তি সমান নহে, তাহার উপর পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল বা প্রারব্ধ এবং ইষ্টগুরুর কৃপা অবশ্যই সাধকের উন্নতির পক্ষে বিভিন্ন ফল প্রদান করে। এতকাল ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই যে যোগাদি সাধনা আবদ্ধ ছিল, তাহার কারণ তাঁহারা বংশপরম্পরায় নিষ্ঠা ও অপরিত্যজ্য সাধন নিরত ছিলেন। এক্ষণে

ব্রাহ্মণও অন্যান্য বর্ণের ন্যায় কেবল এই সংসারযাত্রা-পরিচালনেই সংস্থানপর, স্বার্থানুসন্ধী, কুটীল, হীনবীর্য্য পরশ্রীকাতর, পরপদসেবী, চাটুকার, বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সাধনা ও তাহার সিদ্ধি ধীরে ধীরে তৎসমীপ হইতে যেন বহুদূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে মুখে বা গল্পচ্ছলে শাস্ত্রের দুই চারিটা 'বুলি' শুনিয়া অথবা পেশাদার গ্রন্থকারদিগের ছাপান সাধন গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াই কাহারও বা সিদ্ধপুরুষ হইবার ইচ্ছা, আবার কেহ বা মূল শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রগুলা কিছুই নহে, 'ও কেবল ব্রাহ্মণ-সমাজের ও গুরুমণ্ডলীর চালাকি মাত্র, এইরূপ ধারণা পোষণপূর্ব্বক নিজেই নিজের মনোমত ও সুবিধা মত কতকগুলা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়া নবীন সাধন পন্থার যেন আবিষ্কারক এবং সিদ্ধমহাপুরুষের ভানে অতি বড় শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া দম্ভ বিকাশ করেন। সাধনার বর্ণপরিচয় হইতে না হইতে এরূপ হওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। সাধনা করিতে হইলে যথাবিধি সকল কার্য্য ধীর, স্থির ও বিশ্বাসপুষ্ট অন্তরে অদম্য উৎসাহে গুরুমুখাগত হইয়া সম্পন্ন করা বিধেয়।

মন্ত্র-রহস্য। এতক্ষণ সাধনা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম, তৎসহ আচমন হইতে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও ক্রমে জপ করিবার জন্য শাস্ত্রে বহুবিধ যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাধক সমাজে চিরদিন যথেষ্ট প্রচলিত আছে। এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব।

'মন্ত্র' অর্থে আমরা কি বুঝিয়া থাকি – সাধারণত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ মাত্র, যাহা সাময়িক ভাবে পুনঃ পুনঃ সাধকের মুখে উচ্চারিত হয়; তাহার উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলবার আছে। অনেকে বলেন—"মন্ত্র কয়েকটী সংস্কৃত শব্দ বা বাক্যমাত্র, ইহার উদ্দেশ্য কিছুই নাই; সাধারণ পূজক ইহার অর্থ ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না

পারিয়া 'তোতাপাখীর' মত কেবল মাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বাস্তবিক তেমন কোন বিশেষ ফল নাই, বরং ইহাদের উদ্দেশ্য সাধকের কথোপকথনের ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলে অনেক সুবিধা হয়।"। ইহার উত্তরে অধিক কথা বলিবার ইচ্ছা নাই, তবে মন্ত্র-সিদ্ধ সাধকগণ বলেন, "মন্ত্রের অনুবাদ হইতেই পারে না বা তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; মন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ দৈবধ্বনি বা অপার্থিব শব্দ বা নাদময় বস্তু।" যথার্থ 'মন্ত্র' অর্থে শব্দ বা নাদকে বুঝায়, ইহাকেই পরমাত্মার অনাদি ও অনন্ত-প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলিয়া জানিবে। বিন্দুমাত্রও ইহাতে সন্দেহ করিবে না। জীব যখন কোন শব্দ উচ্চারণ করে, তখন উহা কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে দেহের কোন স্থান হইতে কেমন করিয়া সমুত্থিত ও বিকশিত হয়, গভীর ভাবে তাহার অনুসন্ধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে যে 'শব্দ' কি? সাধারণতঃ জীবের কণ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালু ইত্যাদি দেহের কয়েকটী স্থান স্পর্শ করিয়া ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ীর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রাণশক্তির সাহায্যে এই শব্দের বিকাশ হয়, সমস্ত দৈহিক যন্ত্রাদি বিদ্যমান থাকিতেও সেই অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় শক্তির অভাবে (শবাবস্থায় বা নিত্য নিদ্রিত অবস্থায়) আর তাহার বিন্দুমাত্রও প্রকাশ হয় না। অতি ধীরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে, 'শব্দ' জিনিষটী কি? মানুষ 'আমি' 'আমার' বলিয়া পাগল হয়, কিন্তু সেই 'আমি'-বোধক ব্যক্তিটি কে? এই মল-মূত্র-রস ও রক্ত সংযুক্ত, অস্থি মজ্জা শুক্রাদি পরিপূরিত দেহযষ্টিই কি 'আমি'? নির্জ্জনে চিত্ত স্থির করিয়া একাগ্রভাবে একবার ভাব দেখি, কোন্ শক্তির অভাবে এই অতি যত্নে রক্ষিত দেহখানি একদিন স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিবে, বা নিত্য নিদ্রাকালে পড়িয়া থাকে তখন 'আমি' শব্দ আর উচ্চারণ করে না? অতি ধীরে সেই 'আমির' বা আত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধান কর

আর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহাভ্যন্তরের অতি গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর কোন্ স্থান হইতে ঐ শব্দ বা নাদ উথিত হইতেছে, তাহা হইলেই ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে 'শব্দ' কি ? এই শব্দই যে ব্রহ্ম স্বরূপ 'নাদ' এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রাচ্যগুরুমণ্ডলীর সিদ্ধিশিষ্য শ্রীমৎ খ্রীষ্টও তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেলের'র প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন "The word is God" অর্থাৎ 'শব্দই ঈশ্বর' বা 'নাদঃ ব্রহ্ম'। এ কথার অর্থ বর্ত্তমান খৃষ্টানগণও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাহা হউক এই শব্দ মন্ত্রাত্মক। ঋষিপ্রবর্ত্তিত মন্ত্রমধ্যে শব্দসমষ্টির এমনই বিচিত্র সমাবেশ (Combination) আছে, যাহাতে তাহার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারাই সাধকের অভিলষিত ভাবের ঔৎকর্ষ্য ও আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। উহার মর্ম্ম সাধনার সাহায্যে অন্তরেই উপলব্ধির বিষয় ; শব্দার্থে বাস্তবিকই উহা অব্যক্ত !

পূর্ব্বে বলিয়াছি মন্ত্র ঋষি-প্রবর্ত্তিত। "সিদ্ধশব্দম্ ঋষিপ্রোক্তম্ ইতি মন্ত্রম্", যিনি যে মন্ত্রের প্রবর্ত্তক বা আবিষ্কারকর্ত্তা, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি বলিয়া বেদাগমে বর্ণিত আছেন ! এক একটি মন্ত্রসাহায্যে ঋষিগণ সিদ্ধ হইয়া তাহা স্ব স্ব শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, গুরুপরম্পরায় তাহাই চলিয়া আসিতেছে। **পূজা ও জপভেদে মন্ত্র দ্বিবিধ।** আচমন হইতে পূজান্তে প্রণাম পর্য্যন্ত যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাই পূজামন্ত্র. উহা বিস্তৃত ; এবং জপার্থে যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ক্ষুদ্র, তাহাই জপ-মন্ত্র বলিয়া পরিচিত। সকল মন্ত্রই 'সাঙ্কেতার্থং' বা সাঙ্কেতিক ভাবে সৃষ্ট। রাসায়নিক সাঙ্কেতিক-শব্দের (Symbol) ন্যায় মন্ত্রও সঙ্কেতময়। অর্থাৎ রসায়নশাস্ত্রে যেমন H. 2 O. বলিলেই জল সম্বন্ধে তাহার বৈশ্লেষণিক সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া যায়, রসায়নবিদের নিকট উহার কোন তত্ত্বই আর অপরিজ্ঞাত থাকে না - কেমন করিয়া কোন কোন প্রক্রিয়াদ্বারা

কোন্ কোন্ উপাদান-সহযোগে জলের আবির্ভাব বা তাহার সৃষ্টি, পুষ্টি ও ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, ঐ 'সিম্বলিক্' বা সাঙ্কেতিক শব্দের উচ্চারণ অথবা শ্রবণমাত্রেই তৎসমুদায় যুগপৎ অভিজ্ঞের হৃদয়মধ্যে প্রতিভাত হইয়া পড়ে, মন্ত্রও ঠিক সেইরূপ, ইহা আর্য্যদর্শনের 'সিম্বল' বা সাঙ্কেতার্থক শব্দমাত্র। কোন দেব বা দেবীর বীজমন্ত্র দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 'ক্রীঁ, ক্লী, ঐঁ, দূঁ' প্রভৃতি বীজমন্ত্র সকলের কোন একটী সাধকের দর্শনে, শ্রবণে বা সম্মুখে উপস্থিত হইলেই অনতিবিলম্বে দেব দেবীর আবির্ভাব, রূপ, পূজা ও ধ্যান আদি সমস্তই এককালে স্মৃতিমধ্যে উদয় হইয়া পড়ে। যেমন কোন ব্যক্তির শত্রু, মিত্র অথবা বিশেষ পরিচিত যে কোন লোকের নাম বা নামের আদ্যাক্ষর মাত্র শ্রুত হইলেই, সেই ব্যক্তির নাম, ধাম, আচার, ব্যবহার বা গুণাগুণ যুগপৎ সমস্তই তাহার স্মরণ হইয়া থাকে; জপকালে সেইরূপভাবেই অভিষ্ট দেব বা দেবীর ধ্যানাদি হৃদয়মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে ধারণা করিবার জন্য ঘন ঘন বীজমন্ত্রের উচ্চারণ বা স্মরণ সাধকের বাঞ্ছনীয়। অবিরতভাবে বিন্দু বিন্দু বারিপাতে প্রস্তরের অঙ্গও বিদ্ধ বা ক্ষয় হইতে দেখা যায়, কিন্তু বহুদিনের সঞ্চয়ে, সেই বিন্দুগুলির সমষ্টিতে যত অধিক জল হইতে পারে, তাহা এক সময়ে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিলে, প্রস্তরের সে ক্ষয় বা বিদ্ধভাব আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধনায় বা পূজায় বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণে হৈ হৈ করিলে যে ফল না হয়, পূর্ব্ববর্ণিত ধারাবাহিক বীজমন্ত্রের অবিরত সাধনায় হৃদয়ক্ষেত্র তদপেক্ষা সহজে ব্রহ্ম অথবা ভগবদ্জ্ঞানে সংবিদ্ধ হইতে দেখা যায় মন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ এই যে—মন যাহার সাহায্যে ত্রাণ বা লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য যাহাতে লীন হয় তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রযোগের নামাত্মক শব্দই মন্ত্র। 'জ্ঞান-প্রদীপে' মন্ত্রযোগ এবং 'পূজাপ্রদীপে' মন্ত্ররহস্য ও বীজমন্ত্রার্থ বিজ্ঞান দেখ, বেশ বুঝিতে পারিবে।

এই মন্ত্রগুলি আবার সাধকের অবস্থানুসারে একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী বা বহু অক্ষরবিশিষ্টা হইয়া থাকে। তাহাতে সময় সময় সাধকের প্রয়োজন মত মন্ত্রশক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারাও সাধকের অভিলষিত কার্য্যে বিপুল সহায়তা প্রদান করে। এই সমুদয় বিষয় কথায় প্রকাশ করা নিতান্ত দুরূহ। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলি, হৃদয়বান ব্যক্তি বোধ হয় ইহাতেই কতকটা মন্ত্রশক্তির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ব্যাকরণ পাঠক অবশ্যই জানেন, আমাদের দেব-ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সকল বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে; বোধ হয় জগতের অন্য কোন ভাষাতেই বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান বিষয়ে এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ক্রমোন্নত বিকাশবিধি নাই। যাহা হউক, এই বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থান বিনিশ্রিত বর্ণগুলির কি এক বিচিত্র সমাবেশে মন্ত্রসমূহ গঠিত ও আবিস্কৃত হইয়াছে, যাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের সমতা ও পরিপুষ্টি সংসাধনান্তর আত্মজ্ঞানানুকূল মনের স্থিরতা সম্পাদনাদি অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। বর্ণাত্মক শব্দাবলীর এরূপ শক্তি 'সাম' বেদ মূলক উচ্চ সঙ্গীত-বিজ্ঞান হইতেও উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আর্য্যঋষিগণ সেই সঙ্গীতকেও নাদসিদ্ধি বা ব্রহ্ম-সাধনানুকূল যোগাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অনাদিকাল হইতেই তাহা 'সামগান'রূপে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। সেই 'সামগানের' দ্বিতীয় আভাস 'ধ্রুপদ-আলাপনে' পরিলক্ষিত হয়, যোগিগণ সিদ্ধমন্ত্র-সহযোগে তাহার বিহিত সাধনা করিতেন। ক্রমে অনার্য্য-উৎপীড়নায় সে বিধির প্রায় বিলোপ হইয়াছে। কিন্তু সে নীতি এবং তাহার ফল-শক্তির অতি ক্ষীণ বিকাশ এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্থূল বা লৌকিক স্বরসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্যের কণ্ঠনিঃসৃত বিশুদ্ধ স্বরলহরীতে এখনও সকলকেই মোহিত হইতে হয়। এই বিশ্ববিমোহিনী

শক্তি স্বর-সমষ্টি মধ্যে কিরূপে আবির্ভূতা হয়, সামান্য চিন্তা করিলেই তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সঙ্গীত-বিজ্ঞান মধ্যে ষড়জ আদি সাতটি স্বর ও উদারা, মুদারা ও তারা এই তিনটী গ্রামের বিভিন্ন সমাবেশ বিবিধ রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রাগ-রাগিণীগুলির কোনটী প্রাতে, কোনটী মধ্যাহ্নে, কোনটী সাংকালে আবার কোনটী বা গভীর নিশায়, গীত হইয়া থাকে। সিদ্ধ-গায়কগণের মধ্যে কেহ কোনও রাগ অসময়ে আলাপ করেন না। এরূপ করিবার কারণ বা তাহার বিজ্ঞান অনেকেই হয়ত অবগত নহেন, তবে চিরপ্রথানুসারে সকলেই তাহা এখনও মানিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের সকল কর্ম্মই শরীর ও ধর্ম্ম রক্ষার সম্পূর্ণ সহায়ক। শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব, শরীরই ধর্ম্ম সাধনার আদি আধার এবং ধর্ম্ম ব্যতীত শরীর ধারণও বৃথা। আর্য্যদিগের এই সুগভীর সূক্ষ্ম দর্শন-সাহায্যেই জগৎ-গুরুর সুপবিত্র আসন তাঁহারা চির-স্বাধীন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কাল-ভেদে স্বরের বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। প্রভাতের সেই কোমল মিশ্রিত স্বরগুলি সে সময় কণ্ঠ হইতে অতি সহজে যেমনভাবে বহির্গত হয়, নিশাকালে সেগুলি ঠিক সেইরূপ ভাবে বাহির হয় না, এবং সন্ধ্যার তীব্র স্বরসমূহ মধ্যাহ্নে যথাযথ প্রকাশ হওয়াও অসম্ভব বা প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রকৃতির অপ্রিয়। সেরূপ অন্যায় আলাপনে দেহ-ধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে বিভিন্ন কালানুগত স্বাভাবিক স্বরের বিকাশ জীব-দেহের ও মনের মঙ্গল-বিধায়ক। এই হেতু প্রাতঃকালীন রাগ, সন্ধ্যায় বা সময়ের রাগ, অসময়ে, আলাপন করা গন্ধর্ব্ববেদ, বা সঙ্গীত শাস্ত্র বিরুদ্ধ ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শব্দ বা স্বরের কাল ও উচ্চারণ ভেদে তাহাদের অন্তর নিহিত অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে। মাতৃকা-বর্ণাত্মক সেই স্বরব্যঞ্জনপূর্ণ দেবাক্ষরগুলির স্বর বা শব্দ উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও

দার্শনিক নিয়ম-বিধানে সমাবিষ্ট হইয়া সিদ্ধ-ঋষিমুখে বিবিধ মন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার শক্তি যে বাস্তবিক অনন্ত ও অব্যক্ত, তাহা কি আরও বুঝাইয়া বলিতে হইবে ? যদ্যপি ইহা অপেক্ষা মন্ত্রের প্রকৃত শক্তি বা মন্ত্রের গূঢ় অব্যক্ত-রহস্য বুঝিবার অভিলাষ থাকে, তবে সাধক, গুরুমুখাগত হইয়া কেবল অবিরোধ সাধনা সাহায্যে তাহা অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করুন। শাস্ত্রে মন্ত্রকে 'বিদ্যা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রময়ী দেবতা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যিনি যে মন্ত্রকে সাধনা দ্বারা প্রথমে দর্শন পূর্ব্বক যে উদ্দেশে প্রয়োগ বা বিনিয়োগ করিয়া সিদ্ধ হইয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই সেই মন্ত্রের 'ঋষি'; সেই কারণ তাঁহার গুরুত্ব হেতু তাঁহার ন্যাস।* বা ঋষ্যাদি ন্যাস করা সকলেরই কর্ত্তব্য এবং সেই ন্যাস গুরু-স্থানে অর্থাৎ 'মস্তকেই' করা বিধেয়। সমস্ত মন্ত্র-তত্ত্বের 'ছাদন' অর্থাৎ নিজ সাধনাধিকার মধ্যে সংরক্ষণ বা বন্ধন করিতে হয় এই হেতু 'ছন্দো নিবদ্ধ' মন্ত্রের নাম 'ছন্দঃ" হইয়াছে ; এই ছন্দের অমরত্ব ও পদত্ব হেতু তাহার ন্যাস মন্ত্রের স্থান 'মুখেই' বিহিত হইয়াছে মন্ত্রাত্মক বা মন্ত্রময়ী "দেবতা" সাধকের হৃদয়মধ্যে ধ্যেয় ; সেই কারণ 'হৃদয়াভ্যন্তরেই' তাঁহার ন্যাস করিবার বিহিত বিধান আছে। মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা বিষয়ে সম্যক্ পরিজ্ঞাত না হইলে সাধক মন্ত্রের শক্তি লাভ করিতে পারিবে না। মন্ত্রের বিনিয়োগ অর্থাৎ কোন মন্ত্র কোন্ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও না জানিলে মন্ত্রশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রত্যেক মন্ত্র সাধনার পূর্ব্বে গুরুমুখে তাহার রহস্য ও উদ্দেশ্যসহ বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

মন্ত্রের রূপান্তর যন্ত্রেরও অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিষয় সাধক-সমাজে

---

* ন্যাসের বিস্তারিত অর্থ পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

যন্ত্র-তত্ত্ব। প্রকাশিত আছে। সাধক, সাধনা-সাহায্যেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। সুতরাং সে বিষয় ভাষায় বলিবার কিছুই নাই, তবে যন্ত্রের বিধান সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

"যন্ত্র" এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই বুঝা যায় যে, যাহা দ্বারা বা যে কোনও উপায়ে যে কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, তাহাই সেই কার্য্যের যন্ত্র। সেইরূপ সাধনা বা পূজা-কার্য্যেও যাহাতে সহজে লক্ষ্য স্থির করিতে পারা যায়, অথবা পূজা করিবার আধাররূপে সহজে যাহাতে ধ্যেয় বস্তুর স্থিরীকরণ করিতে পারা যায়, বা যে উপায়ে তাহা সিদ্ধ হয়, ভগবৎ-সাধনায় তাহাই প্রধান পীঠ, আসন বা সাধন-যন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।* ঘট, পট, প্রতিমা, পাষাণ, মন্ত্র ও যন্ত্রে দৈবী পীঠ স্থাপনা পূর্ব্বক পূজা করিবার শাস্ত্র-বিহিত যে বিধি আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন; তবে প্রতিমা ও পটাদির ন্যায় যন্ত্র-পূজা সাধক ব্যতীত সাধারণের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। সাধক ক্রিয়াবান হইলেই যন্ত্র-পূজার অধিকারী হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মন্ত্র, সাধনা-বিজ্ঞানের 'সিম্বলিক' বা সাঙ্কেতিক স্বর অথবা বিদ্যা বা মন্ত্রময়ী দেবতা; 'যন্ত্রও' সেইরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে ধ্যেয়-বস্তুর অন্যতর 'সিম্বল' বা যন্ত্রময়ী বা প্রত্যক্ষ দেবতা। সিদ্ধযোগী অন্তঃপূজার প্রথম উপকরণ হইতেই যন্ত্রের আরাধনা করিয়া থাকেন। সেই কারণ বাহ্য-পূজা হইতে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাসময়ে তাহাই অন্তরে নিয়োজিত করিবার বিহিত-বিধান শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। ভিন্ন ভিন্ন সাধনোদ্দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োগ আছে, যন্ত্র-সাধনাতেও সেইরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীর নানাবিধ যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। পূজার্থী গুরুমুখে যন্ত্রের সহিত তাহার গ্রহণাধিকার ও উপদেশ পান; সেই সকল যন্ত্রের

* 'পূজাপ্রদীপে' 'যন্ত্রাদি দেখ এবং 'জ্ঞানপ্রদীপে' মন্ত্রযোগে প্রাণক্রিয়া মধ্যে পীঠ-বিজ্ঞান দেখ।

মধ্যে পরস্পর রূপ-স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও মূলতঃ সকলগুলিই একাধিক ত্রিকোণাকারের সমাহারভূত এক একটী ক্ষেত্রমাত্র। একই বিষয়-বিজ্ঞাপক যন্ত্রের এই মূল ভিত্তি ত্রিকোণাকারে কেন কল্পিত হইল, * পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যেও তাহার অতি স্থূল মর্ম্ম কিয়ৎপরিমণে বোধগম্য হইতে পারে। অধুনা তত্ত্বসভা বা 'থিয়োসফিকেল সোসাইটির' সঙ্কেত-চিহ্নে আমাদের মূল যন্ত্রের অনুকরণে সেই ত্রিকোণাকার চিত্র ব্যবহৃত হইতেছে। জানি না, তাঁহারা উহার প্রকৃত মর্ম্ম কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তবে একথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, যিনি তত্ত্বসভার প্রধান সঙ্কেতচিহ্নে উহার প্রথম প্রচলন করিয়াছেন, তিনি আর্য্যদর্শনের যন্ত্রতত্ত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অবগত ছিলেন অথবা গুরুপরম্পরায় উহা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক পাশ্চাত্য পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় যে, তিনটী বিভিন্নমুখী বিদ্যুচ্ছক্তি সমত্রিভুজাকারে পরস্পরের দিকে পরিচালিত করিলে যদ্যপি উহাদের গতিত্রয় ঐ ত্রিভুজের কেন্দ্রস্থলে কোনরূপে একত্রীভূত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানেই উহাদের শক্তিসমন্বয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে, তখন সেই শক্তিত্রয়ের আর কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইবে না। আর্য্যদর্শনের গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে, যোগাচার-নির্দ্দিষ্ট 'মূলাধার' নামক মূল চক্রে, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার বিভিন্নমুখী গতির সহিত প্রাণায়ামাদি অন্তর ক্রিয়ার ফলে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হয় তাহার কেন্দ্রে সমাহিত দৈবীশক্তি কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও উত্থান ক্রিয়াদ্বারা জীবের দৈহিক বাহ্য ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া যায়।

---
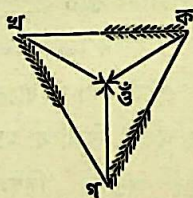
* 'পূজাপ্রদীপে' সগুণ ব্রহ্মরূপের ভেদবিজ্ঞান মধ্যে ত্রিকোণে যন্ত্রতত্ত্ব দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর।

মূলাধারের সামান্য আভাস না পাইলে সাধনাকাঙ্ক্ষী পাঠক ইহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। মূলাধার * বর্ণনায় গুরুমুখে এইরূপ প্রকাশ আছে যে, গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে, লিঙ্গের দুই অঙ্গুলি নিম্নে, পশ্চাদ্দিকে ঠিক মেরুদণ্ডের মধ্যে নিম্নাংশে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ চতুর্দ্দল মূলাধার নামক কমল অবস্থিত আছে, এই মূলাধারের কোরক মধ্যে অতি সুন্দর একটী ত্রিকোণমণ্ডল বিরাজিত আছে, ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের কেন্দ্রকে যোনিমণ্ডল কহে, তাহা সর্ব্বতন্ত্রের মধ্যেই অতীব গোপনীয়া; ঐ যোনিমণ্ডলের মধ্যভাগে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকারবিশিষ্টা সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুটিলা পরম দেবতা কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তিরূপে স্বয়ম্ভূ শিববেষ্টিতা হইয়া একমুখ দিয়া পিছনের ব্রহ্মপথ রোধ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী জগৎ সংসৃষ্টি স্বরূপা এই কুণ্ডলিনী নিরন্তর জীবপিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অনুরূপে সৃষ্টিকার্য্যে নিরতা রহিয়াছেন। ইনি বাগ্‌দেবী, সর্ব্বদেবতার পূজনীয়া ও বর্ণনার অনির্ব্বচনীয়া। ইনিই মূল যন্ত্রস্বরূপা। গুরুকৃপায় সাধনা সাহায্যেই ইহা অনুভবনীয়া।

পূর্ব্বোল্লিখিত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের বিদ্যুচ্ছক্তির ন্যায় বিদ্যুল্লতাকারা কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি, যোগাঙ্গীভূত প্রাণায়াম সাধনায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না গতিতে পরিচালিত হইবার পর, যখন যোনিমণ্ডলে ত্রিকোণ-কেন্দ্রে কুণ্ডলিতা বা ত্রিবলয়াকারে শিববেষ্টিতা হইয়া ক্রিয়াশূন্যা বা ব্রহ্মপথ রোধ পূর্ব্বক অবস্থান করেন, সিদ্ধযোগী সাধনা দ্বারা তাহা যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, তখনই তাহার বাহ্যজগতের ক্রিয়া অবসানপ্রায় হয়। সাধকের তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে স্থিরীভূত হয়। সাধক সেই কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্বোধনোদ্দেশেই তখন ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে সেই মূলাধার নির্দ্দিষ্ট ত্রিকোণাবর্ত্ত

* 'গুরুপ্রদীপ,' পূজাপ্রদীপ' ও 'গীতাপ্রদীপে' এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দেখ।

মূল-যন্ত্রের অনুকল্পে নিম্ন অধিকারীর সাধক বাহ্য পূজায় যে বাহ্য-যন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সাধনাতন্ত্রে কমলকোরকমধ্যে সেই ত্রিকোণাবর্ত্ত যন্ত্রময়ী দৈবীশক্তিকে পূজা করিবার বিধি আছে। ভূগোল শিক্ষার সময় মানচিত্র দর্শনের ন্যায় অধ্যাত্ম-বিদ্যার শিক্ষাকালে মূল যন্ত্রের উপলব্ধির জন্য এই বাহ্যযন্ত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। সেই কারণ সাধক বাহ্যপূজায় ঘট, পট, প্রতিমার উপর 'মন্ত্রে' আরাধ্যা দেবতার ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন। কখন কখন সিদ্ধ পূজক কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধনান্তর হৃদয়ে অভীষ্ট দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহার ধারণা ও ধ্যানান্তে প্রশ্বাস-বায়ু সহযোগে যন্ত্র-পুষ্পোপরি তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া বাহ্য-যন্ত্রাসনে স্থাপনান্তর বাহ্যপূজা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাধক পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। সাধনার এই বিচিত্র বিধি বাস্তবিক বাক্যাতীত; ইহা ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীর গবেষণার ফল। ইহাতে সন্দিহান হইবার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই, সুতরাং সাধনাকাঙ্ক্ষী সাধক মন্ত্রের ন্যায় যন্ত্রকে অপার্থিব বা দৈবী বস্তু বলিয়া জানিবে ও পরমাত্মার প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিবে।

পূর্ব্বে মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাসের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ন্যাসতত্ত্ব। ন্যাসের উদ্দেশ্যকল্পে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"ন্যায়োপার্জ্জিত-বিত্তনামঙ্গেষু বিনিযোজনাৎ।
সর্ব্বরক্ষাকরত্বাচ্চ ন্যাস ইত্যভিধীয়তে॥"

ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত ধনরত্ন অলঙ্কাররূপে স্বীয় অঙ্গ ভূষিত করিলে, তাহা যেরূপ আনন্দের বা বিপদাপদে যেমন সহায়ক হয়, ভূতশুদ্ধির পর সেইরূপ মন্ত্ররূপী দেব-বীজগুলিও সাধকের নির্দ্দিষ্ট সাধনা ক্রিয়া বা অঙ্গন্যাসাদি অনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিন্যস্ত হইলে, অর্থাৎ নিজ স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি বিনাশের পর দৈবী দেহ নির্ম্মিত হইলে তন্মধ্যে অভীষ্ট

দেবতার প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ভগবদানন্দের উপভোগ, পারত্রিক কল্যাণ ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকাঙ্কের "ন্যায়োপার্জ্জিত" ইত্যাদি প্রথম ছত্রের আদ্যক্ষর (ন্যা) এবং দ্বিতীয় ছত্রের "সর্ব্বরক্ষকরত্বাচ্চ" ইত্যাদির প্রথম অক্ষর (স) উভয় মিলিত হইয়া ন্যা+স='ন্যাস' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দেবতার ভাব-তন্ময়তা সিদ্ধির জন্য ন্যাসের তুল্য অনুষ্ঠান আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। অঙ্গ ও করাঙ্গাদি খণ্ড খণ্ড ন্যাস দ্বারা প্রথমে স্বীয় অভীষ্ট দেবতাকে পরিচ্ছিন্ন মন্ত্রশক্তিরূপে সাধক সাষ্টাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ব্যাপকন্যাস দ্বারা পাদমূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সেই খণ্ড খণ্ড মন্ত্রময়ী শক্তি সমূহের আদ্যন্তরূপিণী বা আপাদমস্তকে একমাত্র দেবতার অনুভূতি করণই ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অথবা পূজাকালে মন্ত্রশক্তিদ্বারা আপনার দেহ সম্যক আচ্ছন্ন বা সাধকের 'আমিত্ব' ভাবটী মন্ত্রময়ী অভীষ্ট দেবতার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া আপনাকে মন্ত্রময় বা দেবতাময় অনুভব করাই ন্যাসতত্ত্বের গভীর উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে ন্যাসানুষ্ঠানকল্পে সাধক শাস্ত্রোপদিষ্ট যে সকল বাহ্য-ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহাও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক। পূর্ব্বে আসন ব্যবস্থায় বলা হইয়াছে, পূজাকালে চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের স্থিরতা-সম্পাদনে সহায়তা প্রদানই আসনের প্রধান লক্ষ্য, ন্যাসও সেই কার্য্যে অধিকতর সূক্ষ্মভাবে সহায়তা করে। যখন সাধক আসনসিদ্ধ হইয়া সাংসারিক বা বাহ্য-শক্তির উপদ্রব হইতে ক্ষণিক শান্তিলাভের জন্য প্রয়াস পায় তখন নিজ দেহস্থিত শক্তিসমূহ দেহের নানাস্থানে অযথা পরিচালিত থাকিবার কারণ চিত্তের প্রকৃত স্থিরতাপক্ষে নানা বাধা উৎপাদন করে, সেই কারণ সেই শক্তি-গুলিকে যথাযথ স্থানে সমানভাগে বিন্যস্ত করিবার জন্যও ন্যাসের প্রয়োগ সাধন তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান আলোচনায় বুঝিতে পারা

যায়, মেঘমণ্ডলে সঞ্চিত বিদ্যুল্লতা ধরাতলস্থিত বিদ্যুদ্ভাণ্ডারে মিলিত হইবার জন্য যখন প্রবল বেগে বজ্ররূপে নিপতিত হয়, তখন তাহার সেই পতনপথে বাধারূপে যাহা কিছু থাকে, সমস্তই বিদ্ধস্ত হইয়া যায় ; লৌকিক বিজ্ঞানবিদ্ মানব বিদ্যুতের সেই বেগ হইতে স্ব স্ব গৃহ-অট্টালিকাদি রক্ষার জন্য গৃহভিত্তিসংলগ্ন এক সূক্ষ্মমুখী লৌহদণ্ডের আবিষ্কার করিয়াছে। বিদ্যুৎ যেমনই প্রবল বা বিস্তৃত হউক না কেন, ধাতুময় দণ্ডের সেই সূক্ষ্মপথে বিনাবাধায় তাহা পরিচালিত হয়। যে কোনও সূক্ষ্মমুখী পথে পরিচালিত হওয়াই বৈদ্যুতিক স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল অবস্থাতেই বিদ্যুতের এবম্বিধ ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি তড়িতাধার পৃথিবীর সহিত জীবদেহস্থিত তড়িতের নিরবচ্ছিন্ন আদান প্রদান চলিতেছে, সেই কারণ সেই ক্রিয়ারোধক বা সেই শক্তির পরিশোধক আসনের আবিষ্কার হইয়াছে ; কিন্তু সাধক, আসনসিদ্ধ হইয়া পৃথ্বীতত্ত্বের সেই ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও চিত্তস্থিরতায় সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারেন না। তাহার কারণ, তাঁহার অঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে সেই শক্তি বিচ্ছিন্ন বা অসমান অবস্থায় আবদ্ধ অথবা বিক্ষিপ্ত থাকিবার হেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতে থাকে ; সুতরাং অঙ্গন্যাস বা করাঙ্গন্যাসাদির অনুষ্ঠানে দেহের সূক্ষ্মমুখী পথ দিয়া বিশেষ সূক্ষ্মমুখী অঙ্গুলিগুলির পরস্পর মিলন দ্বারা (পূর্ব্বকথিত গৃহভিত্তিসংলগ্ন সূক্ষ্মাগ্র লৌহদণ্ডের অনুকরণে) শির হইতে পদতল পর্য্যন্ত দেহের সেই শক্তিগুলির সমতা আনয়ন করিতে হয়। তাই ন্যাসকালে সকল স্থানে সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলি সমূহের স্পর্শ করাইবার বিধান আছে। সাধক খণ্ড খণ্ড ন্যাসদ্বারা শরীরস্থ শক্তিকে সর্ব্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ব্যাপকন্যাস দ্বারা সেই খণ্ড খণ্ড শক্তিগুলিকে অখণ্ডরূপী-একটী শক্তিতে পরিণত করেন। ব্যাপকন্যাসে শির হইতে পাদমূল এবং পাদমূল হইতে শিখাগ্র পর্য্যন্ত যেভাবে উভয় হস্তের অঙ্গুলিগুলি পরিচালিত করা

যায়, তাহাতে দেহস্থিত সকল শক্তির সমতা হইয়া আত্ম-তন্ময়তা উপস্থিত হয়। আত্মিকতত্ত্ব-বিজ্ঞানে কথিত আত্ম-সম্মোহন-ক্রিয়াটী (Self-Mesmerism, Self-Hypnotism) অতি স্থূলভাবে ইহারই অনুরূপ বলা যাইতে পারে। যাহা হউক সাধক ন্যাসতত্ত্বে দৈবশক্তির আরও গূঢ়তর মর্ম্ম গুরুমুখেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।

এক্ষণে পূজা-অর্চনায় যন্ত্র-মন্ত্রাদির পর 'ভাবতত্ত্ব' সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলেই 'পূজাতত্ত্ব' নামক সনাতন সাধনতত্ত্বের 'চতুর্থোল্লাস' এক প্রকার সমাপ্ত হয়।

ভাবতত্ত্ব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যথাক্রমে দিব্য, বীর ও পশুভাবে পূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে উক্ত আছে। "ভাবস্তু ত্রিবিধা প্রোক্তা দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।" এই ত্রিবিধ ভাবমধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দিব্যভাব মুক্তিপ্রদ, সর্ব্বমঙ্গলনিদান ও সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক; দ্বিতীয় বীরভাব মধ্যম ও তৃতীয় পশুভাব, নিম্ন বা প্রাথমিক অধিকারীর উপযুক্ত। এই ভাবত্রয়ের মধ্যে যিনি যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, তিনি হোম, জপ ও তপস্যাদি দ্বারা প্রাণপণে সাধনা করিয়াও যদি ভাব তন্ময় হইতে না পারেন, তবে তাঁহার তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র কিছুই ফলপ্রদ হইবে না। "ন ভাবেন বিনা চৈব তন্ত্র মন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে ভাবের প্রভাবেই সাধক নিষ্কাম বা মুক্তিলাভ এবং সকাম বা কুল-গোত্রাদির অন্তর্গত সংসারে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। সাধনার ক্রম-বিধানানুসারে শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে কথিত আছে যে, পশুভাবরূপ মহাভাব সর্ব্বভাবেরই সিদ্ধিপ্রদায়ক। তাহার কারণ, সাধক প্রথমে পশুভাবে সিদ্ধ না হইলে, পরবর্ত্তী উত্তমোত্তম বীরভাবের সাধক হইতে পারিবেন না এবং সিদ্ধ না হইলে তৎপশ্চাৎ মহাফলপ্রদ ও অতীব সুন্দর দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারিবেন না। 'রুদ্রযামলে' একথা স্পষ্ট উক্ত আছে :—

"পশুভাবং মহাভাবং ভাবনাংসিদ্ধিদং পুনঃ।
আদৌভাবং পশোঃকৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদাবশ্যকম্;
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তম্।
তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলম্॥"

যাহা হউক এই ভাবসিদ্ধি ব্যতীত সাধনার সকল কর্ম্মই পণ্ডশ্রম মাত্র। সদাশিব তাই "কৌলাবলীতে" খুলিয়া বলিয়াছেন যে, বেদহীন বিপ্র যেমন বৈদিক সংস্কারে অসমর্থ, বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ভক্তিতত্ত্ব যেমন সম্যক পরিস্ফুট হয় না, শক্তিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি যেমন উপহাসের কথা, গুরু ব্যতীত তন্ত্র-শাস্ত্র যেমন অনধিগম্য. পতিহীনা নারী যেমন সাংসারিক সর্ব্ববিধ মাঙ্গলিক কর্ম্মে বিবর্জ্জিতা, কুলতত্ত্ব ব্যতীত দেবী বা আমার সাধনায় যেমন অনধিকারী, ভাবহীন সাধকও সেইরূপ যে কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভে অসমর্থ। এই ভাবের অভাবেই কুলশাস্ত্রে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই এবং সেই কারণেই ভাববিশুদ্ধ সাধককে প্রকৃত কৌলিক বলিয়া সকলে পূজা করিয়া থাকেন।

এখন এই 'ভাব' জিনিসটী যে কি তাহা ঠিক বুঝাইয়া বলা বাস্তবিক অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি কখনও কোন পুষ্করিণী বা নদীতে অবগাহন করে নাই, চিরদিন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া তাহার নিত্যকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে যেমন সন্তরণ প্রণালী বুঝাইয়া বলা অসম্ভব, অথবা জলে না নামাইয়া কোন ব্যক্তিকে সন্তরণে শিক্ষিত করা আকাশকুসুমের ন্যায় যেমন নিস্ফল প্রয়াস, সাধনতত্ত্বের বিশেষ ভাবতত্ত্বের মর্ম্ম ভাষায় ব্যক্ত করাও সেইরূপ মানবের সাধ্যাতীত। ভাবের তত্ত্ব ভাবুকের হৃদয়েই অনুভূত হইয়া থাকে, অন্যের তাহা বলিবার বা বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। স্বয়ং ভগবান ভবানীপতিও ভাবতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া আত্মভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই তিনিও সেই ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বলিয়াছেন

"ভাবের স্বরূপ, বাক্য দ্বারা প্রকাশ অসম্ভব"; তবে স্থূল কথায় এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভাব অর্থে তন্ময়তা। সাধারণ সাংসারিকভাব হইতে বোধহয় তাহার কিয়ৎপরিমাণ আভাস অনুভব করিতে পারা যায়। সাংসারিক-জীব, স্বামী স্ত্রী ও পুত্রকন্যা আদির মায়ামোহে প্রেমভাবে বিভোর, সেই প্রেম যখন প্রেমিকাকে অধীর ও উন্মত্ত করিয়া তুলে, তখন তাহার সংসারের সাধারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রায় থাকে না; তাহার প্রেমের বিষয়ীভূত বস্তুর তৃপ্তি-সাধন জন্যই যেন তাহার জীবনযাপন, এবং তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাহার জীবনের সার্থকতা বোধ হয়। ইহাই সাংসারিকের তন্ময়তা। অথবা সেই প্রেম-পাত্রের অভাব বা বিচ্ছেদ হইলেই তাহার পক্ষে সমস্ত সংসার যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, সমগ্র জগৎ যেন মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়, তাহার প্রেমপাত্র যে পথে, নিজেকেও সেই পথে লইয়া যাইতে তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; ইহাই সংসারে সংসারী ব্যক্তির তন্ময়তা, ইহাই সংসারের স্বরূপ বা প্রকৃতিগত ভাব। আবার সেই স্বামী স্ত্রী; পুত্র ও কন্যা আদির ভালবাসা, স্নেহ অথবা ভক্তিপাত্রের কোন স্মৃতি যদি সংসারপ্রেমিকের সম্মুখে সহসা উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পুনরায় উন্মাদপ্রায় হইয়া যায়, হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, ইহাকেও সংসারের ভাব বলে। এই ভাবে যিনি যত বিভোর, তিনি ততই ইহাতে তন্ময়। সাধনা রাজ্যেও ভাব বা তন্ময়তা লাভেও ঠিক এইরূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন শক্তি হইতে কোন বস্তু সংক্রামিত বা তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে, যেমন সেই শক্তিকে তন্ময় করিতে হয় বা তাহার প্রকৃত ভাবে ডুবাইয়া দিতে হয়, ভগবচ্ছক্তির বিন্দুমাত্রও আয়ত্ত করিতে হইলে, সেইরূপ তাঁহাতে (তৎ+ময়) তন্ময় হইতে হইবে। তাঁহার শক্তি আত্মতত্ত্বে সংক্রামিত করিতে হইবে। তাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন, তিনি তাঁহাতে ততদূর

তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তাসাগরে আমার আত্ম-অস্তিত্ব সম্পূর্ণ-রূপে ডুবাইয়া দেওয়াই আমার তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়তা বা ভাবোন্মাদতাকেই সাধকের ভাবসিদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধক সাধনাপথে যাহা কিছু অনুষ্ঠান করে, সকলই এই ভাবসিদ্ধির জন্য। সেই কারণ গন্ধর্ব্ব-তন্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন :—

"দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।
ন্যাসংবিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং শিবে ॥
ন্যাসাত্তদাত্মকোভূত্বা দেবো ভূত্বাতু তং যজেৎ।
প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈর্ন্যাসৈর্দেবশরীরতা ॥

দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং দেবতা না হইয়া কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে নাই। হে জগদ্‌কল্যাণি শিবে! মন্ত্রন্যাস ব্যতীত জপানুষ্ঠান আসুর বা অদৈব অর্থাৎ তাহার সকল কর্ম্ম বিফলপ্রদায়ক হইবে। সুতরাং পূর্ব্বকথিত ন্যাসাদি দ্বারাই তন্ময় বা অভীষ্ট দেবাত্মক হইয়া অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। পূজাঙ্গীভূত পূর্ব্বোক্ত ন্যাস, প্রাণায়াম ও ধ্যানের দ্বারা সাধকের দেব-শরীরত্ব লাভ হইয়া থাকে।* যখন সাধক সাধনাবলে এইরূপ তন্ময় হইতে সমর্থ হন, তখন তিনি তাঁহার ভাবরাজ্যে কোন অভাবই অনুভব করেন না। তখন সংসারের যে দিকে যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই তাঁহার ধ্যেয় দেবতার পূর্ণ বিকাশ পরিদর্শন করেন। তখন তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে মহামায়ার অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের তত্ত্ব দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ করেন, আর সেই বিশ্ব-প্রকৃতিমধ্যেই বিশ্ব-প্রকৃতির লীলা রহস্য দেখিতে দেখিতে সাধক প্রকৃতিময় বা আত্মহারা হইয়া যান।

* 'পূজাপ্রদীপে' শক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত ধ্যানরহস্য দেখ।

সাধকের এই দেবতাময় হইবার জন্য ন্যাসাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, বাহ্যভাবে সেই ভাব-তন্ময়তা সিদ্ধির জন্যও বাহ্য দেহে সেই-রূপ স্বীয় অভীষ্ট দেবের অনুরূপ নানা চিহ্ন ধারণ করিতে শাস্ত্রোপদেশ আছে। অর্থাৎ শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্যভেদে পঞ্চো-পাসকের পঞ্চবিধ তিলক ও পরিচ্ছদাদির বিহিত বিধান আছে।

যিনি যখন যে দেবতার অর্চ্চনা করিবেন বা যে দেবতার উপাসক হইবেন, তাঁহাকে সে অবস্থায় সেই দেবতাময় হইতে হইবে। স্বয়ং বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুপূজা করিবে না, তাহা হইলে সে পূজায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না। যদি বিষ্ণু হইয়া বা বিষ্ণুময় হইয়া বিষ্ণুপূজা করিতে পার, তাহা হইলেই এক দিন সাধক বিষ্ণু-সাযুজ্য বা মহা-বিষ্ণুরূপে পরিণত হইতে পারিবে। 'বাশিষ্ঠ-রামায়ণে' তাই বর্ণিত আছে :—

"অবিষ্ণুঃপূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ ভবেৎ।
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ ॥

'ভারতে' ও তাই বলিয়াছেন :—

"নাবিষ্ণুঃ কীর্ত্তয়েদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
নাবিষ্ণুঃ সংস্মরেদ্বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুমাপ্নুয়াৎ ॥"

'ভবিষ্যে' বলিয়াছেন :—
রুদ্র না হইয়া রুদ্রপূজা করিবে না :—

"নারুদ্রঃ সংস্মরেদ্রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমর্চ্চয়েৎ।
নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমাপ্নুয়াৎ ॥"

'আগ্নেয়ে' বলিয়াছেন :—

"রুদ্রস্য পূজনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃস্যাদ্বিষ্ণুপূজনাৎ।
সূর্য্যঃ স্যাৎ সূর্য্যপূজাতঃ শক্ত্যাদিঃ শক্তিপূজনাৎ ॥"

রুদ্রের পূজা করিলে সাধক রুদ্র হইবেন, বিষ্ণুর পূজায় বিষ্ণু, সূর্য্যের পূজায় সূর্য্য, শক্তির পূজায় শক্তি এবং গণেশের পূজা করিয়া সাধক গণপতি হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে সেই কারণ সাধকের বাহ্যশরীর হইতেই উপাস্য দেবতাময় হইবার জন্য দেবচিহ্ন ধারণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ শিবপূজায়—ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিশূল, বিভূতি, জটাজুট, রুদ্রাক্ষ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ডমরু, নরকপাল ইত্যাদি; বিষ্ণুপূজায়—উর্দ্ধপুণ্ড্র পীত বা শুক্লাম্বর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন, তুলসীমালা, গোপীচন্দন ইত্যাদি; সূর্য্যপূজায়—রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার তিলক, রক্তবস্ত্র, পদ্মবীজমালা ইত্যাদি; গণপতি-পূজায়—পীত বা রক্তবস্ত্র, ত্রিপুণ্ড্র, সর্পসূত্র, যোগদণ্ড প্রভৃতি; শক্তিপূজায়—সিন্দুর কুঙ্কুম-রক্তচন্দনাদিময় অর্দ্ধচন্দ্র বা যন্ত্রতিলক, মুক্ত-কেশ, রক্তাম্বর, ত্রিশূল বা শৈবপরিচ্ছদের ন্যায় সকলই ধারণ করিবে। শৈব ও শাক্তের পরিচ্ছদ প্রায় একরূপ; কারণ 'শিবঃশক্তিরভেদঃ' শিব ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই।

অনেকে বিশেষ ইংরাজি শিক্ষিত নব্য সভ্য সম্প্রদায়, সাধককে এইরূপ তিলকাদি ধারণ করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; কেহ কেহ আবার বলেন—"অন্তরের বস্তু অন্তরে থাকিলেই হইল, বাহিরে তাহার ভণ্ডামি কেন?" ইহার উত্তর আমরা আর কি দিব, সে সকল কথা বলিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, দেবময় হইবার পক্ষে ইহা ভগবানের উপদেশ, তাঁহার কোনও উপদেশ মান্য করিতে হইলে, সকল উপদেশই মানা আবশ্যক। বাহ্য-পরিচ্ছদ যে, তাহার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া দেয় বা পরিচ্ছদানুসারে সকলের অন্তরের বিভিন্ন ভাব পরিকল্পিত হয়, তাহা রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নানাবিধ পরিচ্ছদ হইতেও প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং পূজার্চ্চনায় পরিচ্ছদের বাহুল্যবিধি প্রভূত ফলবিধায়ক। ইহা নৈসর্গিক

বিধান। মানুষ পুঁথিগত শিক্ষাভিমানে বলিয়া থাকেন, মনে মনে তাঁহার চিন্তা করিলেই হইল ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কি মুখের কথায় সেইরূপ মনশুদ্ধি বা ভাব-শুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? পূর্ব্বজন্মের সাধনার্জ্জিত মহাপুণ্যফলে যদি কাহারও সে ভাব হইয়া থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা ! তিনি সত্যই মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সদাশিব, তাঁহার সহিত সকলের তুলনা অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সাধারণ সাধকের পক্ষে এ সকল বিধি অবশ্য পালনীয়, ইহাতে সন্দেহ বা ভাবান্তর নাই। কেবল মুখের কথায় তাহা সম্পন্ন হইবে না। যাঁহারা মুখে বলেন, অন্তরের জিনিস অন্তরে চিন্তা করিলেই হইল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হয় তাঁহারা মহাপুরুষ, অথবা মিথ্যাবাদী বা আত্ম-প্রবঞ্চক। সুতরাং দিন, কাল ও অবস্থা অনুসারে সকল সময় সে পরিচ্ছদ ও তিলকাদি ধারণ অধুনা সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইলে, অন্ততঃ পূজার্চ্চনাকালে তাহার ব্যবহার পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের সাধনা করিতে হইলে, অন্তরে বাহিরে ভগবানের ভাবে তদ্গত হইতে হইবে। ইহাই ভগবান শঙ্করের আদেশ।

সাধক এইরূপে ভাবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও মন্ত্রের শক্তিসমূহ সঞ্চয় করিয়া আচমন হইতে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস ইত্যাদি উত্তরোত্তর কঠিন অনুষ্ঠান সকল সিদ্ধ করিয়া সাধক ক্রমে সাধনার অতি বিমল ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

"কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা কেন বা ন প্রজপ্যতে।
ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাবা ভাবাৎ প্রজায়তে॥"

ওঁ সদাশিব ওঁ॥

পঞ্চমোল্লাস

আদ্যাশক্তি-তত্ত্ব

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যাধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাঃ দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এই দশমহাবিদ্যার মূল আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকা॥ শিবপ্রোক্ত আদ্যাস্তোত্রে স্বয়ং শিব বলিতেছেন :—

'ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতীত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বং অন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপাত্বং সর্ব্ব দেবময়ী তনুঃ॥"

এই আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সাধকের সম্মুখে নিত্যই প্রকাশমানা থাকেন। তবে বিশেষভাবে কোন্ কোন্ সময় সাধকমনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য মা আমার, স্বরূপে প্রত্যক্ষীভূতা হইয়াছিলেন, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইতেছে।

সপ্তশতী চণ্ডীতে উক্ত আছে, শুম্ভনিশুম্ভ-বধোদ্দেশে মহামায়া একবার এই কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এ কথা চণ্ডীতে অতি বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত আছে। তাহা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন।

কালীমূর্ত্তির উৎপত্তি।

বিশ্বামিত্র ঋষি যখন দেবতার উপাসনা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না—তখন পুনরায় মহাযোগী মহেশ্বরকে তপস্যায় তুষ্ট করিলে, মহাদেব উপদেশ করিলেন, "তুমি ভগবতীর একাক্ষরী মন্ত্র বিধিমতরূপে জপ কর, তাহা হইলেই অচিরে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র যথাবিধি দেবীর একাক্ষরী মন্ত্র জপ করিলে, ভগবতী প্রসন্না হইয়া অবন্তীনগরে ব্রহ্মস্বরূপিণী এই দক্ষিণা-কালীরূপে প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া মহর্ষির অভিলষিত ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রেতায় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মহাচীনাচার গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ হইলে, দেবী দক্ষিণামূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। ('আচার-তত্ত্বে' 'দক্ষিণা' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।)

মহামায়ার এই কালীমূর্ত্তি অষ্টবিধা। অষ্টরূপাদেবী 'অষ্টকালী'রূপে প্রসিদ্ধা।

১। দক্ষিণাকালী, ২। সিদ্ধকালী, ৩। উগ্রকালী, ৪। গুহ্যকালী, ৫। ভদ্রকালী, ৬। শ্মশানকালী, ৭। মহাকালী ও ৮। চামুণ্ডাকালী। ইঁহাদের পৃথক পৃথক ধ্যান তন্ত্রমধ্যে লিখিত আছে। মহামায়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাধকগণের মঙ্গলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকা-প্রকৃতির তন্ত্রোক্ত ধ্যান ও ধ্যান-রহস্য সম্বন্ধে গুরুমণ্ডলীর উপদেশানুসারে সংক্ষেপে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বহু জন্মের পুণ্যফলে 'শক্তিজ্ঞান' লাভ হইয়া আদ্যাশক্তি থাকে। শক্তিমান ব্যতীত নির্ব্বাণলাভ হয় না। 'নিরুত্তর-দক্ষিণকালিকা। তন্ত্রে' শিব সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

"শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্॥
বহুনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে।

শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি, নির্ব্বাণং নৈবজায়তে ॥
সা শক্তি দক্ষিণাকালী সিদ্ধবিদ্যা-স্বরূপিণী।
সিদ্ধ বিদ্যাসু সর্ব্বাসু দক্ষিণা প্রকৃতিপুমান ॥"

সেই সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপিণী দক্ষিণাকালী-প্রকৃতি সাধকের সাধনায় সিদ্ধি প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীমদ্দক্ষিণ কালিকা ধ্যান।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধধঃ পাণিকাম্ ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্!
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাংবিস্ফুরিতাননাম্ ॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্ ॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিদাং ॥

ইতি শ্রীকালিকাতন্ত্র ॥

ভাবার্থ :—মূলশক্তি দক্ষিণকালিকাদেবী করালবদনা ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা এবং চতুর্ভুজা। তাঁহার গলে মুণ্ডমালা এবং বাম-ভাগের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ, দক্ষিণ ভাগের ঊর্দ্ধহস্তে অভয় ও অধোহস্তে বরপ্রদা মুদ্রা রহিয়াছে। দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী বা নগ্না। তাঁহার গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে রুধিরধারা পড়িয়া সর্ব্বশরীর রঞ্জিত হইয়াছে এবং কর্ণদ্বয়ে দুইটী শর বা বাণ * কর্ণাভরণরূপে শোভিত রহিয়াছে, তাঁহার দন্তশ্রেণী অতীব ভীষণ, স্তনদ্বয় স্থূল ও পীণোন্নত (পয়োমৃত পূর্ণ)। শব-হস্তগুলি কাঞ্চিরূপে কটিদেশে বিরাজমান রহিয়াছে। কালিকাদেবী হাস্যমুখী, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় হইতে রক্তধারা পতিত হইতেছে, তাহাতে তদীয় বদনমণ্ডল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দেবীর রব অতীব গম্ভীর, তাঁহার আবাসস্থান শ্মশানভূমি এবং নেত্রত্রয় প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। দন্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত, মুক্ত কেশপাশ দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বব্যাপী। দেবী শবরূপী শিবের উপর সংস্থিতা আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে এবং তিনি মহাকাল সদাশিবের সহিত বিপরীতভাবে রতিক্রিয়ায় আসক্তা রহিয়াছেন, তাহাতে তদীয় মুখকমল সুখ-প্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বকামনা ও সমৃদ্ধিপ্রদায়িনী দেবী কালিকার ধ্যান করিবে।

নিরুত্তরতন্ত্রে দেবীর ধ্যান নিম্নোক্ত প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়—

ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং ঘোররাবাং চতুর্ভুজাম্॥

---

* অনেকে 'শরযুগ্ম' শব্দের পরিবর্ত্তে 'শবযুগ্ম' বলেন। বহু আলোচনায় জানা গিয়াছে, লিপিকার দোষে শয়ের বিন্দু পতিত হওয়ায় 'শর' শব্দের স্থানে 'শব' এইরূপ পাঠ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে শর বা বাণ দেবীর কর্ণাভরণরূপে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, এই বাণের পশ্চাতে শকুনি পক্ষীর পক্ষ বা পালক আবদ্ধ আছে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

সম্ভশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধঃ করাম্বুজাম্ ।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্ ॥
পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ।
শবানাংকরসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্ ॥
দিগম্বরীং মুক্তকেশীং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্ ।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্ ।
মহাকালেন চ বিপরীতরতাতুরাম্ ।
মদিরাঘুর্ণনয়নাম্ স্মেরানন সরোরুহাম্ ॥
অট্টহাস্যং মহারৌদ্রীং সর্ব্বদানন্দকারিণীং ।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥

ইহার ভাবার্থ ও প্রায় পূর্ব্বোক্ত ধ্যানের ন্যায় । অতি সামান্য প্রভেদ যাহা আছে, মূল পাঠেই তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন, সুতরাং ইহার স্বতন্ত্র ভাবার্থ প্রদত্ত হইল না । যাহা হউক দেবীর এই গভীর রহস্যপূর্ণ ধ্যান যাহার মূল ও সাধারণ অর্থ বর্ণিত হইল, তাহার রহস্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দুই একটী কথা বলিবার আছে। যাহা না বুঝিলে সাধকের তাহা ভাল বোধগম্য হইবে না ।

সাধনার ক্রম-বিধান।

অল্পমতি, দ্বন্দ্বপরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্বেষী এবং অদূরদর্শী মানব, আর্য্যকে প্রথমে মূর্ত্তিপূজক, পরে পৌত্তলিক আদি নানাবিধ বাক্যে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ কোনও দোষারোপ করিতে পারা যায় না। কারণ যে ব্যক্তির যেমন বুদ্ধি অথবা যিনি ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তিনি তাহাতেই পর্য্যাপ্ত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সুতরাং সে বিষয় আলোচনাকালে তাঁহার বোধাতীত বিষয় তিনি কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম

করিবেন ? আজকাল বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সাধনার প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি পণ্ডশ্রম বোধে পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সেই মনোবুদ্ধির অগোচর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপাসনা, তাঁহার ধ্যান বা ধারণা করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। ফলে, তাঁহারা ভগবত্তত্ত্বামৃতের কোন আস্বাদই প্রাপ্ত হন না ; কেবল চীৎকার করিয়া নিজ বুদ্ধিমত্তা ও প্রাধান্য রক্ষা করিতে দেহপাত করেন এবং ক্রমাগত তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ ও মত খণ্ডনাদিই তাঁহাদের ভগবত্তত্ত্বালোচনার সারাংশরূপে পরিণত হইয়া পড়ে।

সকলেরই সাধ আমি "তাঁহারে" বুঝিব ; সেই অনাদি ও অনন্ত শক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিব। কিন্তু সাধনামার্গে প্রবিষ্ট হইয়াই কে কবে তাঁহার অনুসন্ধান পাইয়াছেন ? এই কারণ মহাজনবাক্যে উক্ত আছে—"বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর।" বাস্তবিক বিশ্বাসই মানবের সর্ব্বপ্রথম অবলম্বন —বিশ্বাস হইতে ভক্তির আবেগ এবং ভক্তি হইতেই ভগবচ্ছক্তিজ্ঞানের সামর্থ্য আইসে। মানব যে কোনও মার্গ অবলম্বন করিয়া এবং শাস্ত্রীয় শাসনে অনুশাসিত হইয়া কার্য্য করিলে, সময়ে তাহার প্রকৃত ফল অবশ্যই উপলব্ধি হইবে। নতুবা কেবল সাম্প্রদায়িক নিন্দাবাদে নিজ অনিষ্ট ব্যতীত অন্য কোন আশা নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"। ভগবত্তত্ত্ব-রহস্য-কথা নিজ সুকৃতি, ক্রিয়া-সাধনা, সত্যনিষ্ঠা ও উপযুক্ত গুরুর কৃপা ব্যতীত উপলব্ধি করিবার বিন্দুমাত্রও আশা নাই। বিশেষ যাহা কেবলমাত্র সাধনার সাহায্যে হৃদয়মধ্যে অনুভব করিতে হয়, যাহা অব্যক্ত, তাহা ব্যক্ত বা ভাষায় প্রকাশ হইবে কি করিয়া ? তবে সে রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাষমাত্র পরে প্রদত্ত হইবে। তাহাতে সত্যনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ হইতে পারে।

পরমা-প্রকৃতি-রহস্য যে সাধনার ধন এবং চপলমতি মানবের দুর্ব্বোধ্য, তাহা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। উহা তার্কিকের তর্কের উপাদান

নহে। ধীরচিত্তে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সমাপন করিয়া আত্মশক্তির রহস্যমার্গে উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং এ গভীর রহস্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী সহজ রহস্য উদ্‌ঘাটন না করিলে সাধারণের পক্ষে ইহা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সাধনার যে ক্রম-বিধান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে অতীব চমৎকার। পুষ্পচন্দনাদি লইয়া পঞ্চদেবতার পূজা ও তৎসহ আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও অঙ্গন্যাস ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে প্রাণায়ামাদি অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়গুলি সমস্তই গভীর বিজ্ঞানসম্মত অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য স্থূল বিজ্ঞান-আলোকেও তাহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই আজ শত-সহস্র পাশ্চাত্য-সাধকের সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন কি অনেক বিষয় তাঁহারা তাঁহাদিগের সাধারণ ক্রিয়ার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াও লইতেছেন। সুতরাং প্রোক্ত সাধারণ নিত্যকর্ম্মের অভ্যাসও সাধনামার্গের সর্ব্বপ্রথম করণীয় ও অত্যন্ত সহায়ক। প্রত্যেক মানব সকল শাস্ত্রের সকল রহস্য আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিতে অপারক হইবে বলিয়াই কতকগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়া পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণ জীবের বিশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। নিত্যক্রিয়ার ফলে মানব কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলে, যোগাদি উচ্চতর সাধনার দ্বারা মানব ক্রমে ক্রিয়াতীত হইতে থাকেন। তখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল তাঁহার উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই মানব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। গুরুকৃপায় সেই সময় বেদ-তন্ত্র হইতে নিজ নিজ অধিকারানুরূপ তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিয়া সাধক ব্রহ্মশক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। যে সাধক স্থির ও ধীর ভাবে সেই সুগভীর ব্রহ্ম-সমুদ্রে যতই ডুবিতে পারেন, তিনি ততই অমূল্য অপরিসীম রত্নরাজি লাভ করিতে থাকেন। নতুবা বৃথা তর্ক-বিতর্ক সেই সাধন-সমুদ্রের তরঙ্গমালারূপে সাধনাকাঙ্ক্ষীকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ফলে তাহার আর রত্না-

হরণ হয় না। রত্ন, গভীর জলধি-গর্ভেই নিহিত থাকে। সেই কারণ সনাতন সাধন-তত্ত্বে সাধনার ক্রমবিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; তাহা দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া অবহেলা করিয়া একেবারে কাহাকেও উচ্চ সাধনামার্গে প্রবেশাধিকার দেন নাই। গর্ভাধান, পুংসবন হইতে জাতকর্ম্ম ক্রমে উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার যেমন জীবের উন্নতিপ্রদ অনুষ্ঠান; দুর্গোৎসব, দীপালী, রাস, দোল প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ আত্মোন্নতি-কর নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সকলের মধ্যে "দুর্গাপূজা উৎসবকে" বোধ হয় আমাদের দেশে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহপ্রদ অতি প্রাচীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিতে পারা যায়। এই দুর্গাপূজার এতাধিক উৎসব ও আনন্দ কেন এবং এই পূজার উদ্দেশ্যই বা কি? সে ভাব কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আত্মারহস্য-বোধ কিয়ৎ পরিমাণে সুগম হইবে বলিয়া মনে হয়।

দুর্গাপূজা-রহস্য।

শারদীয়া দুর্গাপূজা হিন্দু মাত্রেরই করণীয়। আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত ভারতের এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে হিন্দু নামধারী শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব অথবা গাণপত্য যে কেহ হউক শারদীয়া মহোৎসব উপলক্ষে নবরাত্র, সপ্তরাত্র, অন্ততঃ ত্রিরাত্রও সেই দেবীমাহাত্ম্যরূপ মহামায়ার সপ্তশতী-চণ্ডীর পূজা, আরাধনা বা এই উৎসবে যোগদান না করিয়া থাকেন। দুর্গতিহারিণী শ্রীশ্রীদুর্গার এই পূজা সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থমাত্রেরই করণীয়। ইহা দ্বারা গৃহস্থের সার্ব্বাঙ্গীন কুশল হয় ও সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হয়। রঘুকুলতিলক দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতায় রাবণবধোদ্দেশে অভিযান করিলে রণপ্রাঙ্গণে যখন মহাপরাক্রান্ত দশাননকে মহাশক্তি-ক্রোড়ান্বিত বা মহাশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—তখনই তিনি আর বৃথা কাল-বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় আত্মতত্ত্বে সেই অনন্ত শক্তির সঞ্চার বা সেই শক্তির সাধনাকল্পে নিজেই মনোযোগী হইলেন, তিনি অকালে অর্থাৎ সেই অবস্থাতেই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে বসিলেন—

নহে। ধীরচিত্তে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি সমাপন করিয়া আত্মাশক্তির রহস্যমার্গে উপস্থিত হইতে হয়। সুতরাং এ গভীর রহস্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী সহজ রহস্য উদ্ঘাটন না করিলে সাধারণের পক্ষে ইহা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ সাধনার যে ক্রম-বিধান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে অতীব চমৎকার। পুষ্পচন্দনাদি লইয়া পঞ্চদেবতার পূজা ও তৎসহ আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, জলশুদ্ধি ও অঙ্গন্যাস ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়া হইতে প্রাণায়ামাদি অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়গুলি সমস্তই গভীর বিজ্ঞানসম্মত অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য স্থূল বিজ্ঞান-আলোকেও তাহার মর্ম্ম কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই আজ শত-সহস্র পাশ্চাত্য-সাধকের সে বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন কি অনেক বিষয় তাঁহারা তাঁহাদিগের সাধারণ ক্রিয়ার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াও লইতেছেন। সুতরাং প্রোক্ত সাধারণ নিত্যকর্ম্মের অভ্যাসও সাধনামার্গের সর্ব্বপ্রথম করণীয় ও অত্যন্ত সহায়ক। প্রত্যেক মানব সকল শাস্ত্রের সকল রহস্য আয়ত্ত করিয়া কার্য্য করিতে অপারক হইবে বলিয়াই কতকগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়া পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্যগণ জীবের বিশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। নিত্যক্রিয়ার ফলে মানব কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলে, যোগাদি উচ্চতর সাধনার দ্বারা মানব ক্রমে ক্রিয়াতীত হইতে থাকেন। তখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল তাঁহার উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই মানব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। গুরুকৃপায় সেই সময় বেদ-তন্ত্র হইতে নিজ নিজ অধিকারানুরূপ তত্ত্বসমূহ সংগ্রহ করিয়া সাধক ব্রহ্মশক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন। যে সাধক স্থির ও ধীর ভাবে সেই সুগভীর ব্রহ্ম-সমুদ্রে যতই ডুবিতে পারেন, তিনি ততই অমূল্য অপরিসীম রত্নরাজি লাভ করিতে থাকেন। নতুবা বৃথা তর্ক-বিতর্ক সেই সাধন-সমুদ্রের তরঙ্গমালারূপে সাধনাকাঙ্ক্ষীকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ফলে তাহার আর রত্না-

হরণ হয় না। রত্ন, গভীর জলধি-গর্ভেই নিহিত থাকে। সেই কারণ সনাতন সাধন-তত্ত্বে সাধনার ক্রমবিধান বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন; তাহা দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া অবহেলা করিয়া একেবারে কাহাকেও উচ্চ সাধনামার্গে প্রবেশাধিকার দেন নাই। গর্ভাধান, পুংসবন হইতে জাতকর্ম্ম ক্রমে উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার যেমন জীবের উন্নতিপ্রদ অনুষ্ঠান; দুর্গোৎসব, দীপালী, রাস, দোল প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ আত্মোন্নতিকর নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সকলের মধ্যে "দুর্গাপূজা উৎসবকে" বোধ হয় আমাদের দেশে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহপ্রদ অতি প্রাচীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিতে পারা যায়। এই দুর্গাপূজার এতাধিক উৎসব ও আনন্দ কেন এবং এই পূজার উদ্দেশ্যই বা কি? সে ভাব কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আত্মারহস্য-বোধ কিয়ৎ পরিমাণে সুগম হইবে বলিয়া মনে হয়।

দুর্গাপূজা-রহস্য।

শারদীয়া দুর্গাপূজা হিন্দু মাত্রেরই করণীয়। আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত ভারতের এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে হিন্দু নামধারী শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব অথবা গাণপত্য যে কেহ হউক শারদীয়া মহোৎসব উপলক্ষে নবরাত্র, সপ্তরাত্র, অন্ততঃ ত্রিরাত্রও সেই দেবীমাহাত্ম্যরূপ মহামায়ার সপ্তশতী-চণ্ডীর পূজা, আরাধনা বা এই উৎসবে যোগদান না করিয়া থাকেন। দুর্গতিহারিণী শ্রীশ্রীদুর্গার এই পূজা সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থমাত্রেরই করণীয়। ইহা দ্বারা গৃহস্থের সার্ব্বাঙ্গীন কুশল হয় ও সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট হয়। রঘুকুলতিলক দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতায় রাবণবধোদ্দেশে অভিযান করিলে রণপ্রাঙ্গণে যখন মহাপরাক্রান্ত দশাননকে মহাশক্তি-ক্রোড়াম্বিত বা মহাশক্তিসম্পন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—তখনই তিনি আর বৃথা কাল-বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় আত্মতত্ত্বে সেই অনন্ত শক্তির সঞ্চার বা সেই শক্তির সাধনাকল্পে নিজেই মনোযোগী হইলেন, তিনি অকালে অর্থাৎ সেই অবস্থাতেই মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে বসিলেন—

দেবী, তাঁহার উৎকট সাধনা ও অকৃত্রিম ভক্তির পরীক্ষা করণোদ্দেশে তৎসঙ্কল্পিত অষ্টাধিকশত নীলোৎপলের একটী কমল মায়াদ্বারা লুপ্ত করিলেন—তাহাতে শক্তি-সিদ্ধ রাঘবেন্দ্র ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত ও হতাশ হইয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে নীলোৎপলনিভ নিজ দক্ষিণ নয়নটী উৎপাটিত করিয়া যখন তাঁহার সঙ্কল্পিত পূজা পূর্ণ করিতে দৃঢ়ব্রত হইলেন—তখন দেবী আর অপ্রকটা থাকিতে পারিলেন না, রাবণকে মায়ামোহে আচ্ছন্ন করিয়া অকালে সেই নরনারায়ণসমীপে স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। তদবধিই অকালে শরৎঋতুতে দুর্গাদেবীর এ হেন পূজার উৎসব হইয়া থাকে। এই দুর্গাদেবীই আবার কাত্যায়ণী নামে প্রসিদ্ধা। দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার লীলা সহচর ও সহচরীবৃন্দ সকলেই সেই কাত্যায়ণীর আরাধনা করিয়াছিলেন।

যখন নারায়ণ স্বয়ং সেই শক্তির সাধনা করিয়া জগতে তাঁহার উদ্বোধন ও আবির্ভাব করিয়া গিয়াছেন, তখন তাহা কেবল সম্প্রদায় বিশেষরই বা আরাধ্য বস্তু হইবে কেন? সেই কারণ সেই অতীতকাল হইতেই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকের মধ্যে দুর্গোৎসবের এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

শোকতাপক্লিষ্ট সংসারের মানব সারা বৎসর সংসারের অদম্যতাড়নে তাড়িত হইয়া বৎসরের মধ্যে কয়দিবসমাত্র মহাশক্তির আরাধনা-উৎসবে নবশক্তি সঞ্চারের অবসর পায়। যেমন গৃহস্থের বহুবিধ সামগ্রী গো-শকটে দূরস্থিত স্থানান্তরে পাঠাইতে হইলে, সামগ্রীগুলি রজ্জুসহ শকটের সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিতে হয়, কিন্তু কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতে সেই রজ্জু যেমন সতত নাড়া চাড়ায় আপনাপনিই শিথিল হইয়া পড়ে, তখন সেই রজ্জু পুনরায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিবার আবশ্যক হয়—আধিব্যাধিগ্রস্ত দুর্ব্বলচিত্ত মানব তেমনি সংসারপথে নানা বাধাবিঘ্নসহ কর্ম্মরাশি পৃষ্ঠে লইয়া যাইতে যাইতে ধর্ম্মরজ্জুরূপ সেই ভগবদ্‌লক্ষ্য ভ্রষ্ট বা শিথিলভক্তি হইয়া

পড়ে, তাই বৎসরের মধ্যে একবার সমবেত কণ্ঠে মা মা রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া সেই দুর্ব্বল দেহে বলসঞ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগবদ্‌-বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অবসর পায়।

এই দুর্গাপূজা সত্ত্বানুগত সম্পূর্ণ রাজসিক উপাসনা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু নরপতি, জমিদার বা অবস্থাপন্ন ক্ষমতাশালী গৃহস্থ-ব্যক্তিগণ শক্তি বা সামর্থ্য-সাধনায় দুর্গাপূজা করিতেন। ইহা সাধারণতঃ ভিখারী বা সন্ন্যাসীর উপাস্যা নহে, বা সেরূপ ব্যক্তির দ্বারা ইহার সাধনা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু ইনিই আবার একজটেশ্বরী তারারূপে যোগীসন্ন্যাসীর উপাস্যা হইয়া থাকেন।

মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গার ধ্যান পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ধন-ধান্যসম্পন্না সংসারের যেন পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি বা সংসার-প্রকৃতির একখানি প্রত্যক্ষ জীবন্ত চিত্র। তিনি গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিকরূপ পুত্র ও কন্যাগণ পরিবৃতা হইয়া আত্মশক্তি বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার এই পূজা-ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথমে বিঘ্নবিনাশন সিদ্ধিদাতা শ্রীগণপতির পূজা করিতে হয়, ইনি সাধকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন। ভক্ত গৃহী, সংসারের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভাশায় গণপতিকে আরাধনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে মনে দৃঢ় আশা বা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে সিদ্ধি-লাভের সংশয়বিহীন সঙ্কল্প না থাকিলে, মানব সময়ে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। তাহার পর লক্ষ্মী—গৃহস্থ, গৃহের শ্রীসম্পাদনার্থে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের আরাধনা করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীর কৃপা ব্যতীত সংসার অরণ্য, লোক-সমাজে মানবকে অতি হেয় হইয়া পড়িতে হয়। সংসারে লক্ষ্মীর সমাদর সর্ব্বাগ্রে, ভাগ্যবান ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট প্রায় সকলেই অবনত। সাংসারিক ব্যাপারে অর্থে সকলেই বশীভূত হয়, সুতরাং শ্রীসম্পন্ন ধনীর দ্বারে প্রায় সকলকেই সতত আসিতে হয়। আর এক কথা—গৃহস্থের সঙ্কল্পিত কোন কার্য্যই ঐশ্বর্য্য ব্যতীত সুসম্পন্ন

বা তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না, সেই কারণ লক্ষ্মীর আরাধনা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার সাধনায় গৃহীর দ্বিতীয় কার্য্য। তৎপরে জ্ঞান বা জ্ঞান প্রদায়িনী শ্রীশ্রীসরস্বতীর আরাধনা—তিনি বাগ্দেবী, সাক্ষাৎ বুদ্ধি-বিদ্যাস্বরূপিণী। তাঁহার কৃপা ব্যতীত সংসারে সদসৎ বিচার ও ভগবৎ বিদ্যালাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এই হেতু সেই "নিজকর-কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক শ্রীঃ" সরস্বতীর আরাধনা দুর্গা-শক্তিসঞ্চয়ের জন্য তৃতীয় সাধনা। অনন্তর সুর-সেনাপতি শ্রীকার্ত্তিকেয়ের পূজা করিতে হইবে। সংসারী গৃহস্থের বল, বীর্য্য ও সাহস সঞ্চয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা প্রতি পদবিক্ষেপে তাহাকে নানা বাধা বিঘ্ন সহ্য করিতে হয়।

যখন (১) সিদ্ধি, (২) অর্থ, (৩) বিদ্যা ও (৪) সামর্থ্য ভক্তের করায়ত্ত হইল, তখনই তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গার কৃপায় দুর্গা-পূজায় অধিকারী হইলেন ; তখনই সেই কামাদি রিপুদলের একত্র সমাবেশ প্রবৃত্তির আধার মহিষাসুরকে দেবীবাহন বিবেকরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন সিংহ-দ্বারা আক্রান্ত করিলেন। সংসারী গৃহস্থের সুরপূজার সহিত অসুরপূজাও আবশ্যক, তাই মহিষাসুরের পূজা, শক্তিশালী গৃহস্থের অবশ্য-করণীয়। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদলের এককালীন বিনাশ ত গৃহস্থের বাঞ্ছনীয় নহে? গৃহস্থের পক্ষে কাম ও ক্রোধাদি সকলেরই সেবা অল্পাধিক করিতে হয়। সময়ে কাম বা কামনা, ক্রোধ ও লোভাদির প্রকাশ, অথবা তাহাদের সেবা না করিতে পারিলে, সংসারে মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি রক্ষা হয় না। তবে দেবীর কৃপায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া সেই রিপুদলকে সতত নিজ আয়ত্তমধ্যে রাখিতে হয়, যেন তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও গৃহস্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারে। ইহাই দুর্গাসাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য। সংসারে ধর্ম্মার্থ কাম এবং অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তিই দুর্গাসাধনা বা দুর্গাপূজারহস্য। দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তির সাধনা সেই কারণ গৃহীমাত্রেরই করণীয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুর্গা মহাবিদ্যা তারারই রূপান্তর দেবতা। দুর্গা এবং

তারা উভয়ই 'জটাজুট-সমাযুক্তা' (পূজাপ্রদীপে শ্রীশ্রীদুর্গার ধ্যান দেখ)। 'জটা' আকাশতত্ত্ব বাচক। তারার ধ্যানান্তরে লিখিত আছে—'খং লিখন্তি জটামেকাং।' আবার সুমেরু শিখরকেও জটা বলে। মহা-প্রকৃতি মায়ের জটাজাল স্থূল বা প্রত্যক্ষ ভাবে আকাশাত্মক জগতের সর্ব্বোচ্চ অচল শিখর। তিনি 'অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্' অর্থাৎ তাঁহার সেই জটাজাল-সমন্বিত শিখরদেশ অর্দ্ধ-ইন্দু বা অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সুশোভিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার পূজাকালে অর্থাৎ শরৎ বা বসন্ত ঋতুতে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘরাগযুক্ত আকাশমণ্ডলের মধ্যে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর চন্দ্র স্পষ্টভাবে অর্দ্ধ অংশই পরিলক্ষিত হয়। শারদীয় পূজা আশ্বিন মাসে হইয়া থাকে। তখন সঙ্কল্প-বাক্যে 'আশ্বিনে মাসি কন্যা রাশিস্থে ভাস্করে' বলিতে হয়। মার ধ্যানে বলা হইয়াছে—তাঁহার দক্ষিণপদের সিংহের উপর সংস্থিত এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ মহিষাসুরের উপর বিন্যস্ত। তিনি মহাশক্তি-স্বরূপিণী নারীরূপা তখন সমরাভিযানতৎপরা বা সমররতা—সুতরাং নারীসুলভ বামপদ যেন অগ্রবর্ত্তিণী হইয়া আছেন, দক্ষিণপদ সিংহের উপর হইতে তখন উঠান নাই। তিনি প্রাকৃতিক ভাবে মহাকন্যা বা কন্যারূপিণী, তাই কন্যারাশিস্থ আশ্বিন মাস তাঁহার পূজার কাল, তদব্যবহিত পূর্ব্বেই সিংহরাশি ব্যতীত হইয়াছে। মা তাই সিংহ পৃষ্ঠে আগমন করিয়াছেন। মা লোচনত্রয়সংযুক্তা অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞা বিশ্বরূপিণী। তাঁহার অতসী পুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ অঙ্গরাগ, অর্থাৎ তিনি সত্ত্বগুণাধিক্য রজোগুণযুক্ত হইয়া সাধকের ধ্যেয়া। রজোগুণে অসুরবিনাশাদি কর্ম্মময় সাধনা এবং সত্ত্বগুণে মুক্তিপ্রদ আনন্দের বিকাশ। দুর্গাসাধক ভোগ মোক্ষ উভয়ই যে প্রার্থনা করে। মা আমার মহিষাসুর মর্দ্দিনী—মহিষ যে অসুর স্বরূপ তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, মহিষ আবার যমের বাহন অর্থাৎ সাক্ষাৎ মৃত্যু। মা সাধকের সেই মৃত্যুভয়-নিবারিণী। তিনি 'ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানং' অর্থাৎ ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপিণী।

তিনি দশবাহু সমন্বিতা—তাঁহার দশটি বাহু উত্তরাদি দশদিকের নির্দ্দেশক, প্রতিকল্পেই দেবী অসুর বিনাশার্থ এইরূপে আবির্ভূতা হন। "আবির্ভূতা দশভূজাদেবী দেবহিতায় বৈ।" ইন্দ্রাদি দশদিকপালগণের তেজশক্তি, তাঁহার দশটী আয়ুধযুক্ত। (১) ত্রিশূল—ইহা মহাকালের অস্ত্র, সপ্তমাঙ্গের প্রণবের পঞ্চ অঙ্গের সমষ্টিভূত সর্ব্বময়ত্ব ভাববোধক। (২) খড়্গ—মহাকালের অন্তর্গত খণ্ডকালের জ্ঞাপক। (৩) চক্র—ব্রহ্মের চরাচরে সর্ব্বত্র-ব্যাপক চৈতন্য-শক্তির বিনির্দ্দেশক বিষ্ণুচক্র। (৪) বাণ—বায়ুর স্বরূপতা জ্ঞাপক। (৫) শক্তি—বজ্র। (৬) খেটক—যমের স্বরূপবাচক। পাশ—বরুণের প্রভাবিকাশক। (৭) অঙ্কুশ ও (৮) ঘণ্টা—ইন্দ্রের বাচক। (৯) পরশু—বিশ্বকর্ম্মার ভাববোধক। (১০) নাগপাশ—নাগ অনন্তস্বরূপ, পাশ বন্ধন অর্থাৎ অনন্ত বন্ধন। সিংহ—পূর্ণজ্ঞান।

দুর্গাপূজা ব্যপদেশে সাধক প্রকৃতিস্বরূপ। মহামায়াকে আদর্শরূপে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে রিপুবিজয় কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকেন! আর ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ ফললাভার্থ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

এই কার্য্যে 'সন্ধিপূজা' একটি বিশেষ সাধনাঙ্গ। সন্ধি অর্থে দুইটী বস্তুর মিলনস্থান। অষ্টমী ও নবমীর মিলনবিন্দুকেই সন্ধিক্ষণ বলে। সেই সময় মহিষরূপী অসুর 'বিশিরস্ক' হইয়াছিল অর্থাৎ তাহার মুণ্ড ছেদিত হইয়াছিল। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন "পাশবদ্ধ অবস্থাই জীবের জীবত্ব এবং পাশমুক্ত অবস্থা তাহার শিবত্ব বা দেবত্ব।" সাধক পশুপাশে সদাই আবদ্ধ আছে, তাহার সেই পাশ ছেদন না হইলে মুক্তি নাই। পাশ অষ্টবিধ তাহা 'জ্ঞানপ্রদীপাদির' অনেক স্থলে বলিয়াছি। আবার 'জ্ঞান-প্রদীপেই' "কলাভেদে সৃষ্টিক্রম ও অবতার রহস্যাদি" বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। পাঠক তাহা এবারও দেখিয়া লও। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে চন্দ্রের ষোড়শ কলার ন্যায় জীবদেহ বা লৌকিক জগতে শ্রীভগবানের ষোলকলাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পশুপাশবদ্ধ

জীবমায়া অষ্ট অংশ বিশিষ্ট সেই ষোড়শকলার প্রথম অর্দ্ধাংশ এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ সেই ষোড়শকলার অবশিষ্ট অষ্ট অংশ, তাহা উক্ত অষ্টবন্ধন বিমুক্ত দেবত্ব বা শিবত্বেরই অন্তর্গত। সুতরাং জীব-শিবের মিলনস্থান অষ্টম কলার শেষাংশ ও নবম কলার প্রথমাংশ বলিতে হইবে। দুর্গাপূজার সময় অষ্টমী তিথির অন্তে এবং নবমী তিথির আরম্ভে বা উভয়ের মিলনজাত সন্ধিক্ষণেই সাধক অষ্টপাশ ছেদনের আশায় জীববন্ধন বা কামাদিপূর্ণ জীবাভিমান নাশ করিবার জন্য প্রচণ্ডভাবে দুর্গারূপিণী চামুণ্ডার আরাধনা করিয়া থাকেন। সাধক কায়মনে সেই জগজ্জননী সর্ব্বদুঃখহারিণী মায়ের সন্ধিপূজা উপলক্ষ্য করিয়া নিজ জীব ও অসুরের সমষ্টিবদ্ধ অতি দুর্গম ও ভীষণ মোহ দুর্গভেদ করে। পুনঃ পুনঃ নিতান্ত শরণাগত দীন ও আর্ত্তভাবে তাঁহার করুণা প্রার্থনা কর। তিনি অচিরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

যে মহাশক্তির অনুশাসনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রধাবিত, সূর্য্য চন্দ্রে দীপ্তি প্রকাশিত, মেদিনী অনন্ত প্রসবিণী-শক্তি সমন্বিত, সেই ব্রহ্মপদবাচ্য মহাশক্তি কাহার না ধ্যেয়? ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি সহযোগে পূজাসনে বসিয়া সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ধ্যান না করিলেও অলক্ষিতে সকলেই ত সেই মহামায়ারই সেবায় চিরনিযুক্ত। সংসারের জীব এমন কে আছে, যাহার মনে সঙ্কল্প বা প্রাণে আশা নাই, এবং তাহার অন্তরে সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা নাই? সুতরাং প্রায় সকলে মনের অগোচরেই ত সেই সিদ্ধি—শক্তির আরাধনা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য বা লক্ষ্মীর আরাধনা বা সেবা অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনের জন্য কি না করিতেছেন। তাহার পর বিদ্যচ্ছক্তিলাভের জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য সকলই করিতেছেন। সাহস, সামর্থ্য বা বীর্যলাভের জন্য দিবারাত্র চেষ্টা বা তাহার আরাধনা হৃদয়মধ্যে বলবতী রহিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও বীর্য্যলাভের চেষ্টা যে যথাক্রমে গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিকেয় পূজা তাহা কি পুনরায় বলিতে হইবে? আবার এই সকল বিষয় আয়ত্ত হইলেও অসুরাচারী

হইলে নিস্তার নাই, তখনই তাহার পতন অনিবার্য্য। ইহা অবধারিত সত্য। এই হেতু ভারতসন্তান যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও সাক্ষাৎভাবে সেই মহাশক্তির পূজা বা আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। সেই মহাশক্তি সাধনায় যথেষ্ট ক্রটী হইয়াছে বলিয়াই, আজ আমরা সভ্য সমাজে এত হেয়, লৌকিক জগতে এত লাঞ্ছিত ও সংশয়-মোহে সতত সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

মূর্ত্তি-পূজক কে?

যে মূঢ়, মহামায়ার এহেন মূর্ত্তি দেখিয়াও যেন অন্ধভাবে আমাদিগকে মূর্ত্তি-পূজক অর্থে পৌত্তলিক বলিতে কুণ্ঠিত না হয়, তাহার ভগবচ্ছক্তিজ্ঞানলাভের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে দৃঢ়চিত্তে বলিতে পারে—'আমি মূর্ত্তি-পূজক নহি,—তাহাকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করি—সে হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ হউক, অথবা মোসলমান, খ্রীষ্টান বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক স্থিরচিত্তে নিজ বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া অপক্ষপাতে বলুক দেখি—তাহার হৃদয়ের সেই নিভৃত প্রদেশে ভগবানের বা তাঁহার অংশস্বরূপের কোন ঐশ্বরিক শক্তির চিত্র বা মূর্ত্তি তিনি পোষণ করেন কি না? নিরুত্তরই' ইহার একমাত্র উত্তর বলিয়া সাধকগণ বুঝিয়া লন, আর তখন বলেন 'মূর্ত্তি-পূজক কে'? অনেক দিনের পর একটী কথা মনে পড়িল,—যখন কলিকাতায় সবে অশ্বচালিত ট্রাম গাড়ীর প্রথম প্রচলন হয়, তখন একদিন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে পশ্চিম মুখে গমন-রত একখানি ট্রামে উঠিয়াছি এমন সময় একটী ইংরাজও উঠিয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন। অল্পক্ষণেই গাড়ী বহুবাজারের মোড় ছাড়াইয়া কালী-মন্দিরের সম্মুখে আসিল, আমি দেবীকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিলাম। ইংরাজ ভদ্রলোকটী তাহা দেখিয়া একটু বিদ্রূপ করিয়া হাসিলেন ও বিদ্রূপাত্মক কয়েকটী কথাও বলিলেন। আমি কোন কথা বলিলাম না। কিয়ৎপরে গাড়ী লালবাজারের মোড়ে আসিলে গির্জ্জা দেখিয়াই তিনি মাথার টুপি নামাইয়া অবনতমস্তক হইলেন। তখন আমি বলিলাম কাহাকে প্রণাম

করিলেন ? তিনি বলিলেন আমাদের গির্জ্জা। আমি বলিলাম কতকগুলি ইট কাঠ মশলা ছাড়া ইহাতে আর ত কিছু নাই। সকল বাড়ীই ত এইভাবে তৈয়ারী তবে, এখানে প্রণত হইবার কারণ কি ? আমি ইতিপূর্ব্বে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে যাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলাম, এখানে সেরূপ ভাবের ঈশ্বরভাব বোধক কোন চিহ্নও ত নাই। তবে কেন প্রণাম করিলেন ইত্যাদি ভাবে যখন বলিতে লাগিলাম তখন ভদ্রলোকটী নির্ব্বাক হইয়া তখনই নামিয়া পড়িলেন।

কে জানে—আর্য্যের প্রায় সকল দেবতা প্রফুল্ল কমলাসনে সমাসীন কেন ? যে কমল কোমলতার স্বরূপ ও আধার, একটী ক্ষুদ্র মক্ষিকা বসিলে যে কমলদল অবনত হইয়া যায়—সেই স্থকোমল প্রফুল্ল সরোজই যখন দেবতার আসন, তখন কি বুঝিতে হইবে, আর্য্যের দেবতা পঞ্চভূতাত্মক জড়ের উপাদানে কল্পিত ? ভ্রান্ত, তর্কপর মানব! আর্য্যের দেব-কল্পনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পার নাই! তাহা সর্ব্বোন্নত আর্য্য-দর্শনের গভীর গবেষণা ও অদ্ভুত উদ্দেশ্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ফল। আহা! সে দেব-মূর্ত্তিগুলির কোনই পরিমাণ নাই, বা তাহার ভূতাত্মক তিলমাত্রও ঘনত্ব নাই; তৈজসাত্মক দেবতার কমলাসন তাহারই প্রমাণ প্রদান করিতেছে। মুখে 'অবাঙ্মনসোগোচর' বলিতে সহজ হইলেও, তোমার ঐ অপুষ্ট ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে একেবারে সে বিরাট ব্রহ্মের ধ্যান বা কল্পনা সম্পূর্ণ অসম্ভব—সেই কারণ পূজ্যপাদ ঋষিবৃন্দ ভগবদ্ সাধনায় ঐ ক্রমোন্নত পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। যখন সাধনার ফলে হৃদয় দৃঢ়, মস্তিষ্ক সুপুষ্ট ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে, তখন ঘটে পটে, প্রতিমা প্রকৃতিতে, তোমাতে আমাতে, সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতে, সেই অনাদি ও অনন্ত শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইবে।

ব্রহ্মজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মের বিশ্লেষণ কার্য্যে প্রকৃতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যিনি যে বিষয়ে যত অধিক সংখ্যক সূক্ষ্ম পরমাণুর বা বিভাগের পরিচয়

পাইবেন, তিনি যে, সেই বিষয়ে ততোধিক বিশেষজ্ঞ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌দিগেরই এই মত। উদাহরণস্বরূপ 'জল ও তুষার-ন্যায়ের' কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সগুণ সাকার দেবতা, সান্ত ও স্বল্পস্থানব্যাপী। জলধিজলের অন্ত কোথায় কে বলিবে, তাহাই বাষ্পাকারে সূক্ষ্মভাবে কোন্ অনন্ত পথে বিচরণ করিতেছে, সাধারণচক্ষে তাহার ঠিক উপলব্ধি হয় না—তাহা অদৃশ্য, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা আরও কঠিন। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বত্রই সেই জলীয় বাষ্প জীবের অলক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা চক্ষে দেখা যায় না—কিন্তু একটী পাত্রে একখণ্ড বরফ রাখিলে পাত্রের বহির্গাত্রে জলকণা পরিলক্ষিত হয়। তাহা ত আর কিছুই নহে, তাহা সেই বায়ুমণ্ডলস্থিত নিরাকার জলীয় বাষ্প সহসা শৈত্যসহযোগে জলকণারূপে সাকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র। তপন তাপে উত্তপ্ত সমুদ্র নদী তড়াগাদির জল বাষ্পরূপে সমুত্থিত হয়, ক্রমে মেঘমণ্ডলে পরিণত হইয়া থাকে ; অনন্তর সেই ঘনীভূত বাষ্প বা মেঘগুলিই যথা সময়ে শৈত্যসহযোগে বারিধারা রূপে পুনরায় ধরায় পতিত হয়। সেই জল আবার অধিকতর শৈত্যসংস্পৃষ্ট হইলেই ক্রমে তুষার, করকা বা কঠিন বরফেও পরিণত হইয়া থাকে। তখন উহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলা সকলেরই সাধ্যাধীন হইয়া পড়ে। ইহাকেই ইহা সূক্ষ্ম বাষ্পরাশির অতীব স্থূলভাব বলা যায়। মানব আবশ্যক বোধে যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন সেইরূপেই ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনন্ত ও অচিন্ত্য ব্রহ্মও সেইরূপ নিরাকার হইলেও আর্য্যগণ ব্রহ্ম-বিশ্লেষণাদি জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার মূল ত্রিশক্তি বা প্রায় তাঁহার স্বরূপ সাকার ভাব, পরে ক্রমান্বয়ে তাঁহার তেত্রিশ কোটী অতি স্থূল শক্তির বিশ্লেষণাবিষ্কারে হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতার রূপ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা জীবের হিতার্থে যে শক্তিদ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে, তাহাই পরোক্ষে তত্তৎ দেবতা বা দেবপূজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ বা ঘটে যখন কোন দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ অথবা কল্পনা করা হয়, এবং বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিতকরা হয়, তখন কেহই সে মূর্ত্তিকে তখনই দেবতা বলিয়া ভক্তি বা শ্রদ্ধা করে না। প্রতিমা কিছু বর্দ্ধিতাকার হইলে, প্রস্তুতকারক আবশ্যকবোধে সে সময় সেই মূর্ত্তির উপর পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা অথবা সঙ্কোচ বোধ করে না। এ কথা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তাহার পর যখন ভক্তিমান সাধক পূজা করিবার মানসে—বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভক্তি সহযোগে সিদ্ধমন্ত্রোচ্চারণাদি দ্বারা সাধনার বিধি অনুসারে সেই মূর্ত্তিতে আত্ম প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মশক্তিস্থিত নিজ অভীপ্সিত শক্তির আবাহন করেন, তখন সেই প্রতিমামূর্ত্তি ভক্তের আরাধ্য দেবতারূপে পরিগণিত হন। পূজক তখনই সেই সাকার সান্তমূর্ত্তির অন্তরস্থিত নিরাকার অনন্ত ও অদৃশ্য মূর্ত্তির পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া পূজান্তে আবার সেই আরাধিত দেবতাকে বিসর্জ্জন বা সেই ব্রহ্মশক্তিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। তদনন্তর প্রতিমাখানি অতল জলে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহাও সকলের সুপরিজ্ঞাত। এ প্রকার পূজাচরণ দ্বারা কি বুঝা যায়? আর্য্য-সাধক যাঁহার পূজার্চ্চনা করিলেন, কোন্ সময়ে, কেমন করিয়া, কি আকারে, তিনি সেই প্রতিমা-আধারে উপনীত হইলেন, এবং কেমন করিয়াই বা প্রায় সকলের অলক্ষ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, কেহই ত তাহা দেখিতে পাইল না! সুতরাং বল দেখি, সেই পূজা 'আকারের' না 'নিরাকারের'—'মূর্ত্তির' না 'অমূর্ত্তির'?

বট্-সাবাদ দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর মধ্যে ও মহাশক্তির স্তবে যাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, তাহারও মর্ম্ম সম্পূর্ণ পূর্ব্বানুরূপ।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্বের মধ্যেই

গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥"

যিনি সর্ব্বভূতেই চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রনাম করি।

পরমপূজনীয় গুরুমণ্ডলীর মধ্যে; জগজ্জননী ও জগদ্বিমোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি আদি জগদম্বার প্রত্যক্ষ বিভূতির ভিতরে; বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, মোহ, নিদ্রা ও শ্রান্তি প্রভৃতি গুণরাশির মধ্যে, এবং প্রত্যেক জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে যে অদ্বিতীয়া পরমাশক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন, তাঁহারই আরাধনা করিতে বেদাগমে উপদেশ দিয়াছেন; সুতরাং সাধক, দুর্গাপূজা-ব্যাপারে কোন্ মূর্ত্তির পূজা করিলেন, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি?

ভ্রান্ত জীব! না জানিয়া কেবল ভ্রমবশে আর্য্যকে মূর্ত্তি-পূজার প্রবর্ত্তক বা নব্য-ভাষায় পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করিও না। জগতের শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু আর্য্যগণ প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিপূজক নহেন। যাহারা রহস্যজ্ঞানা-ভাবে আর্য্যের এই প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে বৃথা নিন্দা করিয়া থাকে, মুখে একেশ্বরবাদী হইয়া তাহারাই অলক্ষ্যে প্রকৃত মূর্ত্তি চিন্তা করে ও নিজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

মহর্ষি বেদব্যাস তাই বলিয়াছেন—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতম্।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং যত্তীর্থ যাত্রাদিনা ॥
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥"

অর্থাৎ—"হে প্রভো' আপনি রূপবিহীন হইলেও, আমি আপনার ধ্যান রচনা করিয়া রূপবিশিষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি;

আপনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও, আমি মানবগণকে তীর্থযাত্রার উপদেশ দিয়া আপনার সর্ব্বব্যাপকতার অপলাপ করিয়াছি; আর আপনি অবাঙ্মনসোগোচর হইলেও আপনার স্তব রচনা করিয়াছি—অতএব হে অখিলগুরো, আমার বিকলতারূপ এই দোষত্রয় নিজগুণে ক্ষমা করুন্।" ব্রহ্মজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, জানিয়া শুনিয়াও ধ্যানাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, আত্মতৃপ্তির জন্য নহে—তাহা কেবল নিম্ন-অধিকারীকে উপদেশ দিবার জন্য। তিনি স্বয়ং যাহা বুঝিয়াছিলেন, সাধারণে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়াই, সেইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

সকলেই জানেন, গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এমন কি গণিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ যে কোনও অধ্যাপক, জ্যামিতির সর্ব্বপ্রথম সংজ্ঞা "বিন্দু কাহাকে বলে?" বুঝাইবার সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমক্ষে "বোর্ডে" খড়ি দিয়া ঠক্ করিয়া একটা আঘাত করিয়া থাকেন, এবং মুখে বলেন "যাহার অংশ ও পরিমাণ নাই, তাহার নাম বিন্দু" এই যে খড়ির দাগ দেখিতেছ, ইহাকেই বিন্দু বলে। শিক্ষার্থী তাহাই তখন বুঝিয়া রাখিল; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তাহাকে কি বিন্দু বলা যায়? তাহার যেমন অসংখ্য অংশ হইতে পারে তেমনি তাহার যথেষ্ট পরিমাণ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে তবে সেই সুবিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রবৃন্দকে কি উপদেশ দিলেন? উত্তরে অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয়ই বলিবেন, "সুকুমার বালক এখন এই ভাবেই বিন্দুকে বুঝিয়া রাখুক, পরে উচ্চ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুর প্রকৃত ধারণা আপনিই উপলব্ধি করিতে পারিবে।" ইহা অতি যুক্তিযুক্ত কথা। ব্যাসদেব বা তদনুরূপ সকল ঋষিই, 'ব্রহ্মবিন্দু' কাহাকে বলে, তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াও, ব্রহ্মের আংশিক শক্তির ধ্যানোপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাধনার সোপানরূপ চতুর্ব্বিধ ধ্যানের উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম,—স্থূল বা মূর্ত্তি ধ্যান ; মূর্ত্ত্যাত্মক যন্ত্র বা মন্ত্রধ্যান ইহারই অন্তর্গত; দ্বিতীয়,—সূক্ষ্ম বা জ্যোতির্ধ্যান ; এবং তৃতীয়—সূক্ষ্মতর বিন্দুর ধ্যান ; এবং চতুর্থ,—সূক্ষ্মতম ব্রহ্মধ্যান। সাধক শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সাধনাপথে ক্রমে অগ্রসর হইলে, অথবা সাধনার ক্রমোন্নত সোপানে ধীরে ধীরে অধিরোহণ করিলে, সেই চির অভীপ্সিত দেববাঞ্ছিত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবেন। ইহাই আর্য্য-শাস্ত্রের উপদেশ। তবে প্রত্যেককেই স্থূল আধার ধরিয়া সূক্ষ্মে প্রবেশ করিতে হইবে। অন্যথা পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত শুক-পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদা মুখে নির্গুণ 'ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম' বলিলেও, অন্তরে তাহার বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি হইবেনা ; অপিচ বিড়ালে আক্রমণ করিলেই তাহার নিজ বা স্বাভাবিক 'ট্যাঁ' 'ট্যাঁ' শব্দ বাহির হইয়া পড়িবে। সুতরাং সাধক শিব-নির্দ্দিষ্ট পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও, দেখিতে পাইবে—সকল মূর্ত্তির মধ্যেই সেই অমূর্ত্তি আছে, আর তখন বুঝিতে পারিবে—"মূর্ত্তি-পূজক কে ?"

দক্ষিণাকালী রহস্য। এইবার পরমা প্রকৃতি দক্ষিণাকালীর রহস্য-কথা যাহা মানব রসনায় যৎসামান্য প্রকাশ সম্ভবপর, তাহাই উক্ত হইতেছে।

শিববাক্যে উক্ত আছে :–

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ততোজাতং জগৎ সর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে।
মহদাদ্যন্থু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে তদধীনমিদং জগৎ ॥
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বংজানাসি জগৎসর্ব্বং ন ত্বাং জানাতিকশ্চন ॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥

ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ীতনুঃ ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধস্তনুঃ ॥

অর্থাৎ—শ্রীসদাশিব স্বয়ং বলিতেছেন :—

প্রকৃতি বা একমাত্র পূর্ণশক্তি, তোমা হইতেই এই সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শিবে, তুমি জগজ্জননী। মহৎতত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদায় স্থাবর-জঙ্গম-পরিপূর্ণ অখণ্ড জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তোমা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। তুমি সকলের আদ্যা, আদিভূতা, সমুদায় বিদ্যা এবং আমরাও (অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। জগতের সকল বিষয়ই তুমি অবগত আছ, কিন্তু মায়াবশে তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, তুমি তারা, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ও ধূমাবতী; তুমিই অন্নপূর্ণা, বাগদেবী ও কমলালয়া লক্ষ্মী; তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ও সর্ব্বদেবময়ী; তুমি সূক্ষ্মা, স্থূলা, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত স্বরূপিণী; তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা, তোমাকে কেহই সহজে জানিতে পারে না। তুমি উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের কারণ এবং দানবদল দলন করিবার জন্য নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক।

সদাশিব নিজমুখে আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালীকার যে রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই শাস্ত্রে এবং বিশেষ সাধুমুখ-পরম্পরায় শ্রুতিরূপে বিরাজ করিতেছে।* আদ্যা পরব্রহ্মের পরমাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলশক্তি, এই কারণ শিববাক্যে উক্ত

* 'পূজা প্রদীপে'—'মহামায়া বা শক্তিতত্ত্ব' দেখ।

আছে যে,—"তুষ্টায়াংত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ" অর্থাৎ তুমি তুষ্ট হইলে সকলেরই পরিতোষ হয়।

সাধক সেই ব্রহ্মময়ীর ধ্যানকালে দেবীকে চতুর্ভুজা মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার বাম হস্তদ্বয়ের নিম্ন ও উর্দ্ধে যথাক্রমে সদ্যচ্ছিন্ন শির এবং রুধিরাক্ত খড়্গ বিরাজিত। পূর্ব্বে দুর্গা-রহস্যে গৃহস্থ ভক্ত যে মহিষাসুররূপী রিপুসমষ্টির পূজা করিয়াছেন,এক্ষণে সাধক উচ্চ সাধনাবস্থায় সেই রিপুসমষ্টির ছিন্নমুণ্ড দেবীর বামহস্তে উৎসর্গ করিলেন। সংসারে গৃহস্থাবস্থায় রিপুগণের যেরূপ সাময়িক ভাবে পূজা বা সেবা প্রয়োজন হইত, উচ্চ সাধনাবস্থায় সে সকলের আর আবশ্যক কি? সাধক যে এক্ষণে কামনাদি শূন্য হইয়া রিপুবিজয় করিতে বসিয়াছে। কালীকাপূজা এই কারণেই কঠিন ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ গৃহীর পক্ষে ইহা এক প্রকার অসম্ভব। সাধকগণ কঠোর তপস্যাদ্বারা তাহা সংসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে ভীষণ রিপুদলকে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নাই। প্রবৃত্তির জীবন্তমূর্ত্তি রিপুগণের ছিন্ন কণ্ঠ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তধারা পতিত হইতেছে, তাহা এক একটি ভয়ানক বীজস্বরূপ, তাহাও অবসর পাইলে চেতনা লাভ করিয়া নূতন রিপুসমষ্টি সৃষ্টি করিতে পারে। কোন কোন সাধক সাধনার উচ্চ সোপানে উন্নীত হইয়াও অসাবধানতা ও কর্ম্মবশে সহসা কামাদির বশবর্ত্তী হইয়া সাধনভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। তাই নিবৃত্তিরূপিণী অতি ভীষণ খড়্গ রক্তাক্ত অবস্থায় দেবীর উর্দ্ধহস্তে এখনও পর্য্যন্ত বিরাজিত রহিয়াছে। দেবী-মাহাত্ম্য সপ্তশতী চণ্ডীতে সেই কারণ রক্তবীজের * ধ্বংসের কথা বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত আছে। তাই দেবীর বামহস্তদ্বয়ে সাধককে সাবধানতাসূচক সাঙ্কেতিক কৃপাণ ও দোদুল্যমান ছিন্ন মুণ্ড বিরাজিত। সাধক, অতি সাবধানে রিপুবিজয় করিয়া সাধনার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ কর।

---

* 'পূজাপ্রদীপে' 'রক্তবীজ' দেখ।

সাধকের মানসভূমিতে আর যেন ঐ রক্তবিন্দু স্পর্শ করিতে না পারে। মা সাধকবৎসলা তাই পূর্ব্ব হইতেই লোলজিহ্বায় সে রক্তবীজের রক্তবিন্দুসমূহ একেবারে লেহন করিয়া লইতেছেন। রিপুবিজয়কালে দেবীর এইরূপ ধ্যানই শিবোক্ত। সাধক দেবীকৃপায় এরূপ অদম্য রিপু-নাশ করিয়াও সশঙ্কিত অবস্থায় দেবীর কৃপাপ্রার্থী। মা অভয়া এই হেতু উৰ্দ্ধ দক্ষিণকরে ভক্ত সন্তানকে অভয়-মুদ্রা প্রদর্শন করাইতেছেন। আর ভক্তের ভাবনা কি? শক্তিময়ীর শক্তিকণা পাইয়াই ত সাধক শাক্ত বা বীর হইয়াছেন! তখন তিনি মূলাধার হইতে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া "আয় মা সাধন সমরে" বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে সাধনসমরে আহ্বান করিয়াছেন, ভক্ত তখন মাতৃস্নেহে ধীর হইয়া "ভক্তি বলে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী" বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। আহা! মা আর কি থাকিতে পারেন—ভক্তের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া বরপ্রদা মা আমার নিম্ন দক্ষিণ করে বরমুদ্রা প্রদর্শন করাইতেছেন বা বরপ্রদান করিতেছেন। ভক্ত, তুমিই ধন্য!

দেবীর কণ্ঠে রুধিরাক্ত মুণ্ডমালা দোদুল্যমান। মুণ্ড, ধী-শক্তির আধার। মস্তিকের বিকৃতিতে জ্ঞানের বিলোপ, আবার মস্তিষ্কের পুষ্টিতে জ্ঞানের বিকাশ হয়। এই জ্ঞান বা মস্তিষ্কাধার অথবা মুণ্ডরূপী সাক্ষাৎ জ্ঞানেরই মালা দেবীর কণ্ঠে বিভূষিত। অনন্ত জ্ঞানময়ী দেবীর মুণ্ডহার সংখ্যায় পঞ্চাশৎ। পূর্ব্বোদ্ধৃত 'নিরুত্তর তন্ত্রোক্ত' কালিকা-ধ্যানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

"পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী গলক্রুধিরচর্চ্চিতাম্"

অ-কারাদি স্বর ও ব্যঞ্জনজড়িত পঞ্চাশটী দেববর্ণই বা মাতৃকাবর্ণই মুণ্ডমালার মুণ্ডস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞানাধার বা সর্ব্বজ্ঞান প্রকাশক। বেদাদি তন্ত্র অথবা সর্ব্বশাস্ত্রই এই পঞ্চাশৎ বর্ণে গঠিত অর্থাৎ লিখিত বা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত এক একটী বর্ণ জ্ঞানাধার, উহাই গ্রথিত হইয়া মালাকারে

দেবীর গলে বিরাজিত। মা আমার সর্ব্বজ্ঞানময়ী। উহাদেরই রুধিরস্রোতে জগন্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত অর্থাৎ জগতে জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

কটিদেশ নাভিকমল সমীপবর্ত্তী। যোগশাস্ত্রে নাভিকুণ্ড মণিপুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে! ভুতপঞ্চকতত্ত্বে এই স্থানেই রক্তবর্ণ কমলের মধ্যে অগ্নি সতত বিরাজিত রহিয়াছেন। এ সকল যোগের কথা সাধক পরে বুঝিতে পারিবেন। তবে অগ্নি বা তেজ বিশ্বের উদ্দীপনা-প্রদায়ক, সেই অগ্নি মণিপুরে অবস্থিত, সুতরাং তাহাই সাহসের স্থান। এই কটিদেশ অনাবদ্ধ থাকিলে, সাহস নষ্ট হয়, সেই কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে নীবি বা কটিবন্ধ বাঁধিবার ব্যবস্থা আছে। সর্ব্বদেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাহস বা বিক্রম-প্রদর্শনকালে সকল ব্যক্তিই কোমর বাঁধিয়া থাকেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। কাঞ্চিবদ্ধ দেবীর কটিদেশ সেই নিত্য ও অনাদি শক্তি ও সাহস-তত্ত্বেরই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ কর ক্রিয়াশক্তির আধার এবং অবলম্বন! সেই ছিন্ন দক্ষিণ করসকল শক্তিময়ীর কটিদেশে কাঞ্চিরূপে আবৃত রহিয়াছে, অর্থাৎ মায়ের নরকর কটিবেড়া। কথায় বলে "বল্ বল্ বাহু বল্" বা "বল্ বল্ কোমরের বল্।" মা আমার অনন্ত বলশালিনী, তাই জীবের অসংখ্য করে অবিরত বল ও কটিতে অদম্য সাহস সততই প্রদান করিতেছেন। ভক্ত, সেই কারণ মা'র ধ্যান করিতে করিতে 'নরকরকটিবেড়া' বলিয়া বিভোর হয়। 'পূজাপ্রদীপে' নরকর সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর রহস্য দেখ।

অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিঃস্বরূপ। দেবীর ধ্যানান্তরে লিখিত আছে,—

"বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাম্"

দেবীর নয়নত্রয়ে সেই অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্র উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহারাই তাঁহার তিনটী নয়ন। পক্ষান্তরে অতীত, বর্ত্তমান ও

ভবিষ্যৎ একত্র ত্রিকাল দর্শন করিতেছেন বলিয়াও, তিনি ত্রিকালদর্শিনী কালী বা ত্রি-নয়নী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। 'পূজাপ্রদীপে' ত্রিগুণ-ময়ী ত্রিকালদর্শিনী 'কালী ত্রিনয়না' দেখ।

দেবী শবরূপী মহাকাল বা শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন। 'পূজাপ্রদীপে' মহামায়া ও শক্তিতত্ত্বে এ বিষয়ে বিস্তৃত দার্শনিক তত্ত্ব দেখ। দেবীর ধ্যানবর্ণিত এই শবরূপ মহাদেব ও মহাকাল সম্বন্ধে অনেকেই একটী ভ্রম ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা শবরূপ-মহাদেব ও মহাকালকে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিয়া মহাকালের নিম্নে আর একটী শব চিন্তা করিয়া থাকেন। শিবশক্তির চিরন্তন 'দ্বৈতভাবের' পরিবর্ত্তে, কেবল ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে একটী 'ত্রৈতভাব' আনয়ন করিয়া শিবপ্রোক্ত তন্ত্রের সমুন্নত ভাবকে সংকীর্ণ ও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে গুণাতীত পরম-পুরুষ বা পরব্রহ্ম ক্রিয়াশূন্য, সুতরাং তিনি শবরূপে শায়িত এবং তদীয় আদ্যাশক্তি বা মূলপ্রকৃতি তাঁহার হৃদয়োপরি দক্ষিণাকালী ত্রিধাশক্তির সমন্বয় রূপে গুণময়ী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্যে নিরতা রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী জগজ্জননী কালী মহাকালের * সহিত বিপরীতভাবে রতিক্রিয়ায় আসক্তা রহিয়াছেন। ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মের ত্রিধাশক্তিসম্পন্না।

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধাশক্তি স্থিতা লোকে তৎপরে জ্যোতিরোমিতি॥"

ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিতে যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী এবং ইহাদের পুং-মিথুন যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাসরস্বতী বা ব্রাহ্মী, মহালক্ষ্মী বা বৈষ্ণবী এবং মহাকালী বা গৌরী অথবা মাহেশ্বরী! ইহাঁদের ক্রিয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি

* মহাকাল 'শিব-শক্তি-রহস্য' দেখ।

ও সংহারকরণ। আদ্যাশক্তি বা মূলা প্রকৃতি একাধারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রণব-স্বরূপিণী ‡। সৃষ্ট্যাদি রহস্যতত্ত্বে আদ্যা যখন নির্গুণা, তখন তিনি তুরীয়-ভাবে সচ্চিদানন্দময়ী, আবার সগুণে তিনিই মহাদক্ষিণকালিকা, তাঁহার এই গুণত্রয়ের স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমো-গুণে প্রলয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেবী দক্ষিণকালিকা তখন সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা শবরূপী শিবের সহিত বিপরীতভাবে রতিক্রিয়ায় আসক্তা হইয়া ব্রাহ্মী-শক্তিতে সৃষ্টি নিরতা রহিয়াছেন। সাধক সেই ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিণী বিশ্বযোনিপীঠ পূজা করিয়া থাকেন। আবার 'শিবলিঙ্গ-মহাদেব' একাধারে শিব-শক্তিস্বরূপিণী, এই হেতু সংসারে গৌরীপট্ট-সম্বলিত শিবলিঙ্গ-মহাদেব পূজার এত প্রশস্ত ব্যবস্থা আছে। পুরশ্চরণ-প্রদীপে (শিবপূজা বিধান দেখ)। পুরুষ ও প্রকৃতি সহযোগে ব্রাহ্মীশক্তিরূপ আধারে জীবের উৎপত্তি হয়। জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, জড়, অজড়, সকলেই সেই সৃষ্টিতত্ত্বের অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন! ফলের ক্ষুদ্র বীজটী কোন উত্তম স্থানে তুলিয়া রাখিলে তাহা অঙ্কুরিত হইবে না। উপযুক্ত রস বা রজঃ-সংযোগ হইলেই সেই বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্ভূত হইবে। এই হেতু দেবী স্বীয় ব্রাহ্মীশক্তিতে রজোগুণাত্মিকা হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে শক্তিসহযোগে সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব গভীর ও গুপ্ত রহস্যান্তর্ভূত রাখিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বাস্তবিক সৃষ্টি-রহস্য বা তাহার প্রথম বিকাশ কেহই দেখিতে পায় না।

গৌরীপট্ট-সম্বলিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজাকালে পূজক শিবলিঙ্গো-পরি শ্বেতচন্দন ও পিনেটে রক্তচন্দন ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই শ্বেত-চন্দনই সৃষ্টিতত্ত্বে বীর্য্য এবং রক্তচন্দন রজঃরূপে কল্পিত হইয়াছে মাত্র।

‡ 'গায়ত্রী-রহস্যে' ত্রয়ীশক্তির বিস্তৃত রহস্য দেখিতে পাইবে।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণম্‌॥"

মহত্তত্ত্ব হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত সমুদায় জগত তোমা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, সর্ব্ব কারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত মাত্র। তুমিই তাঁহার ইচ্ছাদি মাত্র অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছ।

তন্ত্রান্তরে শঙ্কর বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতোনসংশয়॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণু কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণু প্রেতোনসংশয়॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশাশি রুদ্রঃ প্রেতোনসংশয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বকার্য্যাক্ষমা ধ্রুবম্‌॥"

বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সকলেই জড়বৎ নিশ্চল, তুমিই একমাত্র প্রকৃতি, সকলের সহিত শক্তিসমন্বিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও গ্রাস করিতেছ। ইহার গুঢ়তরতত্ত্ব আর এরূপ ভাষায় প্রকাশ এস্থলে অসম্ভব—ফলতঃ তাহা সাধনালব্ধ,—তাহা সদ্‌গুরুর নিকটই জ্ঞেয়।

ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী পীনোন্নত পয়োধরা জগজ্জননী মহামায়া ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াই কি নিশ্চিন্ত আছেন? তাঁহার বৈষ্ণবীশক্তিতে ত্রিজগৎ পালনোদ্দেশে বক্ষে অফুরন্ত পয়ঃ লইয়া সন্তানকে (জীবকে) স্তন্যপান করাইতেছেন। সত্ত্বগুণে দেবী বিষ্ণুতে বৈষ্ণবীশক্তি সমন্বিতা হইয়া জগতের প্রত্যেক শক্তি-স্বরূপিণী জননীহৃদয়ে সে অমৃত পয়োধারার প্রবাহ

প্রদান করিয়াছেন। জীব কবে ভূমিষ্ঠ হইবে—মা জগদ্ধাত্রী নিজ পালনী-শক্তির সাহায্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রতি মাতৃস্তনে জীবের পবিত্র আহার দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন! সাধক দেবীহৃদয়ে সেই বৈষ্ণবীশক্তির অনির্ব্বচনীয় করুণার প্রথম আস্বাদ পাইয়াই শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন।

করালবদনা কালী তমোগুণান্বিতা গৌরী বা মাহেশ্বরীশক্তিতে সংহার-রূপিণী। শ্রীসদাশিব কালিকাস্তোত্রে বলিয়াছেন,—"গুণাতীত গুণময়ি, প্রলয়কালে একমাত্র তুমিই তমোরূপে বিরাজিতা ছিলে, তোমার সেরূপ সাধারণের বাক্য ও মনের অগোচর।"

'কালী' এই শব্দ উচ্চারণ হইবামাত্র অনাদি ও অনন্ত মহা 'কালই' বুঝায়। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপী মহা-'কালই' মহাকালীরূপে সাধকের ধ্যেয়। জগৎ সংহারক মহাকাল তোমারই রূপ মাত্র। এই মহাকাল চির-কাল ধরিয়া সর্ব্বজীবকে কলন বা কালগ্রস্ত অর্থাৎ গ্রাস করিতেছেন, সেই কারণ মহাকাল নামে তিনি কীর্ত্তিত। আবার মহাকালকে তুমিই গ্রাস কর, এই হেতু তোমার নাম করালবদনা কালিকা। সেই অনাদি কাল হইতে কাল-সংহারিণী কালীর করাল বদনের মধ্যে নিত্য কত কি যে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহা কে বলিবে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কত জীব জন্তু, বৃক্ষ লতা, ধনী ভিখারী, সাধু অসাধু, সেই করাল গ্রাসের মধ্যে পতিত হইয়া তাঁহার উদরসাৎ হইয়াছে! কত স্বর্গাদি ত্রিলোক-বিজয়ী সুরভীতি-উৎপাদনকারী মহাপরাক্রান্ত অসুরদল দুদিনের তরে পিপী-লিকাসদৃশ পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই মহাকালের জঠরাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শুম্ভনিশুম্ভাদি দিগ্বিজয়ী দৈত্যগণ কত শতসহস্র অক্ষৌহিণী সেনা ও গজ রথাদিসহ ভয়ঙ্কর দন্ত-পঙ্‌ক্তির মধ্যে চিরদিনের তরে চূর্ণীকৃত হইয়াছে। মহাতেজা ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ, ত্রিভুবনবিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিলে, জগৎ প্রতিপালক বিষ্ণু নিজ অংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া

সংহাররূপিণী কালিকা-শক্তির সহায়তায় তাঁহার ধ্বংস করিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেবী কালগ্রাসী। এই সংহারশক্তি তাঁহার করাল-বদনে সাক্ষাৎভাবে মূর্ত্তিমান। সাধক এই সংহারশক্তির শক্তিকণা সংসারের প্রত্যেক জীবের বদনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। জীবের সমস্ত দেহভারের পরিমাণ তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কত শতসহস্রগুণ অধিক সামগ্রী জীব তাহার জীবদ্দশার মধ্যে ঐ ক্ষুদ্র বদন দিয়া উদরসাৎ করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র-আদর্শে শক্তিময়ীর কণামাত্র শক্তিতে তাহা প্রকাশমান। যতক্ষণ জীবের জীবাত্মা আছে—উদর আছে—গ্রাস করিতে বদন আছে—ততক্ষণ আদ্যাশক্তির সংহার ক্রিয়া জীবের মুখমণ্ডলে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত, তাহাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ নাই; মহামায়ার অদম্য শক্তি তাহাতে নিহিত ও প্রকাশিত! ক্ষুদ্র কীট দেখিলেই তদপেক্ষা কোন বৃহৎ জীব অমনি তাহাকে গ্রাস করিবে, পরে তাহাকেও কোনও বৃহত্তর জীবে গ্রাস করিবে, এইরূপে পর পর বৃহত্তম বলশালী জীব দুর্ব্বল জীবের সংহারকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, তাই সাত্ত্বিকভাবে "অহিংসা-পরমোধর্ম্ম" হইলেও প্রাকৃতিকভাবে হিংসাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক জীব জীবকে যে, স্ব-ইচ্ছায় হিংসা করিতে পারে না, তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। জগতের সংহারকর্ম্ম তাই মায়ের করালবদনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভয়ঙ্করাকৃতি আলুলায়িতকেশা দেবীর বর্ণ মেঘের ন্যায় প্রগাঢ় শ্যামবর্ণ বা কাল। দেবী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। কৃষ্ণবর্ণের অন্য নাম কালী। বিজ্ঞানের মতে আলোক বা সপ্তবর্ণের অভাব হইলে তাহাকে অন্ধকার বলা যাইতে পারে, কিন্তু অন্ধকারকে এককথায় কৃষ্ণবর্ণ বলা যায় না। সর্ব্ববর্ণ বিলোপকারী কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্ববর্ণাতীত ও তাহা স্বতন্ত্র বস্তু, তাহার শক্তিও অনন্ত—সেই কারণ সকল বর্ণই কৃষ্ণবর্ণ বা মসীবর্ণে বিলীন হইয়া যায়। নানাবর্ণে চিত্রিতা প্রকৃতি

চিত্রের উপর গাঢ় মসীবর্ণ লেপন করিলে, সেই ক্ষুদ্র অবয়বেও কালীর করালবদনের আভাস কথঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয়। এই কালীই কালিকার রূপ বা বর্ণ, তাহারই গুণ অন্ধকাররূপে দেবীর আলুলায়িত কৃষ্ণ কেশদাম* বিস্তৃত হইয়া রাত্রিকালে জগৎকে যেন গ্রাস করিয়া থাকে। ক্ষণিক করাল গ্রাসের মধ্যে পতিত হইয়া জগতের জীব কিয়ৎক্ষণের জন্য মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে—তখন জগৎ আংশিক ভাবে যেন মহাশ্মশানে পরিণত হয়। ঘোর অমানিশার গাঢ় অন্ধকার মধ্যে সেভাব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তখন জগতের জীব প্রায় সকলেই শবরূপে পরিণত হয়, এবং মধ্যে মধ্যে শিবাগণের তীব্র চীৎকার রবে মহাশ্মশানের ভীষণতা অধিকতর বৃদ্ধি করিতে থাকে। ভয়াদি অষ্টপাশ মোচন করিবার উদ্দেশে মহা অমানিশাই কালী-সাধনার প্রশস্ত সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যখন সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ ও স্থির—কেবল অবিরত শব্দে জগতে প্রণব-শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, (সাধারণের কর্ণে যাহা নিশার গভীরতা-ব্যঞ্জক 'শাঁ শাঁ' শব্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সাধকের কর্ণে তাহাই প্রণবশব্দে প্রতিধ্বনিত করে)। যখন সম্মুখস্থ কোন পদার্থই মানবচক্ষে আর দৃষ্ট হয় না, এমন কী স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সেই কালীর অন্ধকাররূপ কৃষ্ণকেশদামের মধ্যে বিলুপ্ত-প্রায় —কেবল চৈতন্যরূপী "অহম্" জ্ঞানটি বর্ত্তমান বা উপলব্ধি হইতে থাকে, তখনই সাধক সেই মহা-মুহূর্ত্তে ভূতশুদ্ধি করিয়া 'তত্ত্বমসি' সাধনায় অর্থাৎ সেই মহাশক্তিতে স্বীয় 'অহম্ জ্ঞান-শক্তিও' লয় করিয়া সান্দ্রানন্দ লাভ করিবার জন্য একাগ্রমনে নিযুক্ত হন।

সাধক এই আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকা-সাধনাকালে দেবীর পূর্ণ অঙ্গে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ যথাক্রমে তিনটী স্তর বা শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

মূলা-প্রকৃতির নিম্ন অঙ্গে, প্রথম স্তরে, যোনি-পীঠে দেবী ব্রাহ্মীশক্তি-

* 'মুক্তকেশী' শব্দের রহস্য "পূজা-প্রদীপে" দেখ।

স্বরূপা—সৃষ্টি-নিরতা ; মধ্য অঙ্গে, মধ্য বা দ্বিতীয় স্বরে, পীনোন্নত-পয়োধরে বৈষ্ণবীশক্তি স্বরূপা—পালনরতা ; ঊর্দ্ধ অঙ্গে, ঊর্দ্ধ বা উচ্চ স্বরে, করালবদনে মাহেশ্বরীশক্তিস্বরূপা—সংহার-তৎপরা। সাধকের হৃদয়ে তাহাই প্রথমে প্রবৃত্তি, পরে স্থিতি, তৎপরে নিবৃত্তিরূপে বিরাজমানা। দেবী একাধারে ত্রি-শক্তিস্বরূপিণী, ত্র্যক্ষরী অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রণব বা ব্রাহ্মণের নিত্য আরাধ্যা পূর্ণ সাবিত্রী—গায়ত্রীরূপিণী। এই হেতু কালিকা-স্তোত্রে স্বয়ং শিবই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরা তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি।

গায়ত্রী রহস্য। সাবিত্রী-গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যা-আরাধনা ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম। ইহা বেদের আদেশ। এই ত্রিসন্ধ্যার তিন প্রকার ধ্যান বেদ ও আগমে বর্ণিত আছে।* তাহা ব্রাহ্মণ ও সাধকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব সে মূল শব্দগুলির এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রাতঃ-সন্ধ্যায় দেবী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মীরূপে জগতে নিত্য নব নব প্রবৃত্তির বিকাশ করিতেছেন। মহাশক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ সূর্য্যমণ্ডলেই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া বেদাগমে তন্মধ্যেই দেবীর ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে।

সূর্য্যমণ্ডল 'অরুণ' সারথিদ্বারা পরিচালিত সপ্ত-অশ্বযুক্ত রথে বিচরণ করেন—সনাতন শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌর-রথ সপ্ত-অশ্বদ্বারা কিরূপে পরিচালিত, রহস্য বুঝিতে পারিলে, তাহার তাৎপর্য্য অতি সহজেই উপলব্ধি হয়। সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়—উহা রক্ত, নীল ও পীত এই তিনটি মূল বর্ণের সমষ্টি মাত্র। ইহাদের পরস্পর মিলনদ্বারা যথাক্রমে ১ম, (রক্ত ও পীতের সম্মিলনে) অরুণ বা কমলালেবুর বর্ণ; ২য়, (রক্ত ও নীলের সংমিশ্রণে) পাটল বা

* 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' বা 'সন্ধ্যারহস্য' দেখ।

বেগুনি বর্ণ ; ৩য়, (পীত ও নীলের মিলনে) হরিৎ বা সবুজ বর্ণ ; ৪র্থ, (পরস্পরের বিকৃত মিলনে) ধূসর বা কৃষ্ণনীল ; এই চারিটী মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটী মূলবর্ণ ও চারিটী মিশ্রবর্ণ একত্র সপ্তবর্ণের বিকাশ হইয়া থাকে। এই সপ্তবর্ণই সূর্য্যের সপ্ত হয় বা সপ্ত অশ্ব। শাস্ত্রে এইরূপ সপ্তবর্ণ-বিশিষ্ট সপ্ত-অশ্বের বর্ণনা আছে। এই সপ্ত-অশ্ব বা বর্ণ সূর্যকিরণ হইতে বিকাশ হইয়া থাকে, আকাশে রামধনু উঠিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য উদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রভাতে, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই তাঁহার প্রভাতি আলোক দেখিতে পাই, এই আলোকই সপ্তবর্ণবিশিষ্ট তাঁহার রথের অশ্বসপ্তকের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। ইহার পর তাঁহার সারথি অরুণদেব যেন সেই সপ্ত অশ্বের বল্‌গা ধারণ করিয়া তদীয় দিব্য অরুণবর্ণে আকাশ-পথ উদ্ভাসিত করিতে থাকেন, তদনন্তর দিব্যোজ্জ্বল সৌররথে সবিতাদেবতা জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময় মূর্ত্তিতে গগনমণ্ডলে বিরাজিত হইয়া ত্রিলোকে পরমানন্দ প্রদান করেন। প্রভাতে তাঁহার মূর্ত্তি রক্তবর্ণ। ভগবতী প্রাতর্গায়ত্রী সাবিত্রী-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মী-মূর্ত্তিতে বা রক্তবর্ণে বিরাজিতা। রক্ত অর্থে স্ত্রী-রজঃ বুঝায়—ইহা ঘোর লোহিত বর্ণ। ইহাই প্রথম মূলবর্ণ। এই রক্ত বা মূলশক্তি উত্তেজক অথবা প্রবৃত্তিপ্রদায়ক। সূর্য্যের উত্তেজনা বা তাপ-শক্তি তাঁহার রক্তবর্ণ রশ্মিগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। পাশ্চাত্য লৌকিক বিজ্ঞানালোকেও উহার ঐ রক্ত রশ্মিগুলিকেই উত্তাপক (Heating Rays) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। জীবের হৃদয়ে কোন ভাবের উত্তেজনা হইলেই জীবের ভাব-প্রকাশক স্থান ও পেশীসমূহ লোহিতাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। সে উত্তেজনার অবস্থায় জীবের নাসিকা, কর্ণ ও গণ্ডস্থল উষ্ণ ও লোহিতাভ হইয়া যায়। অগ্নিমধ্যস্থ উষ্ণতর স্থান ঘোর লোহিত বর্ণ। কোন দ্রব্য অগ্নিতে দগ্ধ করিলে লোহিত হইয়া যায়, ইংরাজী ভাষায়

তাহাকে 'Red hot' বলে। সূর্য্যের সেই উত্তেজক শক্তি লোহিত বর্ণ হইতে জাত। জগতে রক্ত বা রজঃ অথবা রসের সাহায্যে সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বীজই রজঃ বা রস সংযুক্ত না হইলে আদৌ অঙ্কুরিত হইবে না। পক্ষান্তরে সূর্য্যের প্রাতঃরশ্মি যে স্থানে ভাল পতিত না হয়, সে স্থানে বৃক্ষ-লতাদিও ভাল জন্মে না। সুতরাং এই রক্ত বা রজঃ হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মযোনি আত্মার আদি রজঃ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মীশক্তি রজঃ রূপে রজোগুণান্বিত হইয়া রক্তবর্ণে প্রতিদিন জগতে নূতন নূতন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছেন। বেদ ও আগম তাই ব্রহ্মের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তি-শক্তি ব্রহ্মাণী রক্তবর্ণা, সূর্য্যমণ্ডলাভ্যন্তরে অবস্থিতা বলিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মীর এইরূপই ধ্যান করিয়া থাকেন।

বেদাগমবিহিত ব্রহ্মের পালনীশক্তি বৈষ্ণবী। ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা-কালে দেবী গায়ত্রীকে সূর্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতা, দ্বিতীয়া বা মধ্যশক্তি নীলবর্ণা বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন। জগতের যাহা কিছু পুষ্টি-ক্রিয়া তাহা সবিতাদেবতার এই নীলশক্তি বা নীল রশ্মিগুলির দ্বারা সংসাধিত হয়। পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞান তত্ত্বে সূর্য্যের এই নীলরশ্মিগুলিকে (Actining Rays) রাসায়নিক ক্রিয়াবান বা ক্রিয়ক-রশ্মি বলিয়া স্থির হইয়াছে। যাহা হউক আমাদিগের এই মধ্য বা পালনীশক্তি নীলবর্ণা, বৈষ্ণবীরূপা, স্থিতি বা পুষ্টিশক্তিসম্পন্না, সত্ত্বগুণান্বিতা, সুতরাং তিনি পালন-তৎপরা। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে এই ভাবেই ধ্যান করিয়া থাকেন।

সায়াহ্নে দেবী তৃতীয়া বা শেষশক্তি শুভ্রোজ্জ্বল-পীতবর্ণা, গৌরীরূপা, সাবিত্রীমণ্ডল-সংস্থিতা, বেদ বা তন্ত্রাদিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণগণ সায়ং-সন্ধ্যাকালে দেবীর ঐরূপই ধ্যান করিয়া থাকেন। পীতবর্ণ

সংহারক, তমোগুণাত্মক ও নিবৃত্তিভাবব্যঞ্জক। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ-জাল যে সংহারক-শক্তি-সম্পন্ন, তাহা বোধ হয়, সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন, কারণ সায়ংকালের রৌদ্র, প্রাতঃকালের ন্যায় উত্তেজনা বা প্রবৃত্তি-প্রদায়ক নহে। পতনোন্মুখ রৌদ্রের তেজ অল্প হইলেও, তাহা যেন কেমন একপ্রকার তীব্র ও তৃপ্তিবিহীন, সেই রৌদ্রে অধিকক্ষণ বিচরণ করিলে শরীর যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। যে ভূমিতে কেবল মাত্র সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তথায় উদ্ভিদাদি ভালরূপে জন্মে না। এসকল কথা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত, দিবসের সেই অবসান-সময়ে পরমারাধ্য সবিতা-দেবতা, পীতবর্ণে জগৎতৃপ্তিপ্রদ সেই পূর্ব্ব তেজোরাশি জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিত্য কিয়ৎক্ষণের জন্য পুনরায় আকর্ষণ করিয়া লন। তাঁহার সেই আকর্ষণীশক্তি সংহাররূপিণী। পক্ষান্তরে পীতবর্ণ জ্যোতিঃপ্রকাশক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানতত্ত্ববিদ্‌গণ সূর্য্যের ঐ পীত-রশ্মিগুলিকে (Illuminating Rays) প্রকাশক-রশ্মি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সাধকের প্রবৃত্তি ও স্থিতির প্রখর তেজের সংহার বা নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞানের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান-প্রকাশক মাহেশ্বরী বা গৌরী শক্তির সায়ংকালিন ঐরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন।

রক্ত, নীল ও পীত এই মূল ত্রিবর্ণে যথাক্রমে রজঃ প্রবৃত্তি, সত্ত্ব—স্থিতি এবং তমঃ—নিবৃত্তি শক্তি বিরাজিত। সাধারণ ব্রাহ্মণমাত্রেই ব্রহ্মের এই ত্রিশক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং' যথাক্রমে ব্রহ্মময়ী দক্ষিণকালিকার ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরী শক্তিত্রয়, ইহাদের ক্রিয়া যথাক্রমে —সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বা লয়। তন্ত্রে সেই কথাই শ্রীদেবাদিদেব খুলিয়া বলিয়াছেন যে :—

"ভূঃ কারঞ্চ-তু ভূর্লোকো ভুবর্লোকো ভুবস্তথা।
স্বঃ কারঃ স্বরলোকশ্চ গায়ত্র্যাঃ স্থান নির্ণয়ঃ ॥
ইচ্ছাশক্তিশ্চ ভূকারঃ ক্রিয়াশক্তির্ভুবস্তথা।
স্বঃ কারঃ জ্ঞানশক্তিশ্চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ রূপকঃ ॥
মূলপদ্মঞ্চ ভূর্লোকো বিশুদ্ধঞ্চ ভুবস্তথা।
স্বরলোকঃ সহস্রারো গায়ত্রী স্থান নির্ণয়ঃ ॥"

অর্থাৎ গায়ত্রী-মন্ত্রস্থিত ভূঃ কার, ভূ-তত্ত্ব বা পৃথ্বিতত্ত্ব, সাধনাপথে মূলাধার চক্র, আবার জগন্মাতার নিম্নস্তরে ব্রাহ্ম বা ইচ্ছাশক্তি—মহাযোনিপীঠে সৃষ্টিতত্ত্ব। ভুবঃ—ভুবলোক বা অন্তরীক্ষতত্ত্ব, সাধনাপথে অনাহতচক্র আর মহাশক্তির মধ্যস্তরে পীনোন্নত পয়োধরে বৈষ্ণবী বা ক্রিয়াশক্তি পালন বা স্থিতিতত্ত্ব। স্বঃ কারঃ, স্বরলোক বা স্বর্গতত্ত্ব, সাধনাপথে সহস্রারনির্দ্দিষ্ট চক্র, এবং আদ্যাশক্তির উর্দ্ধ বা উচ্চস্তরে গৌরী বা জ্ঞানশক্তি সংহার বা লয়তত্ত্ব। ইহাই বেদমাতা গায়ত্রীর স্বরূপ ও স্থানরহস্য। ব্রাহ্মণগণ ত্রি-সন্ধ্যায় গায়ত্রীর ঐ তিন রূপ সাধনা করিয়া থাকেন। ক্রমে সাধনমার্গে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর হইলে, সাধক চতুর্থ বা নিশাসন্ধ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই নিশাসন্ধ্যার বিষয় সাধনমার্গের কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ শিক্ষার অভাবে তাহা একেবারে লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন রাত্রি ও দিবার প্রথম মিলন বা সন্ধিসময়ে অর্থাৎ প্রভাতকালে প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রাতঃ ও সায়ং ইহার মধ্যবর্ত্তী দ্বিতীয় সন্ধি বা দিবসের মধ্যাহ্নকালে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, দিবস ও রাত্রির পুনর্মিলনে বা তৃতীয় সন্ধিসময়ে সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা, সেইরূপ সায়ংকাল ও প্রাতঃকালের মধ্যবর্ত্তী চতুর্থ সন্ধিসময়ে অর্থাৎ মধ্য রাত্রিতে বা নিশা-কালে বেদাগমোক্ত তুরীয় বা নিশাসন্ধ্যার * ব্যবস্থা সাধকগণের

* "সন্ধ্যারহস্য" বা সন্ধ্যাপ্রদীপে 'নিশাসন্ধ্যা-বিধি' দেখ।

মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দিবাভাগে বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর ত্রি-শক্তির আরাধনা পৃথক পৃথক ভাবে করিয়া রাত্রিভাগের মধ্যে বা নিশা সন্ধ্যা সময়ে সেই ত্রি-শক্তির সমন্বয়ে একাধারে পূর্ণ গায়ত্রী-শক্তি-সাধনাই সাধকগণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়, সেই কারণ তাহা সাধকমণ্ডলিমধ্যেই চিরদিন সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে সংরক্ষিত হইয়া আছে। সাধক মাত্রেরই নিত্যকর্ম্মের মধ্যে সন্ধ্যাবিধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ওঁ শিব মঙ্গলময় শুভ্রজ্যোতিস্বরূপ মহাকাল, ইনি কালসংহারক, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই বিদিত আছে। জীবমাত্রেই যেমন দিবা নিশার মধ্যে যথাক্রমে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর্যশাস্ত্রের মধ্যে দেবতাদিগেরও সেইরূপই তিনটী অবস্থার কথা উল্লেখ আছে, তবে সে অবস্থার সময় বা তাহাদের দিবানিশার পরিমাণ আমাদিগের অপেক্ষা বহু দীর্ঘকালব্যাপী সে কথাও অনেকে অবগত আছেন। আমরা পৃথিবীর জীব, আমাদিগের এই সামান্য অবস্থা হইতেই ক্রমে দেবতাদিগের অবস্থা উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রথমে আমাদিগের দিবাভাগ বা জাগ্রতকাল; এ সময় আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকি না, প্রায় সকলেই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইয়া থাকি, পুনরায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নিশাসমাগমে পৃথিবী ঘোর তমসায় আবৃত হইতে না হইতেই আমরা (জীবসমূহ) পুনরায় সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে, কুটীরে অথবা কুলায় অর্থাৎ আপন আপন আবাসে পুনরাগমন করিয়া অবস্থান করি। ক্রমে নিদ্রার আবেশে প্রথমে কিয়ৎক্ষণ, সমস্ত দিবা বা কর্ম্মকালের অবস্থা চিন্তা করি! নিদ্রিত হইলেও সে চিন্তা চিত্ত হইতে একেবারে বিচ্যুত হয় না, দেহ

শিব-প্রকৃতি-রহস্য।

ক্রিয়াশূন্য হইলেও চিত্ত তখনও ক্রিয়া করিতে থাকে। তাহাই আমাদিগের স্বপ্নাবস্থা। গভীর মধ্যনিশায় সে অবস্থাও অতীত হয়, তখন চিত্তও কিয়ৎ কালের জন্য যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বা ক্রিয়াশূন্য হয়, অথবা জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের এই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের আগোচরে অন্য কর্ম্ম করে, তাহাই আমাদিগের সম্পূর্ণ নিদ্রাভাব, সুষুপ্তিকাল বা শবাবস্থা। জগৎ যেন তখন আংশিকভাবে শ্মশানরূপে পরিণত হয়। জীব জন্তু, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা, জড় অজড়, প্রভৃতি প্রায় সকলেই নিত্য এই তিন অবস্থা যথাক্রমে ভোগ করিয়া থাকে, পুনরায় নিশাশেষে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বে আবার স্বপ্নাবস্থা হয়। জগৎও সেই একই অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন হইয়া যেন জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের ভূর্লোকে যেমন সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালানুসারে দিবা রাত্রি হয়, ভুবঃ বা অন্তরীক্ষলোকে বা পিতৃলোকে আমাদিগের পূর্ণ এক মাসের সমষ্টির ব্যবধানে একটীমাত্র দিবা বা রাত্রি ভোগ করেন, মাসের কৃষ্ণপক্ষের সমষ্টি তাঁহাদের একটী দিবাভাগ এবং শুক্লপক্ষের সমষ্টি তাঁহাদের একটী রাত্রিভাগ। আমাদিগের কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাদের দিবা বা জাগ্রত অবস্থা, সেই কারণ শ্রাদ্ধাদি ও তর্পণক্রিয়া কৃষ্ণপক্ষেই প্রশস্ত। আমাদিগের শুক্লপক্ষে তাঁহাদের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা। চন্দ্রলোকই পিতৃলোকের স্থান। সে স্থানে আমাদিগের ন্যায় রক্ত-মাংসময় জীব নাই, আত্মিক বা সূক্ষ্ম দেহধারী পিতৃগণে পূর্ণ। আমাদিগের পূর্ণ ১৫টি দিবারাত্রে চন্দ্রলোকের একটি রাত্রি হয়। এইরূপ আমাদিগের ৩৬৫ দিবা রাত্রে বা দ্বাদশমাসে অথবা পিতৃ বা চন্দ্রলোকের দ্বাদশটী দিবারাত্রে স্বঃ, সুরলোক, স্বর্গ বা দেবলোকের একটীমাত্র দিবা রাত্রি হয়, অর্থাৎ আমাদিগের অবিশ্রান্ত ছয় মাস, উত্তরায়ণে ইন্দ্র চন্দ্র ও বরুণাদি দেবতাদিগের একটী দিবাভাগ এবং ঐরূপ ছয়মাস দক্ষিনায়নে তাঁহাদের রাত্রিভাগ। আমাদের ন্যায় তাঁহাদিগেরও দিবা ও রাত্রি ভাগ, এই কালের মধ্যে তাঁহারা যথাক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কাল ভোগ

করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু (ইহা আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর উত্তরমেরু নহে, এই জগন্মণ্ডলের উত্তরমেরু) স্থর বা দেবলোক বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। বাস্তবিক এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলেরও উত্তর-মেরুতে ক্রমাগত ছয়মাস কাল সূর্য্যোদয় হয়, সে ছয় মাসের মধ্যে তথায় সূর্য্যের আদৌ অস্ত নাই এবং অবশিষ্ট ছয় মাস কাল আবার সেই ভাবে সূর্য্যাস্ত বা সম্পূর্ণ অন্ধকারময় থাকে। এইরূপ ব্রহ্মার দিবস, বিষ্ণুর দিবস, শিবের দিবস, উত্তরোত্তর দীর্ঘকাল ব্যাপী, তাহা অনেকেই অবগত আছেন, স্থতরাং সে সকল কথা বলিয়া অধিক সময় অতিবাহিত করিব না ; এক্ষণে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদিগের সুষুপ্তির সময় যেমন অতি সামান্য, তাহার গভীরতাও তেমনি অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, কিন্তু দেবতা বা ব্রহ্মাদির সুষুপ্তিকাল যেমন দীর্ঘকালব্যাপী, তাহাদের সুষুপ্তির গভীরতাও তেমনই অচিন্ত্যনীয়, তাহা পুরাণাদিতেও বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। কখন কখন ব্রহ্মা বা নারায়ণের নিদ্রা বা সুষুপ্তির সময় অসুরগণের উৎপাতে ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইলে, দেবতাগণ কতবিধ উপায়ে তাঁহাদের নিদ্রা অপনোদনের চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের জাগ্রত করিয়া, অসুর-বিধ্বংস করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি স্থাপন করেন। সেই সুষুপ্তির সময়েই ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি খণ্ড-প্রলয়ের সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তাহাকেই আমাদিগের মন্বন্তর বা প্রলয়-সময় বলা হইয়া থাকে। এই ভাবে নির্দ্দিষ্ট মন্বন্তরের পর মন্বন্তর গত হইলে, কল্পান্তর বা যাহা মহাপ্রলয় হইয়া থাকে, সেই সময়েই মহাকালের সুষুপ্তি অবস্থা, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের এই সংপ্রসারণ ক্রিয়ার সমাপ্তির পর, ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কোচন করিবার আরম্ভ অবস্থা—সেই ভীষণ সময়ে যথাক্রমে ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজ মরুতে, মরুৎ ব্যোমে, ক্রমে লয় বা লীন হইতে থাকে। সেই প্রলয়-সময়ে সাক্ষাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্ত্তাও অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলসহ

মহাশক্তিতে, আবার সেই মহাশক্তি মহাকাল বা শিবে, তুরীয়ভাবে মিলিত বা লীন হইয়া যান। ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মচিতারূপ ব্রহ্মাগ্নি তখন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল তখন কি এক অচিন্ত্য ও অব্যক্ত মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া ক্রমে ভস্ম হইয়া যায়, তাহা আর এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ভাবিতে পারা যায় না। সেই শ্মশানাবশিষ্ট ভস্মস্তূপে মহাকাল তখন নিজ অঙ্গ বিভূষিত করিয়া পুনরায় নূতন কল্পের সৃষ্টি করিতে কল্পনা করেন।

জাগ্রত বা স্বপ্ন, সকলেরই কার্য্য বা কর্ম্মাবস্থা, ইহা ব্রহ্মের ব্যক্তশক্তি, এবং সুষুপ্তি কারণাবস্থা বা ব্রহ্মের অব্যক্তশক্তি। কারণ না থাকিলে কার্য্য অসম্ভব। সুষুপ্তি অবস্থায় অলক্ষিতভাবে সেই কর্ম্মসমূহের কারণরূপে অব্যক্তশক্তি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যথাযোগ্য নব নব কল্পনার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। তখন হইতে আবার সর্ব্ব কারণের কারণ ওঁ জ্যোতিস্বরূপমধ্যে অব্যক্ত প্রকৃতি কারণশক্তি, ব্যক্ত বা ত্রিধাশক্তিরূপে প্রকটা বা আবির্ভূতা হইয়া নূতন ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, আবার এক নূতন মনু বা মন্বন্তর এবং প্রত্যেক মন্বন্তরের অন্তরমধ্যে আবার সেই সত্য-ত্রেতাদি যুগকাল অতিবাহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বলেন, আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস নাই, বা ইতিহাসে কালনির্ণয় নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; তাঁহারা আর্য্য-শাস্ত্রের কোন তত্ত্বই রাখেন না। এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্কল্পমন্ত্রে, কল্পান্তর হইতে আজ পর্য্যন্ত, কোন্ কল্পের কোন্ মনুর অধিকার কালে, কোন্ যুগের কত বর্ষ, কত দিন, কত প্রহর, দণ্ড ও পল অন্তে, কোন্ কর্ম্মের সঙ্কল্প বা আরব্ধ হইল এবং তাহার সমাপ্তি বা উদ্‌যাপনই বা কোন্ সময় হইল, তাহার সুবিস্তার উল্লেখ হইয়া থাকে। এখনও পঞ্জিকাকারগণ প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রতি বৎসর পঞ্জিকার প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক সেই মহা-কল্পান্তেই মহাকাল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল একবার কলন্ বা গ্রাস করিয়া থাকেন। সেই মহা-

কলন্ সময়ে আপামর সকলেই তাঁহাতে লয় হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারই অনুকল্পে আমাদের সৌর-বর্ষশেষে চৈত্র-সংক্রান্তিতে আমরা চড়কসন্ন্যাসব্রত করিয়া থাকি। সেই সন্ন্যাস-ব্রতে জাতিভেদ থাকে না, তখন সন্ন্যাসাবস্থায় ব্রাহ্মণেতর সকলেই শিবগোত্রসমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সেই মহাকল্পের মহা-প্রলয় দিবসে সকলেই মহাসন্ন্যাসী হইয়া যাইবে, তখন নূতন সৃষ্টি রহিত হইয়া যাইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, তখন সকলেই মহাকালে বিলীন হইবার উপযুক্ত হইবে। ইতিপূর্ব্বে সে কথা বলিয়াছি। মহাকাল বা শিব—হরগৌরী বা শিবদুর্গার শিব নহেন, বা গৌরীপট্টসম্বলিত শিব-লিঙ্গও নহেন, তখন তিনি অনাদি বৃদ্ধশিব বাণলিঙ্গ বা বুড়াশিব বলিয়া উক্ত হন। অর্থাৎ শিবের সংযুক্তশক্তি গৌরীপট্টও তখন শিবে তুরীয়ভাবে লীন হইয়া গিয়াছেন। সেই কারণ গৌরীপট্টসম্বলিত শিবের নিকট চড়ক-সন্ন্যাস, গাজন বা তারা উৎসব * হয় না; অর্থাৎ কেবল অনাদি লিঙ্গ-পিণ্ডমাত্র বা শিবের শেষ চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। শাস্ত্রে বলে 'লীন ইতি লিঙ্গম্' এ কথা অনেকেই জানেন। অর্থাৎ যাহাতে সমস্তই লীন হয়, তাহারই নাম লিঙ্গ। ('পুরশ্চরণ-প্রদীপে শিবলিঙ্গতত্ত্ব দেখ')। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর. ক্রমে যুগ, মহাযুগ ও কল্প ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ দিন সেই মহাকালে আংশিক কালও বিলীন হইবে। সেই মহা-কালরূপ কল্পদণ্ড এবং তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন কল্পদণ্ড এবং তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন কল্পরূপ আংশিক কালের চক্রাকারে পরিভ্রমণেরই অনুকল্পে বৎসরান্তে এই চড়ক বা তারা উৎসব হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শেষে সেই সুদূর ভবিষ্যতের শেষ দিনের কথা স্মরণ করিয়া জীবজগৎ উচ্ছৃঙ্খল পাপপ্রবৃত্তি

---

* সনাতন সাধনতন্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ড 'গুরু-প্রদীপে ক্রম বা ক্রিয়া-সাধনার মধ্যে তারা উৎসব বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

হইতে সাবধান হও, চড়ক উৎসবে মঙ্গলময় শঙ্করের ইহাই সঙ্কেতমাত্র বুঝিতে হইবে। আহা! আর্য্যশাস্ত্রের কি গভীর দুরদৃষ্টি—ভাবিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়!

আর্য্য ঋষিগণ সেই মহাকালের রূপ কল্পনায় তাঁহার মহাসুষুপ্তি সময়ের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায়, শবরূপ শিব এইরূপ ধ্যান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ, ত্রি-বর্ণের অতীত বা ত্রিবর্ণাত্মক পারদোপম শ্বেত-শাশ্বত-বর্ণ, অঙ্গে কত শতসহস্র মহাপ্রলয়ের শেষ-চিহ্ন ভস্ম বা বিভূতিতে নিত্য পরিশোভিত, নির্লিপ্ত বা সন্ন্যাসের শেষ ভাব, জটাজুট, মহাশঙ্খ বা রুদ্রমালা সমন্বিত, যাহা সাধকের চরম লক্ষ্যের বিষয়ীভূত। তিনি দিগম্বর, সে বিরাট দেহের আবরণ-অনুরূপ বস্ত্রের কল্পনা কি মানব মস্তিষ্কে স্থান পাইতে পারে? তিনি ত্রিকালদর্শী, মহাকাল; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপে 'ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাট পট্টপাবকে' তাই তাঁহার সমুজ্জ্বল ত্রি-নয়ন সাধকের ধ্যেয়। মহাশঙ্খ বা অস্থিমালা তাহাও মহাশ্মশানের নিত্য-নিদর্শন; হস্তে ত্রিশূল, ত্রি-গুণাত্মক ব্রহ্মের তিনটী বিভিন্ন গুণ বা শক্তির সমীকরণ মাত্র। (পূজাপ্রদীপে-ত্রিশূল দণ্ডের চিত্র দেখ)। বর্ণাতীত বা নির্বর্ণ শুভ্রবর্ণে সূর্য্যালোকের প্রকাশ। কিন্তু আলোক ত স্বয়ং প্রকাশমান নহে—ছায়া যে তাহার অংশস্বরূপা! আলোক যেখানে বর্ত্তমান, ছায়াও যে তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত। আলোক—পুরুষ, ছায়া—স্ত্রী। আলোক ও ছায়া ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। ছায়া না থাকিলে কোন বস্তুই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত না, অথবা আলোকের উপলব্ধিও হইত না। (পূজাপ্রদীপে শক্তিতত্ত্ব দেখ)। যাহার প্রধান বিভূতি লইয়া সূর্য্যদেব জগতে প্রকাশমান, সেই অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মও ত্রি-গুণাত্মক হইয়া গুণাতীত বা নির্গুণ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। আদ্যাশক্তি তাঁহারই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান-শক্তি স্বরূপা ছায়ারূপে তাঁহার বিভূতি বা বক্ষের উপর থাকিয়া তাঁহারই গুণপ্রকাশক। সাধক পূর্ব্বোক্ত

তুরীয় বা নিশা-সন্ধ্যার অধিকার পাইলে—ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মকে নির্গুণ ভাবে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় বা শবরূপী শিব-স্বরূপে দর্শন করেন। এই হেতু স্বয়ম্ভু শিব, ত্রি-বর্ণের অতীত বা রক্ত, নীল ও পীত এই মূল ত্রিবর্ণের-সমাহারে বর্ণাতীত, নির্বর্ণ বা সূর্য্যালোকসম রজত-গিরিনিভ পারদোপম শ্বেত-শাশ্বত-বর্ণ; অথবা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরীশক্তির সমাহারে বিলীন হইয়া অনাদিলিঙ্গ-নিঃশক্তি বা শবরূপী মহাকাল অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার ছায়ারূপা পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি শ্যামবর্ণা, তাঁহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িতা হইয়া, তাঁহার হৃদয়োপরি সংস্থিতা রহিয়াছেন। ইনিই সাকারে আদ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকা, মূলা প্রকৃতি, এবং নিরাকারে তুরীয়া-স্বরূপিণী।

'জ্ঞানসঙ্কলিনী' তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন :—

"অকারঃ সাত্ত্বিকোজ্ঞেয় উকারোরাজসঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তামসঃ প্রোক্ত স্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥"

অকার সত্ত্বগুণাত্মক বৈষ্ণবী, উকার রজগুণাত্মক ব্রাহ্মী এবং মকার তমোগুণাত্মক মাহেশ্বরী বা গৌরী, এবং এই তিনের সমাহারে 'ওঁকার' * বা প্রণব-স্বরূপিণী পরমা 'প্রকৃতি' অথবা তখন তিনি 'তুরীয়া' বলিয়া উক্তা হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথাজ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধাশক্তি স্থিতালোকে তৎপরে জ্যোতিরোমিতি ॥"

অর্থাৎ পরমা প্রকৃতির প্রত্যক্ষ গুণত্রয় পর্য্যন্ত প্রকৃতি, তাহার পর জ্যোতিঃস্বরূপ ওঁ প্রণব; তাহা বাক্য ও সাধারণ মানব-মনের অগোচর, সিদ্ধ সাধকেরই তাহা পরমারাধ্য নিত্যধন।

* 'জ্ঞান-প্রদীপে' প্রণব-রহস্য দেখ।

সাধক সাধনার সকল সময়েই শরীরী—পঞ্চভূতাত্মক ক্ষুদ্র মানবরূপে ক্ষুদ্র আধার স্বরূপ মাত্র। সে আধারে ব্রহ্মময়ীর অনাদি ও অনন্ত রূপ—যাহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুর সহিত সূক্ষ্ম ও বিরাট ভাবে সম্মিলিত বা বিজড়িত, সে অসীম রূপ ধারণ করিবার ক্ষমতা কোথায়? সে মহাশক্তির একটী রশ্মি-রেখাও যে, জীবের ধারণা করিবার শক্তি নাই। ক্ষুদ্র মানব পৃথিবীর কোন্ সূক্ষ্মতম পরমাণু-পরিমিত স্থানে বসিয়া নিজ বুদ্ধির গর্ব্ব করিতেছে, তাহা ভাবিলেই লোক পাগল হইয়া যাইবে! সেই ক্ষুদ্রাপেক্ষা অতি ক্ষুদ্রতম স্থান, যথায় আমরা অবস্থান করিতেছি, তাহা ভূমণ্ডলের কোন্ কোণে? তাহার তুলনায় সমগ্র ভূমণ্ডল—প্রকাণ্ড. সে কত প্রকাণ্ড! সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডল সমন্বিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় আবার কত শত ব্রহ্মাণ্ড মিলিয়া তাহার অনন্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল! তাহারই প্রতি পরমাণু হইতে মহত্তত্ত্ব অবধি যাঁহার অবস্থিতি, সেই অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মের ধ্যান বা ধারণা এই ক্ষুদ্র মানব মস্তিষ্কের কোন্ স্থানে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? সাক্ষাৎ তেজতত্ত্ব অর্জ্জুনও তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিষ্ণুরূপ দেখিয়াই কম্পান্বিত কলেবরে বলিয়াছিলেন:—

ব্রহ্মসাধনায় সাধকের ধ্যেয় কি?

"* * * দৃষ্ট্বালোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥"
"* * * দৃষ্টাহি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা।
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥"

তাহার পরই আবার বলিয়াছেন:—

"* * * নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩০॥"

(গীতা—একাদশ অধ্যায়):

পরিশেষ বহু স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন প্রভো, তোমার এ স্বদুর্দ্দর্শ রূপ দেখিবার শক্তি আমার নাই। অর্জ্জুন তখনও ত মানব, মানবীয় শক্তির অনুরূপ ধারণাশক্তি লইয়া বর্ত্তমান! যে পাত্রের যেরূপ পরিসর, তাহাতে তদপেক্ষা অধিক সামগ্রী রাখিলেই ত পড়িয়া যাইবে। এ ক্ষুদ্র হৃদয়াধারে সে অনন্ত ব্রহ্ম মহাসমুদ্র ধারণা করিবার স্থান আদৌ নাই, সাধক সেই কারণ গুণাতীত তুরিয়া—শক্তির আরাধনা করিবার জন্যও গুণময়ী ত্রি-গুণাত্মিকা মহাশক্তির সাকার আরাধনা করিয়া থাকেন। সাধনার উচ্চ সমাধি অবস্থায় যখন সাধক জলকণা রূপে মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যান—তখনই অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তুরীয়ভাবে সাধকের তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ লাভ হইয়া থাকে। ইহাই জীবের জীবনমুক্তি।*

শ্রীসদাশিব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, গুণাতীত ব্রহ্মের গুণময়ী আদ্যাশক্তির আরাধনা ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই। জলমধ্যে পতিত হইলে যেমন জীব সেই জল অবলম্বন ও পরিহার সহযোগে সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠিতে পারে, অন্যথা ডুবিয়া মরে; ভবসমুদ্রে জলরূপ এই গুণরাশির মধ্যে পতিত হইয়া জীব তেমনি করিয়া উঠিতে সমর্থ হয়। সেই গুণই অবলম্বন এবং তাহার পরিহার দ্বারা সাধন-সন্তরণযোগে সাধক গুণমুক্ত হইতে পারে। সেই কারণ নির্গুণ সাধনার জন্য সগুণসাধনাই সনাতন শাস্ত্রের বিধি। মানব যে মাটীতে পড়ে তাহাই ধরিয়া উঠিতে যত্ন করে। বাস্তবিক সগুণ সাধনা ব্যতীত অন্য কোন রূপে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা করা এক প্রকার অসম্ভব। যখন সাধক সাধনামার্গের মহাপূর্ণদীক্ষান্তে "সোহং" জ্ঞান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই নির্গুণ ব্রহ্মের কিয়ৎপরিমাণ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সাধকচূড়ামণি রামপ্রসাদ তাই ভাবোন্মাদে গাহিয়াছিলেন,—
"ওরে যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, শেষে লয় হয়ে যায় মিশায় জলে।"

* "জ্ঞানপ্রদীপে"র মধ্যে 'জীবন-মুক্তি' দেখ।

এই কারণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপানস্বরূপ আদ্যা আরাধনাই জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। মানব যতই ভক্তিমান, নিষ্ঠাবান বা সাধনাতৎপর হউক না কেন, ব্রাহ্মণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত নির্ব্বিকল্পভাবে মুক্ত হইতে পারিবে না। সেই কারণ ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রীরূপিণী শক্তিত্রয় সমন্বিত ব্রহ্মময়ীর আরাধনা সমাধিলাভের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থা। সর্ব্ববর্ণগুরু ব্রাহ্মণদিগের সাবিত্রী গায়ত্রী আরাধনা অলঙ্ঘ্যনীয় নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বেদাগমের কঠিন শাসন। তবে সে অবস্থা পাইবার জন্য প্রত্যেককেই ধীর সোপানাবলম্বনে আরোহণ করিতে হইবে। সামান্য নিত্যকর্ম্মও সাধকের পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সকল কর্ম্মই সেই উচ্চতম ব্রহ্মণ্য বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ক্রমোন্নত সোপান।

সাধক জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে সেই বাঞ্ছিত উন্নতি-লাভ করিয়া থাকেন। কে যে কত শত-সহস্র যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জন্মান্তর গ্রহণপূর্ব্বক সাধনা করিয়া আসিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে! বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য প্রদেশের সাধকমণ্ডলিমধ্যে যে বিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে—সেই সম্মোহন বিদ্যায় অভিজ্ঞ বা আত্মিকতত্ত্ববিদ্ (মিস্‌ম্যারাইজ ও হিপনটীক্ আদি বিদ্যায় পারদর্শী) ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা এখনও জন্মান্তর মানেন না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তদপেক্ষা উন্নততর বিষয় তাঁহাদের বোধাতীত অথবা ধারণাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা আত্মিকতত্ত্ব লইয়া যেরূপ বৃথা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া যদ্যপি তদ্‌সহ গুরুমুখাগত হইয়া উচ্চ সাধনামার্গে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সময়ে জন্মান্তর-রহস্য তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সিদ্ধ সাধকগণ মৃতব্যক্তির আত্মা আনয়নাদি সম্মোহন-বিদ্যার সকল

তত্ত্বই অবগত আছেন, এমন কি তাঁহারা জীবন্ত ব্যক্তির বা নিজ আত্মারও পরিচালনা করিতে পারেন। তবে কৌতুকরূপে পরীক্ষা বা অন্য ব্যক্তিকে তাহা দেখাইবার জন্য কোন কিছুই করিবেন না, ইহাতে সাধকের সাধনার হানি হইয়া থাকে। সুতরাং সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্দিহান হইও না—জন্মান্তর, সাধনার ক্রমোন্নত পথ বলিয়া জানিবে।

যাহা হউক যে কোনও সাধক, ব্রহ্মার আরাধনা করিলে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুর আরাধনায় বিষ্ণুলোক বা গোলোক এবং শিব-আরাধনায় শিবলোক বা কৈলাস লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সকাম আরাধনায় সাধক সিদ্ধ হইয়া স্বঃ বা স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু উচ্চাবস্থায় নিষ্কাম আরাধনায় ত্রি-লোকের অতীত ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। অনন্তর ষড়রিপু ও অষ্টপাশ মোচন হইলে, জীব শিবত্ব বা নির্গুণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। সনাতন নিষ্কাম সাধনামার্গ অবলম্বন ব্যতীত জীব সেই বাঞ্ছিত পদ লাভ করিতে পারে না। তবে জীব সাধনার অতি নিম্ন স্তর হইতে যাহারই সাধনা করুন না কেন, ফলে সেই ব্রহ্মেরই সাধনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়। যেমন আলোক নিজে প্রকাশমান নহে, ছায়া তাঁহার অংশ স্বরূপ, সুতরাং আলোক সে হিসাবে নিরাকার; যখন সেই আলোক, জগতের প্রতি পরমাণুতে ছায়া মণ্ডিত হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, তখনই যেমন তাহার আকার উপলব্ধি হয়; তেমনই ব্রহ্ম নিরাকার হইলেও সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে প্রকৃতি-যুক্ত হইলে তাহার আকার পরিব্যক্ত ও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। 'মহানির্ব্বাণ' তন্ত্রে আছে যে,—

"একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্॥"

"সর্ব্বং ব্রহ্মণি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈব পরিপশ্যতি।
জ্ঞেয়ঃ সএব সৎকৌলো জীবন্মুক্ত ন সংশয়ঃ।"

একমাত্র পরমব্রহ্ম জগন্মণ্ডল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব জগন্মণ্ডলের অন্তর্গত কোন বস্তুরই পূজা করিলেই সেই ব্রহ্মেরই পূজা করা হইবে। কারণ কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যিনি সমুদায় বস্তুতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মতেই সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান অবলোকন করেন, তিনিই সৎকৌল ও জীবন্মুক্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবেই হইল উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বা মুক্তিলাভ শিবপ্রোক্ত কৌলধর্ম্মেই নিহিত আছে। ঠাকুর তাই বলিয়াছেন,—নিবিড় জলদাবৃত মহা অমানিশার ঘোর সান্দ্রান্ধকার যাহার পূজার সময়, নরকঙ্কাল শবমুণ্ড-পরিবৃত শিবা-শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ শ্মশান যাহার পূজার আসন—কর্ণভেদী ভয়ঙ্কর অশনি নির্ঘোষ যাহার পূজার বাদ্য—'তত্ত্বমসি' যাহার মহাবাক্য, মহাশক্তি যাহার ধ্যেয়, তাহার আবার চিন্তা কি? আরক্তি-বিরক্তি-বর্জ্জিত নিষ্কাম কৌলের আবার ভাবনা কি? সসাগরা ধরার রাজদণ্ডও যে তাহার নিকট ধেনুদণ্ডের ন্যায় হেয়! ব্রহ্মজ্ঞ কৌলের পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিবর্জ্জন উভয়ই যে সমান কথা। "ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ কৌলস্য ত্যাগানুষ্ঠানয়ো সমম্।"

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ।

পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীমদ্‌গুরু ব্রহ্মানন্দদেবের অনুমত্যানুসারে "সাধন প্রদীপ" 'সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্যের' প্রথমখণ্ড সমাপ্ত হইল।

সাধনপ্রদীপ—[সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড)]। চতুর্থ সংস্করণ, আমূল সংশোধিত শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রসহ, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গুরুপ্রদীপ—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' (২য় খণ্ড)] দ্বিতীয়সংস্করণ—সংশোধিত ও সম্বর্দ্ধিত। ইহাতে দীক্ষা-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার বিধান ও গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺তারাদেবীর সুরঞ্জিত চিত্রসহ মূল্য ২।০।

জ্ঞানপ্রদীপ (১ম ভাগ)—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' (৩য় খণ্ড)] পঞ্চদেবতার ত্রিবর্ণ-চিত্রসহ মূল্য ১৷৹ মাত্র। 'সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা,' যোগসমাহার,' 'মন্ত্রযোগ,' 'হঠযোগ,' 'লয়যোগ,' 'রাজযোগ,' 'পূর্ণদীক্ষাদি' ও 'বৈরাগ্য' সম্বন্ধে এরূপ সরল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। "তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির-প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।"

জ্ঞানপ্রদীপ (২য় ভাগ)—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য,' (৩য় খণ্ড)] ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রণব-চিত্রসহ মূল্য ১৷৹ সাতসিকা মাত্র। 'বিরজা-সংস্কার ও অন্তিম-দীক্ষা,' 'সন্ন্যাসাশ্রম,' 'সন্ন্যাসীর ভেদ,' 'মঠাম্নায়রহস্য,' 'দর্শন-সমন্বয়,' 'সৃষ্টি-রহস্য,' 'আত্মতত্ত্বাদি রহস্য,' 'প্রণব-রহস্য, 'মহাবাক্য' ও 'মুক্তিতত্ত্ব রহস্যাদি' সহ জ্ঞান ও মুক্তির উপায়সম্বন্ধে অতি সরলভাবে লিখিত অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সন্ধ্যারহস্য বা (সন্ধ্যাপ্রদীপ)। ইহা প্রত্যেক দ্বিজ-কুমারেরই অবশ্যপাঠ্য অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা মাত্র।

গীতাপ্রদীপ—[সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৫ম খণ্ড)] ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবদগীতার লৌকিক, যোগিক ও সমাধি-ভাষার অনুকূল কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব সাধনতত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞাতাভিলাষী প্রত্যেক গীতাধ্যায়ীর ইহা অবশ্যপাঠ্য। 'শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের

বিচিত্র 'ত্রিবর্ণাচিত্র ও যোগ-রহস্যের' চিত্রাবলীসহ সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

পূজাপ্রদীপ—[সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৬ষ্ঠ খণ্ড)]

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা-সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর অমূল্যদান! সনাতন-ধর্ম্মের এ হেন দুর্দ্দিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ কেবল শ্রীশ্রীইষ্টগুরুর অপার করুণার নিদর্শন মাত্র। ইহার বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাষী ভক্ত-জনের কেবল অন্তরের আনন্দ ও অনুভূতির বিষয়। 'ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের প্রথম-কৃত্য' হইতে 'অহোরাত্রির নিত্য-কর্ম্ম' ও 'নৈমিত্তিকাদি আজীবন-সাধনার অতীব গূঢ়রহস্যপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমূহ' সহজবোধ্য-ভাষায় কথিত হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই অপরিত্যজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাথী। ইহাতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামীজীমহারাজের কৃপাদেশক্রমে যথাযথবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র ও বিশুদ্ধ 'ষট্চক্র চিত্র', 'ষট্চক্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগের চিত্র', 'কামিণীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভূত চিত্র', আসনমণ্ডল', 'গুরুপাদুকা', বিবিধ প্রকার 'করমুদ্রা' 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল', নানা দেবদেবীর 'যন্ত্র', 'হোমকুণ্ডাবলী', 'স্থণ্ডিল-যন্ত্র', 'ত্রিশূলদণ্ড' 'শব্দব্রহ্ম', 'গুরুমূর্ত্তি' ও 'আত্মলয়াদির' বিপুল চিত্রাবলীর অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠায় বিরাট অদ্বৈতগ্রন্থ। মূল্য ৩।০ সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

পুরশ্চরণ প্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৭ম খণ্ড)]

ইহা 'পূজাপ্রদীপেরই' শেষ অঙ্গস্বরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহাতে মন্ত্র-পুরশ্চরণ সম্বন্ধীয় মন্ত্রচৈতন্য, কুণ্ডলিনী জাগরণ ও যোগবিজ্ঞানমূলক সাধন রহস্যপূর্ণ সমস্ত কথাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে চাতুর্মাস্যব্রত বিধান, যৌগিরোগ চিকিৎসা, স্বরোদয় শাস্ত্রোক্ত স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াবিধান, পঞ্চতত্ত্বাদির অনুগত মানবপ্রকৃতি, রোগাদি শান্তিকর সিদ্ধমন্ত্র ও ঔষধাবলী এবং বিবিধ বিষয়যুক্ত বিস্তৃত পরিশিষ্ট সম্বলিত হওয়ায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাদি সকল আশ্রমের পক্ষেই চরম উপাদেয় বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রাদি যোগীর অপরিত্যজ্য নিত্যধনরূপে আজীবন সঙ্গের সাথী। মূল্য ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।